শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক
অর্পণ রায় প্রামাণিক

তত্ত্বাবধায়ক
ড. নিখিল চন্দ্র রায়

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ, ২০২১

Declaration

I declare that the thesis entitled "শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি" has been prepared by me under the guidance of Dr. Nikhil Chandra Roy, Professor of Bengali, Department of Bengali, University of North Bengal. No part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship previously.

Date : 08/03/21

Arpan Roy Pramanik.

(Arpan Roy Pramanik)
Department of Bengali
University of North Bengal

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
দার্জিলিং, ৭৩৪০১৩ । পশ্চিমবঙ্গ । ফোন ০৩৫৩-২৫৮০৯৯
dept.bengalinbu@gmail.com

রেফারেন্স নম্বর .....

তারিখ .....

Certificate

I certify that Arpan Roy Pramanik has prepared the thesis entitled "শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি" for the award of Ph.D. degree of the University of North Bengal, under my guidance. He has carried out the work of the Department of Bengali, University of North Bengal.

Date:

(Dr. Nikhil Chandra Roy)
Professor of Bengali
Department of Bengali
University of North Bengal

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
দার্জিলিং ৭৩৪০১৩ । পশ্চিমবঙ্গ । ফোন [illegible]
dept.bengalinbu@gmail.com

রেফারেন্স নম্বর ....

তারিখ ....

কুম্ভীলকবৃত্তি প্রতিরোধী শংসাপত্র

অর্পণ রায় প্রামাণিক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে "**শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি**" শিরোনামে আমার তত্ত্বাবধানে পি এইচ. ডি. গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী জ্ঞাপন করছি যে, গবেষক এই গবেষণাকর্মে কোনোরূপ কুম্ভীলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

(প্রফেসর নিখিল চন্দ্র রায়)
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
বস্তুসার	:		i-vii
প্রাক্‌কথন	:		viii-ix
ভূমিকা	:		১-২
প্রথম অধ্যায়	:	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য	৩-৬১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ে উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি ক) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি। খ) উপন্যাসের গৌণ চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।	৬২-১০৬
তৃতীয় অধ্যায়	:	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সময়, সমাজ ও ঐতিহ্য	১০৭-১৫৯
চতুর্থ অধ্যায়	:	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শিল্পরীতি ক) গঠন নৈপুণ্য খ) উপস্থাপনা রীতি গ) ভাষা বিন্যাস	১৬০-১৯৮
উপসংহার	:		১৯৯-২০৮
গ্রন্থপঞ্জী	:		২০৯-২২১
নির্ঘণ্ট	:		২২২-২২৫

বস্তুসার
(Abstract)

আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের নাম ‘শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি’। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে পা রাখেন এক ঝাঁক তরুণ লেখক। যাঁদের জন্ম ও বালক-কৈশোর পর্ব কেটেছে পরাধীন ভারতবর্ষে। তাঁদের মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একজন অন্যতম কথাশিল্পী। দেশভাগের অস্থির সময়ে প্রায় সর্বস্ব হারিয়ে দশম শ্রেণির পড়াশোনা চলাকালীন এপার বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এসে উপস্থিত হন। তারপর বাংলা সাহিত্যে নিজের বিষয় নির্বাচন, স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতির মাধ্যমে নিজেকে একজন প্রথম শ্রেণির সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। লেখকের নিজের জীবন অভিজ্ঞতাই হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসের কাঁচামাল। তাই লেখক বলেন, ‘‘ঘুরে ফিরে যার কথা লিখতে চেয়েছি সে আমারই জানাশুনো একজন লোক। তার নাম শ্যামল গাঙ্গুলি।’’ (জীবনরহস্য, পৃ. ১৮০) লেখার বিষয়বস্তু পাবার জন্য, গ্রামকে জানার জন্য ছুটে গিয়েছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ‘চম্পাহাটি’ অঞ্চলে। সেখানে পুরো পরিবারসহ বসবাস করেছেন, গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন— আর খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করেছেন অভিজ্ঞতা। ‘চম্পাহাটি’ যেন লেখককে নতুন চোখ, নতুন ভাবনা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান করলো। এভাবেই আজীবন ধরে লেখক নিজের জীবনকে বারবার অনিশ্চয়তার মুখে ফেলেছেন, পরীক্ষা করেছেন ও বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। আর তার ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে কেন গবেষণা করব। কারণ আমরা মনে করি, উপন্যাসের অন্বিষ্ট শুধু সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয়। উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষ। আর এই সমাজ, সময়, ইতিহাস ব্যক্তিমানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল করে দেয়। তাই মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এই সমাজ, সময় ও ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। এই গবেষণাকর্মের দ্বারা সেই সময়-সমাজকে, সময়-সমাজ দ্বারা বিধৃত মানুষকে যারা উদাসীন এক বিশ্বজগতে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও মানবিক মর্যাদা রাখার জন্য শেষ অবধি তাদের চিন্তা-কল্পনা-আদর্শের জন্য যুদ্ধ করে যায়, তাদের আলোকিত করব। নিশ্চিত পরাজয়, নিয়তির পরিহাসকেও পরাজিত করে মানুষের অদম্য জীবন-তৃষ্ণা, রহস্য আবিষ্কারের অনাবিল আনন্দ,

প্রতিশ্রুতি— এই জীবনবাদী মানসিকতা, আশাবাদী মনোভাব বর্তমান অস্থির সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। আর তাছাড়া শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সমকালীন ও পূর্বকালীন লেখকদের তুলনায় নানা বিষয়ে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই সব অভিনবত্ব তুলে ধরে তিনি বাংলা সাহিত্যকে কতটা সমৃদ্ধ করেছেন— সে বিষয়ে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে। এইসব কারণে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাকর্ম বিষয়ে গবেষণা করা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটিকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে গবেষণায় এগিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছি।

প্রথম অধ্যায় : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য

দ্বিতীয় অধ্যায় : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ে উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি

ক) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।

খ) উপন্যাসের গৌণ চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।

তৃতীয় অধ্যায় : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সময়, সমাজ ও ঐতিহ্য

চতুর্থ অধ্যায় : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শিল্পরীতি

ক) গঠন নৈপুণ্য

খ) উপস্থাপনা রীতি

গ) ভাষা বিন্যাস

উপসংহার : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ন

গ্রন্থপঞ্জী : আকর গ্রন্থাবলী ও সহায়ক গ্রন্থাবলী

প্রথম অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের জগতে বহু বিষয় তুলে ধরেছেন। আসলে লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ। লেখকের জীবন-কথা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই বিপুল অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে উপন্যাসের যে জগৎ তিনি তৈরি করলেন তা বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর। স্থানিক পটভূমির দিক থেকে মোটা দাগে তাঁর উপন্যাসগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. গ্রাম ও মফস্বলকে পটভূমি করে রচিত উপন্যাস।

দুই. শহর ও নগরকে পটভূমি করে রচিত উপন্যাস।

যদিও এই দুই পটভূমি ব্যতীত বিশেষ কোনো অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও উপন্যাস লেখা হয়েছে। এই বিষয়টি যথাসময়ে যথাযোগ্য স্থানে আলোচিত হবে। লেখকের 'চম্পাহাটি পর্ব' (১৯৬৫-১৯৭১) গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতার আকরভূমি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চম্পাহাটিতে ১৯৬৫ সালের ১১ই অক্টোবর থেকে বসবাস শুরু করেন। গ্রামে বড়ো হয়ে ওঠা নয়, কিশোর বয়সের স্মৃতি নয়; শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গ্রামকে দেখলেন, জানলেন, বুঝলেন একদম তরুণ বয়সে। রবীন্দ্র-শরৎ-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের দেখা গ্রামজীবন থেকে একেবারে স্বতন্ত্র গ্রামজীবন তুলে ধরলেন লেখক। এছাড়া মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম জেলার নানা গ্রাম ও মফস্বল অঞ্চল এবং বাংলাদেশের খুলনা জেলার গ্রামজীবন উঠে এসেছে লেখকের উপন্যাসগুলোতে।

গ্রামজীবনকে অভিজ্ঞতা করে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো, 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭), 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬), 'স্বর্গের আগের স্টেশন' (১৯৮০), 'চন্দনেশ্বর জংশন' (১৯৮০) ইত্যাদি উপন্যাস। শহরজীবনকে পটভূমি করে লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো, 'বৃহন্নলা' (১৯৬১), 'আবিষ্কার' (১৯৭৭), 'হাওয়াগাড়ি' (১ম খণ্ড-১৯৭৯ ও ২য় খণ্ড-১৯৮০) ইত্যাদি উপন্যাস।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলো কাহিনির পটভূমিরূপে মূলত গ্রাম ও নগরজীবনের চেনা পরিবেশ ব্যবহৃত হলেও এমন অনেক উপন্যাস রয়েছে যেখানে আমরা দেখতে পাই কিছুটা অল্প-পরিচিত বা অচেনা পটভূমি। এই উপন্যাসগুলোতে ঐ অঞ্চলগুলোর বিশেষত্ব কাহিনিগুলোর মধ্যে স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। যেমন— 'পরীর সঙ্গে প্রেম' (ডুয়ার্সের চা বাগান), 'মহাজীবন' (আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল), 'স্বর্গে তিন পাপী' (কোনারক), 'একদা ঘাতক' (পুরী), 'এক সিংহ ও তার রমণী' (গির অভয়ারণ্য), 'বড় হওয়ার আগে' (শান্তিনিকেতন), 'সুধাময়ীর দিনলিপি' (কালাহাণ্ডি), 'কহেল গাঁও' (সাওতাল পরগণা)।

বঙ্কিম পরবর্তী সময়ে মোঘল রাজবংশের এক শাহজাদাকে নিয়ে লিখেছেন, লেখকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'শাহজাদা দারাশুকো' (১ম খণ্ড-১৯৯১ ও ২য় খণ্ড-১৯৯১)। নদী ও নদী তীরবর্তী মানুষজনের কাহিনি উঠে এসেছে 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' (২০০১)।

কলকাতা শহরের অন্যতম একটি অঙ্গ হলো গ্রুপ থিয়েটার। এই গ্রুপ থিয়েটার ও থিয়েটার

সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের নিয়ে লিখেছেন 'অদ্য শেষ রজনী'। বাংলা সাহিত্যে এর আগে এই বিষয় নিয়ে কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষের আত্মহত্যা করার প্রবণতা ছোঁয়াচে রোগের রূপ নেবে। এই বিষয়ে নিয়ে লিখছেন 'নতুন ভুবন' উপন্যাসটি। মানুষের রাতারাতি বড়লোক হবার অন্তহীন লোভকে হাতিয়ার করে কীভাবে চিটফাণ্ড সাধারণ মানুষকে বোকা বানায়, সর্বশান্ত করে— এই বিষয় নিয়ে লিখেছেন 'সওদাগর' উপন্যাস। বিষয়বৈচিত্র্যে শ্যামলের রচনাসম্ভার যে অনেক সমৃদ্ধ, তা আমরা আমাদের গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি

আমরা লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি তুলে ধরে, তা উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র কিংবা বিভিন্ন ঘটনা বা প্রসঙ্গ অবলম্বনে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব। যথা —

ক) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।

খ) উপন্যাসের গৌন চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।

ক) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি:

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনকে যতটুকু দেখেছেন, জেনেছেন; সেটুকু খুব নিবিড়ভাবে কাছ থেকে দেখা ও জানা। আর সেই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে তাঁর এই উপন্যাসগুলো। এজন্য তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো মাটির এত কাছাকাছি, এত সজীব ও সরস। তাই এই চরিত্রগুলো ঘিরেই প্রকাশিত হয়েছে লেখকের জীবন-ভাবনা বা জীবনদৃষ্টি। জীবনদৃষ্টি বলতে এখানে আমরা বুঝিয়েছি জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব বা উপলব্ধি। লেখক নির্মিত চরিত্রে কাজ করেছে এক অপরাজেয় মানসিকতা। অত্যন্ত বিপর্যস্ত সময়েও হার না-মানার মানসিকতা। তাই 'কুবেরের বিশয় আশয়' (১৯৬৭) -এর কুবের, 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬)-র অনাথ, 'স্বর্গের আগের স্টেশন' (১৯৮০)- এর খগেন নস্কর কিংবা 'চন্দনেশ্বর জংশন' (১৯৮০) -এর বজরা প্রমুখ আরও অনেক চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়

অপরাজেয় জীবন-তৃষ্ণা। উদাসীন এক বিশ্বজগতে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও মানবিক মর্যাদা রাখার জন্য শেষপর্যন্ত তারা চিন্তা-কল্পনা-আদর্শের জন্যে যুদ্ধ করে যায়। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এই যাত্রা।

খ) উপন্যাসের গৌণ চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি :

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের জগতে প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি অপ্রধান বা গৌণ চরিত্রদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আমরা এখানে গৌণ চরিত্র বলতে পাঠগত আধিপত্য বা উপস্থিতির সাপেক্ষে মূল্যায়ন করেছি। মূল কাহিনিতে একটি চরিত্রের উপস্থিতি বা কার্যকলাপ অংশের নিরূপণ করে নায়ক বা নায়িকা চরিত্র ব্যতিত অন্যান্য চরিত্রগুলোকে গৌণ চরিত্রের শ্রেণিগত বিভাগে রেখেছি। এইসব চরিত্ররা কখনো নায়ক চরিত্রে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টিকে পরিপুষ্ট দান করেছে কখনো বা স্বতন্ত্র জীবনদর্শনের আভাস দিয়েছেন। যেমন, 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের অবিনাশ, 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসের ব্রজ ফকির, 'নির্বান্ধব' উপন্যাসের অনিল দত্ত প্রমুখ।

তৃতীয় অধ্যায়
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সময়, সমাজ ও ঐতিহ্য

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও আমরা এই সমাজ, সময় ও ঐতিহ্যকে খুঁজে পাব। যেখানে বিধৃত হয়ে আছে ব্যক্তিমানুষ। পঞ্চাশের দশকে যখন লেখালেখির জগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটল তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর সবেমাত্র পথ চলা শুরু করেছে। কিন্তু কিছু কিছু মানুষের 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়', ভারত-চীন ও ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জটিলতা সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করে তোলে। উদ্বাস্তু ও ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা তখন পশ্চিমবঙ্গের জীবন্ত দুই আগ্নেয়গিরি যা থেকে ক্রমশ রাগ, ক্ষোভ, হতাশা, ঘৃণা, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদির মত লাভা উদ্‌গীরণ হতে থাকে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে এই সমাজ ও সময় দ্বারা গভীরভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। আর এই অভিজ্ঞতার কথাই লেখক বলেছেন তাঁর উপন্যাসে। তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মাটি, মানুষ, ইতিহাস— সব ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখেছেন এবং লিখেছেন। এভাবেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আমরা ছুঁতে পাই সময়-সমাজ-ঐতিহ্যকে। যা আমাদের বর্তমান সময়কে বুঝতে খুব সাহায্য করে। উপন্যাসের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা গবেষণার মাধ্যমে আমরা তুলে ধরব।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শিল্পরীতি

যে কোনো লেখকের রচনা বিশ্লেষণ করতে গেলে তার শিল্পরীতি নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলোর শিল্পরীতির আলোচনা কয়েকটি দিক থেকে করব। যথা—

ক) গঠন নৈপুণ্য

খ) উপস্থাপনারীতি

গ) ভাষা বিন্যাস

পৃথিবীর যেকোনো শিল্পই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তার শিল্পরীতির মধ্য দিয়েই। একমাত্র শিল্পরীতিতেই লেখকের প্রতিভা, কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়। কারণ ভাব ও বিষয় স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ কিন্তু রীতিকেই আমরা একমাত্র বলতে পারি ব্যক্তি-বিশেষের উপর নির্ভরশীল। আর শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভাব ও বিষয় দ্বারা রীতিকে আচ্ছন্ন করে সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠককে আনন্দ দান করা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মূল্যায়নে তাই শিল্পরীতির আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর আমরা তো জানি, শিল্পের ইতিহাস আসলে তো শিল্পরীতির ইতিহাস। বিষয়বস্তু, জীবন দৃষ্টি, সময়-সমাজ-ঐতিহ্য ইত্যাদি যে পদ্ধতিতে লেখক একটা শিল্প সংরূপের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, তাতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলা কথাসাহিত্যে একজন প্রথম শ্রেণির সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে শিল্পরীতির কয়েকটি দিক থেকে লেখকের কিছু উল্লেখযোগ্য নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে লেখকের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করব। তিনি যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে উপন্যাস নামক শিল্প সংরূপটি নির্মাণ করেছেন— তার গোপন স্বভাবটি পাঠকদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করব। সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত বিন্যাসকে বিশ্লেষণ করে দেখব— কীভাবে তা পাঠকের মনের মধ্যে রস সঞ্চার করে আনন্দ দান করতে সমর্থ হয়েছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস মূলত চরিত্রপ্রধান। আর উপন্যাসে আত্মজৈবনিক উপাদানের অধিক ব্যবহারের জন্য উপন্যাসের প্লট নির্মাণে যৌগিক প্লটের প্রাধান্য দেখা যায়। লেখকের বেশিরভাগ উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয় মাঝখান থেকে। আবহ রচনা লেখকের উপন্যাসে বেশি দেখা যায় না। তিনি কোনো কোনো উপন্যাসে কিছু বাক্য ধ্রুবপদের মত ব্যবহার করেছেন। ভাষার

ক্ষেত্রে সাধারণত আটপৌরে শব্দ, ইংরেজি শব্দের মানানসই ব্যবহার বাক্যে করেছেন। জটিল বাক্য অপেক্ষা সরল বাক্যের প্রয়োগ বেশি। বর্ণনা করেছেন অনেকটা সংবাদপত্রে রিপোর্ট লেখার মত করে। উপমা, চিত্রকল্প, মিথ-পুরাণের ব্যবহারে তিনি নিজস্ব শিল্পরীতি তৈরি করেছেন।

উপসংহার

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন লেখক। এক জটিল সময়ের প্রেক্ষাপটে যুগ-জীবনকে বস্তুনিষ্ঠভাবে তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। জীবনের প্রতি অপার ভালোবাসা, কৌতূহল, বিস্ময়, বানাবার ইচ্ছা ইত্যাদির মাধ্যমে এক চলমান জগতের কথা, জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর জীবনদৃষ্টি, সময়-সমাজ-ঐতিহ্য যেভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, তাতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতির নিরিখে তাঁর উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাক্‌কথন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস হাতে পাই। ছাত্রাবস্থা থেকেই আমি 'আউট অফ সিলেবাস' বিষয়ে পড়াশোনা করতে ভালোবাসতাম। ফলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসটি দ্রুত পড়ে ফেললাম। একটি উপন্যাস পড়ার পর আরও কয়েকটি উপন্যাস গ্রন্থাগার থেকে এনে হোস্টেলে বসে পড়তে থাকলাম। তখন থেকেই একটি ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে জাগ্রত হয়। সেটি হলো, যদি কোনওদিন গবেষণা করার সুযোগ আসে তাহলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমার প্রথম পছন্দ থাকবে।

পরবর্তীকালে গবেষণার জন্য যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করি, তখন আমি আমার পছন্দের কথা ওনাকে জানাই। স্যার বললেন, ওনার বিষয়ে আরও পড়াশোনা করে একটি ত্রিশ-পয়ত্রিশ পাতার লেখা তৈরি করে প্রথমে আমাকে দেখাও। আমি সেটা করতেই ও আমার আগ্রহ দেখে আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হতে রাজি হলেন। পঞ্চাশের দশকের কথাকার হিসাবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমার একজন প্রিয় লেখক। এই লেখকের যত উপন্যাস পড়েছি, তত মুগ্ধ হয়েছি, ভালোবাসা হয়েছে নিবিড়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিষয়ে কাজ করার সুযোগ করে দেবার জন্য মাননীয় অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়কে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। ওনার সুযোগ্য পরামর্শে ও পথপ্রদর্শনে আমি আমার কাজটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি।

পত্রিকা, টেক্সট, রেফারেন্স সংগ্রহের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পেয়েছি সেগুলো হলো— উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং কলিকাতা লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র।

এছাড়াও আমার কলেজের সহকর্মীবৃন্দ (ড. দেবাশীষ মল্লিক, ড. দিব্যতনু দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাতুল ঘোষ) উপযুক্ত তথ্য, পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি দিয়ে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে বিশেষ করে আমার সহকর্মী শ্রীযুক্ত শান্তনু মণ্ডলের নাম উল্লেখ করতে হয়। নানান দুর্লভ পত্র-পত্রিকার সন্ধান দিয়ে যিনি আমার কাজকে সহজ করে তুলেছেন। আর আমার স্ত্রী শ্রীমতী জ্যোতিকণা বর্মণকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার কাছে

নেই। একদিকে একাই সংসার সামলে অন্যদিকে আমার গবেষণায় নানান পরামর্শ দিয়ে আমাকে আজীবন ঋণী করে দিয়েছে। আমার বাবা অমল রায় প্রামাণিক ও আমার মা খঞ্জনা রায় প্রামাণিক সর্বদা আমাকে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়ে গেছেন। তাদেরকে আমি কী বলব, আমার জানা নেই। সবশেষে যে দু'জনের নাম উল্লেখ করতেই হবে, সেই দু'জন হলো আমার বন্ধু অধ্যাপক কুন্তল সিনহা ও টাইপিস্ট ভাই সুজিৎ রায়। এদের দু'জনকেও আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অর্পণ রায় প্রামাণিক

অর্পণ রায় প্রামাণিক

ভূমিকা

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল ১৯৪৭ খ্রি. ১৫ই আগস্ট। কিন্তু যে স্বাধীনতা হয়তো অধিকাংশ স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের, সাধারণ মানুষের কাঙ্ক্ষিত ছিল; সেই স্বাধীনতা আমরা পেলাম না। স্বাধীনতার সঙ্গে এলো দেশভাগ এবং তজ্জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা। যখন পরাধীন ভারতবর্ষে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে দেশজুড়ে 'আইন অমান্য' আন্দোলন চলছিল তখন অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলায় ১৯৩৩ খ্রি. ২৫ মার্চ (১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১১ চৈত্র শনিবার বারবেলা) পিতা মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতা কিরণকুমারী দেবীর গর্ভ থেকে চতুর্থ সন্তান হিসাবে জন্ম হয় শ্যামলেন্দুবিকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের। দশম শ্রেণির ছাত্র যখন তখন শ্যামলকেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে সপরিবারে জন্মভিটা ত্যাগ করতে হয়। লেখার জন্য অসম্ভব পরিশ্রমী, সৃজনশীল মনন এবং সর্বদা নতুন কিছু করার বা বানাবার আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকতে চাওয়া শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে দেশভাগ (বিশেষত বঙ্গভাগ) গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। খুলনার বালক-কৈশোর পর্বের স্মৃতিকে সঙ্গী করে এবং নিজের সময়, সমাজ ও জীবনকে মূলধন করে পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর সময় যত গড়িয়েছে লেখকের বৈচিত্র্যময় জীবন-অভিজ্ঞতার ফসল হিসাবে এক একটি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

জন্মসূত্রে পাওয়া সময়পর্বকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিঙড়ে নিয়ে অনুভব করেছেন। খুলনাতে থাকাকালীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য আমেরিকান সৈন্যদের আনাগোনা, মুসলিম লিগের শক্তিবৃদ্ধি, মুসলিম বন্ধুদের ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, তেভাগা আন্দোলনে যুক্ত কৃষকদের মৃতদেহ, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, বাংলাদেশ নামে নতুন দেশের জন্ম হওয়া, ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে শ্যামল বড় হতে থাকে। স্বাধীন ভারতবর্ষে কলকাতায় এসে লেখকের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে যখন তিনি রসায়নবিদ্যা পড়ার জন্য কলেজে ভর্তি হয়। পশ্চিমবঙ্গে তখন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধান চন্দ্র রায়ের শাসনকাল অন্যদিকে কমিউনিস্ট দল বিধানচন্দ্রের বিরোধীতা ও নিজেদের মতাদর্শ ছড়ানোর কাজে ব্যস্ত। রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শ্যামলের ব্যক্তিজীবনে খুব একটা শুভ হয়নি। কারণ এরফলেই লেখককে কলেজ থেকে বিতাড়িত হতে হয়। পরবর্তী সময়েও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে শ্যামল সেভাবে কোনও দিন যুক্ত হয়নি। অবশ্য তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলী কোনও নির্দিষ্ট

রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর লেখকের বিশ্বাস রাখতেও সাহায্য করেনি। তাই আমরা বলতেই পারি লেখকের নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। তাই লেখকের রচনাতেও কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের কোনও প্রভাব আমরা দেখতে পাই না।

বরং নানা রঙের মানুষের জীবনের কথা, নিজের জীবনের কথা, জীবনের দাবি, জীবনের রহস্য, প্রকৃতির রহস্য লেখককে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে। জীবন ও প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে ছুটে গিয়েছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়। সেই জেলার চম্পাহাটিতে স্ত্রী-সন্তানসহ সপরিবারে বসবাস করেছেন। গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে কৃষিকাজ করেছেন। এছাড়াও ইস্পাত কারখানায় কাজ করা, প্রুফ রিডার, সাংবাদিকতা, সম্পাদনা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভোজনরসিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে পরিচয়, বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা, নিজের জীবনকে নিয়ে নানারকম দুঃসাহসিক পরীক্ষা, ঘাম ফেলে জ্ঞান আহরণ লেখককে কখনও উপন্যাস নির্মাণের কাঁচামালের অভাব বুঝতে দেয়নি।

আমরা জানি, উপন্যাস বাস্তব জীবনের নানারূপকে তুলে ধরে। সময়ের কথা, সমাজের কথা, ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে। তবে উপন্যাসে সবকিছুই ফুটে ওঠে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সিক্ত হয়ে। আর লেখকের প্রকাশভঙ্গি লেখকের শৈল্পিক প্রতিভাকে উন্মোচিত করে। শিল্পরীতির মাধ্যমেই কোনও শিল্প সংরূপ বিশিষ্ট, অভিনব হয়ে ওঠে। তাই কোনও সাহিত্যিকের রচনাসম্ভারের মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে বিষয় নির্বাচন বা বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনদৃষ্টি, সময়-সমাজ-ঐতিহ্য, শিল্পরীতি ইত্যাদির আলোচনা। এই আলোচনা, বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখকের কৃতিত্ব, প্রতিভা পাঠকের সামনে উদ্‌ঘাটিত করার অবকাশ থাকে সমালোচক, গবেষকের কাছে। তাই আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে উপরিউক্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ন ও লেখক হিসাবে কৃতিত্ব, অভিনবত্ব গবেষণাধর্মী আলোচনায়, বিবৃতিমূলক ও বিশ্লেষণাত্বকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

প্রথম অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য

পঞ্চাশের দশকে 'অগ্রণী সাহিত্য পত্র'-তে (১৯৫৩) প্রকাশিত 'চর' নামক ছোটগল্প দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে পা রাখেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। আর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বৃহন্নলা' (১৯৬১)। এই উপন্যাস মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে ১৯৭৭ সালে 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' নামে প্রকাশিত হয়। লেখকের জীবদ্দশায় শেষ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে, 'গঙ্গা একটি নদীর নাম'। ১৯৬১ খ্রি. থেকে ২০০১ খ্রি.— দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য জগতে বিচরণ করেছেন। এই সময়কালে তিনি আটাত্তরটি উপন্যাস রচনা করেছেন। এই উপন্যাসগুলো ছাড়াও তিনি অনেক কিশোর-উপন্যাস, কিশোর রচনা, আত্মজীবনীমূলক রচনা লিখেছেন। তাঁর আটাত্তরটি উপন্যাসই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের সংখ্যাধিক্যের জন্য হয়তো উপন্যাসের গুণগত মানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। আয়তনের দিক থেকে সর্ববৃহৎ উপন্যাস 'শাহজাদা দারাশুকো' (দুটি খণ্ড)। তারপরেই রয়েছে 'হাওয়া গাড়ি' (দুটি খণ্ড) ও 'আলো নেই' (দুটি খণ্ড) উপন্যাস দুটি। এছাড়া নাতিদীর্ঘ ও ছোট উপন্যাসই তিনি বেশি লিখেছেন।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় হয়তো উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে খুব সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। তাই দেখা যায় বহু উপন্যাসের নাম পরবর্তীকালে পরিবর্তন করেছেন। যেমন— 'বৃহন্নলা' উপন্যাসটির পরবর্তীকালে নামকরণ হয় 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' নামে। 'নবকল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সামনে সমুদ্র' উপন্যাসটির গ্রন্থরূপ নামকরণ হয় 'একদা ঘাতক'। 'কায়কল্প' উপন্যাসটির পরিবর্তিত নাম হয় 'কঠিন সময়'। 'রূপোকুঠির পরী' উপন্যাসটির নাম পাল্টে দেন 'পরীর সঙ্গে প্রেম'। 'নতুন নগরের চিন্ময়ী' উপন্যাসটির নাম পাল্টে করেন 'ভালোবাসলে জ্বর হয়'। 'বালকের ভালোবাসা' এই নামটি পরিবর্তিত হয় 'ভালোবাসিব না আর' এই নতুন নামকরণে। এমনকি 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসটি প্রথমে বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের ত্রৈমাসিক কাগজে 'গণেশের বিষয় আশয়' নাম দিয়ে শুরু করেছিলেন। পরে 'দেশ' পত্রিকায় যখন বের হয় তখন তিনি নাম দেন 'কুবেরের বিষয় আশয়'। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসে দেখা যায় কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা, প্রসঙ্গ বা কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। লেখক বলেছেন—

''ঘুরেফিরে যার কথা লিখতে চেয়েছি সে আমারই জানাশোনা একজন লোক। তার নাম শ্যামল

গাঙ্গুলী। তার মজা, তার আনন্দ। কল্পনায় তার গুলি চালানো কিংবা স্বপ্নে তার ডানা মেলে ওড়া। এই লোকটিকে কখনও সস্তার ফার্নিচারের দোকানদার হিসেবে গাঁয়ের বুনো তেঁতুল গাছ কিনতে পাঠিয়েছি। এই লোকটি খুনের বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে। আবার এই লোকই গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার হিসেবে অভাবী তাড়িখোর মাতালের বউকে সংসার থেকে ভেগে চলে আসার পরামর্শ দিচ্ছে।"[১] নিজের কথা বিভিন্ন ভাবে লিখতে গিয়ে অনেক ঘটনা, প্রসঙ্গ ও চরিত্র উপন্যাসে তাই ঘুরেফিরে এসেছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের জগতে বহু বিষয় তুলে ধরেছেন। আসলে লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ। লেখকের জীবন-কথা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই বিপুল অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে উপন্যাসের যে জগৎ তিনি তৈরি করলেন তা বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর। স্থানিক পটভূমির দিক থেকে মোটা দাগে তাঁর উপন্যাসগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. গ্রাম ও মফস্বলকে পটভূমি করে রচিত উপন্যাস।

দুই. শহর ও নগরকে পটভূমি করে রচিত উপন্যাস।

যদিও এই দুই পটভূমি ব্যতীত বিশেষ কোনো অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও উপন্যাস লেখা হয়েছে। এই বিষয়টি যথাসময়ে যথাযোগ্য স্থানে আলোচিত হবে। লেখকের 'চম্পাহাটি পর্ব' (১৯৬৫-১৯৭১) গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতার আকর ভূমি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চম্পাহাটিতে ১৯৬৫ সালের ১১ই অক্টোবর থেকে বসবাস শুরু করেন। গ্রামে বড়ো হয়ে ওঠা নয়, কিশোর বয়সের স্মৃতি নয়; শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গ্রামকে দেখলেন, জানলেন, বুঝলেন একদম তরুণ বয়সে। রবীন্দ্র-শরৎ-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের দেখা গ্রামজীবন থেকে একেবারে স্বতন্ত্র গ্রামজীবন তুলে ধরলেন লেখক। এছাড়া মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম জেলার নানা গ্রাম ও মফস্বল অঞ্চল এবং বাংলাদেশের খুলনা জেলার গ্রামজীবন উঠে এসেছে লেখকের উপন্যাসগুলোতে। নির্বাচিত উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করব।

গ্রামজীবনকে অভিজ্ঞতা করে তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭)। বাংলা উপন্যাসে গ্রামীণ পটভূমি আমরা অনেক দেখেছি। কিন্তু সেই পটভূমিতে কুবের সাধুখাঁ-র মতো মানুষকে এই প্রথম দেখছি। নিম্নমধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের কুবের পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে একটু ভালোভাবে থাকতে চায়। তাই নিজস্ব ইচ্ছাশক্তিকে সম্বল করে স্বল্প পুঁজি নিয়েই জমি খুঁজতে বের হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে সে জমির নেশায় বুঁদ হয়ে যেতে থাকে। জমি কেনাবেচার হাত

ধরে সে প্রচুর জমির মালিক হয়ে বসে। অন্যদিকে যে পরিবারের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জমি কিনতে বেরিয়েছিল, সেই পরিবারের সঙ্গে তার বন্ধন শিথিল হতে থাকে। বিশেষ করে মায়ের মৃত্যু এই শিথিলতা বাড়িয়ে দেয়। আসলে কুবের যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বড় হয়ে উঠেছিল, শ্রেণিগত যে মূল্যবোধ, আদর্শ, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি তার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিলো— তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব লেগেছিল ড্রিম মার্চেন্ট কুবেরের। হঠাৎ শ্রেণিচ্যুতির যন্ত্রণা কুবেরকে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করেছে। কুবের তার শ্রেণিচ্যুতিকে এই বলে যুক্তিযুক্ত করতে চায় যে, ''সেজন্যেই তো লোকে বিষয়-আশয় করে—খারাপ সময়ে বিষয় থাকলে আশ্রয়ের চিন্তা থাকে না। বিষয় মানুষকে দেখে—আশ্রয় দেয়।''[২] কিন্তু এককভাবে তার উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশ এবং তারপরেও পুরানো মূল্যবোধ, আদর্শ, সংস্কার, বিশ্বাস ত্যাগ করতে না পারার ফলে সে ভয়ঙ্কর একাকী, নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে থাকে। এর ফলে সে আরও বিষয়ের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। বাড়তে থাকে দখলের ডিটারমিনেশন। ড্রিম মার্চেন্ট কুবের হয়ে ওঠে চক্‌দার কুবের। পরিত্যক্ত দ্বীপে (মেদনমল্লর চর) বিঘার পর বিঘা জমি দখলে রেখে চাষ-আবাদ করা। এই বিশাল কর্মযজ্ঞেও (যেখানে সে প্রায় নিজের সব সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করেছে) সে কোনও মানসিক আশ্রয় পায় না। এজন্যই হয়তো কিশোর বয়সের একটি 'স্যাড এক্সপিরিয়েন্স' তাকে এখনও তাড়া করে বেড়ায়। কারণ পুরানো মূল্যবোধগুলো তাকে তখনও খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে। এরপর কুবের শেষ চেষ্টা হিসাবে আভাকে (ব্রজ ফকিরের স্ত্রী) আশ্রয় করে। কিন্তু আভা গর্ভবতী হয়ে পড়লে পুনরায় পুরানো মূল্যবোধগুলো দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। কুবের এই সমস্যার সমাধান করে আভাকে খুন করে। প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে দীর্ঘদিন পরে কুবের যখন কদমপুরে নিজের তৈরি করা বাড়িতে আসে, তারপরেও সে মিশে যেতে পারে না নিজের পরিবারের সঙ্গে। উচ্চবিত্ত থেকে শ্রেণিচ্যুত, নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে শ্রেণিচ্যুত, কুবের আরও নিঃসঙ্গ, একাকী হয়ে যায়। সে নিজের তৈরি করা বিষয়ে মানসিক আশ্রয় পায় না, নিজের পরিবার থেকে আশ্রয় পায় না। এই নিরাশ্রয়তা তাকে ভুলে যাওয়া রোগে আক্রান্ত করে। কিন্তু বেছে বেছে তো জিনিস ভোলা যায় না। কুবের এরপরেও লড়াই করে। আভার বলা চাঁদের রহস্য সন্ধানে সে নিজে ব্রতী হয়। জীবন ও জগতের প্রতি এই প্রগাঢ় বিস্ময় (ভালোবাসাও বলা যেতে পারে) 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যে অনন্য করে তুলেছে।

নাগরিক জীবনকে অভিজ্ঞতা করে লেখা প্রথম উপন্যাস হলো 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' (পূর্বনাম-বৃহন্নলা, ১৯৬১)। নগর জীবনে বড় হয়ে ওঠা এক যুবক (প্রথম দত্ত) কীভাবে নিজের

তৈরি ছদ্মবেশে ধুঁকছিল এবং ছদ্মবেশ থেকে তার বেরিয়ে আসার চেষ্টা— এই বিষয় নিয়েই রচিত উপন্যাসটা। কলকাতায় এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়ে উঠেছে প্রমথ দত্ত। বাড়ির সকলেরই প্রত্যাশা সে ভালো কিছু করবে এবং বাড়ির অভাব মোচনের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিবে। পরিবারের অন্যান্য পুরুষেরা (বাবা, দাদা, ভাই) কিছু না কিছু উপার্জন করে। একমাত্র প্রমথ দত্তই বেকার (চাকুরি না পাওয়া) যুবক। অবশ্য সে পত্রিকায় গল্প লেখে। 'সততাই পরম ধর্ম'— ছোটবেলা থেকেই এই রকম আদর্শবোধ, বিশ্বাস দ্বারা সে আক্রান্ত। কিন্তু তাকে ঘিরে প্রত্যাশা, তার নিজস্ব জৈবিক চাহিদা এবং সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক ধরনের ছদ্মবেশ তৈরি করে। এই ছদ্মবেশ মানুষের প্রকৃত রূপকে ঢেকে রাখে। ছদ্মবেশের চটকে অনেকের মুগ্ধতা, নিজেকে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি দেয়। এরফলে নিজেও সে ছদ্মবেশের মোহে আচ্ছন্ন থাকে।

অনেক মানুষ হয়তো সেটাকে আসল রূপ ধরে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু সমস্যা হয় প্রমথ দত্তের মত কিছু মানুষদের, যাদের রয়েছে এক অনুভব গভীর মন। হয়তো লেখালেখির সূত্র ধরে প্রমথের এই অনুভব গভীরতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। বড় হয়ে ওঠার সময়ে যে মূল্যবোধ, বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছিল; সেই বিশ্বাস, সংস্কার তার বর্তমান জীবনের যাপন পদ্ধতির সঙ্গে মেলাতে পারছিল না। এখান থেকেই সংকট শুরু হয় প্রমথ দত্তের। সে প্রেম করে কিন্তু ভালোবাসে না। অনেক নারীসঙ্গ করেও সে কাউকে ভালোবাসতে পারেনি। কারণ ভালোবাসার জন্য পরস্পরের প্রতি যে বিশ্বাস, সততা থাকা প্রয়োজন— তার অভাব ছিলো প্রমথের মধ্যে। তাই চাকরি প্রমথর প্রকৃত প্রতিবন্ধক নয়, নিজের মিথ্যা স্বরূপ প্রকৃত ভালোবাসার জন্য প্রকৃত প্রতিবন্ধক হিসাবে উঠে আসে। আরও বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, আসলে এই প্রতিবন্ধকতা হলো পুরানো সংস্কারের সঙ্গে ছদ্মবেশের আমদানি করা সংস্কারের। যেখানে আবার প্রবলভাবে কাজ করেছে প্রমথ দত্তের জৈবিক চাহিদা ও সমসাময়িক যুগ-পরিস্থিতি। ছোটবেলায় আঁকড়ে ধরা বিশ্বাস তার সংস্কারে পরিণত হয়ে গেছে, মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। তাই প্রমথ দত্তের সৎ হতে চাওয়া লাইনটি উপন্যাসে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। দুই সংস্কারের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে সে হঠাৎ অনুভব করে সে ছদ্মবেশে ধুঁকছে।

আসলে আমাদের এই প্রমথ দত্তকে মনে হয় কুবের চরিত্রেরই নগর জীবনের প্রেক্ষাপটে অবিবাহিত যুবক চরিত্রের সংস্করণ। এই কাহিনির শেষদিকে অবশ্য প্রমথ দত্তর বিয়ে হচ্ছে। কুবের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে শেষে চাঁদের রহস্য সন্ধানে (জীবন ও জগতের প্রতি প্রগাঢ় বিস্ময়)

ব্রতী হয়, প্রমথ দত্তও বীথিকে অবলম্বন করে ছদ্মবেশ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। তাই আমরা দেখি প্রমথ দত্ত শেষপর্যন্ত বীথিকে বিয়ে করে। বীথির গলায় অনুভব করেছে জঙ্গলের স্বর বা বনের। জঙ্গল বা বন আমাদের কাছে আদিম জীবনের ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে আসে। এই আদিম জীবন অবশ্য প্রতীকী অর্থ বহন করছে। আদিম জীবনের সরলতা, সততা ইত্যাদি বিষয়কে প্রতীকায়িত করে জঙ্গলের স্বর। নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রমথ দত্তের এই চেষ্টাই বৃহন্নলার ছদ্মবেশ বা অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। এটাই 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

'অনিলের পুতুল' (১৯৬৩) উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই মৃত্যু, দম্ভ, শোক, অসুখ এবং ওষুধ কীভাবে পাশাপাশি বাস করে। উপন্যাস শুরু হচ্ছে তরঙ্গিণীর আসন্ন মৃত্যু সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে। তখন থেকেই শোকের পরিবেশ ছেয়ে যেতে থাকে সবার মধ্যে। তারপর তরঙ্গিনীর মৃত্যু এই পরিবেশকে আরও ঘন করে তোলে। এখানেই শেষ নয়, অনিলের পরিবারে মায়ের দীর্ঘকালীন অসুখ (যার জন্য প্রথম দিকে তার বড় বোনের মৃত্যু সংবাদ তাকে দেওয়া হয়নি) ও বউয়ের মাঝে মাঝেই অসুখে ভোগা, অনিলকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কারণ সে যে আয় করে, তাতে সংসার চালাতে গিয়েই তাকে হিমশিম খেতে হয়। তার উপর অসুখের এভাবে নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠা। এরফলে সঠিকভাবে চিকিৎসাও হয় না অনিলের মা (সেজো) ও তার বউ (পুতুল)-এর। কিন্তু অনিলের মায়ের বাবা যে আর্থিক সাফল্য পেয়েছিল (যদিও নীতিবোধ বিসর্জন করে) তাই নিয়ে তার মা, মাসী, মামাদের যে গর্ব, দম্ভ ছিল তা কালক্রমে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়েছে। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে তারা পেয়েছিলো মিথ্যা দম্ভ ও বড়লোক হবার উচ্চাশা। তাদের বাবা সুযোগ্য পাত্র খোঁজার বদলে কুলীনত্বকে গুরুত্ব দিয়েছে। তবে কুলীনত্বকেও ছাপিয়ে গিয়েছে টাকা বাঁচানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই মনে হয় কয়েকটি বিয়ে প্রায় ঘরোয়া পুজোর মতো নম নম সেরে ফেলা হয়। এরফলে কোনো মেয়েই আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ছেলে পায়নি।

এই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে অনিলকুমার রায়চৌধুরী বড় হয়ে উঠেছে। নিজের পরিবারের সামগ্রিক বাস্তব অবস্থা তাকে ক্রমশ পীড়িত করে। সে ভয় পেতে শুরু করে বাস্তব বা কল্পিত সব ধরনের রোগকে। মৃত্যুও তার কাছে এত ভয়ের না, কারণ তা নিজের বা অন্যের সব ধরনের কষ্ট থেকে রেহাই। এই পারিবারিক অবস্থা অনিলের সমস্যাকে আরও গভীর করে তোলে ব্যক্তি অনিলের সমস্যা। জৈবিক চাহিদা ও মানসিক চাহিদা তাকে অনেকের মাঝে নিঃসঙ্গ করে দেয়। ফলে নিজের

সম্পর্কে কল্পিত রোগের কথা চিন্তা করে আরও বেশি ভয় পেতে শুরু করে। এই ভয় তার স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার বড় প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। চরিত্রের পলায়নী মানসিকতা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কখনও দেখা যায়নি। তাই অনিলের যখন মনে হয় তার বাড়ির সিঁড়ি থেকেই 'পৃথিবীটা কঠিন হতে আরম্ভ করেছে', তখন সেই কঠিন রাস্তা থেকে লেখক সৌন্দর্য টেনে বের করে আনেন। জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা না থাকলে এটা সম্ভব নয়। যখন রাস্তা সহজ হবার উপায় দুরতিক্রম্য, তখন কঠিন রাস্তাকেই জড়িয়ে ধরো। তাতে রাস্তা সহজ না হলেও চলতে গিয়ে থেমে পড়তে হবে না। মানসিকতার এই গড়ন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই। অনিল তার মধ্যে ব্যতিক্রম নয়। তাই, ''সকালবেলা অনিলকুমার রায়চৌধুরীর কলকাতার পথঘাট ভালো লাগছিল। আজ পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল, তার বুকের মধ্যে মাংসের ধাপ বেয়ে রক্তের ফোঁটা টুংটাং শব্দ করে গড়িয়ে নেমে আসছে। অথচ এই ট্রাম লাইন পথ কত টেকসই লাগছিল কদিন ধরে— পৃথিবী নাকি এখানে থেকেই কঠিন হতে শুরু করেছে।''[৩] জীবনের প্রতিকূলতার প্রতি এই খোঁচা দিয়েই এগিয়ে চলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা।

আমরা সকলেই জানি যে, বাংলাদেশ নদীমাতৃক। হয়তো এই কারণেই অনেক প্রথম শ্রেণির লেখকের লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে নদী। অবশ্য শুধু নদী নয়, নদী তীরবর্তী মনুষ্য-জীবনও হয়ে উঠেছে তাদের লেখনীর বিষয়। বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকে আজ (একুশ শতক) পর্যন্ত এই ধারা নদীর মতোই বহমান। আমাদের আলোচ্য শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সম্ভারেও নদী ও নদী তীরবর্তী জীবন বিষয়টি বিদ্যমান। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি যে উপন্যাসটি (একমাত্র) লিখেছেন, সেটি হলো 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' (২০০১)। লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ উপন্যাস। গঙ্গা নদী ও পার্শ্ববর্তী জীবন (কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল) সম্পর্কে লেখক বলেছেন, ''গঙ্গা নদীর স্বভাব চরিত্রই এখানকার মানুষের ইতিহাস, সভ্যতা। গঙ্গার জন্যেই কলকাতার রাজধানীতে প্রমোশন। গঙ্গার জন্যই পাটকল। ... কলকাতাকে ঘিরে— গঙ্গাকে কোনো না কোনোভাবে ছুঁয়ে পঞ্চাশ ষাট মাইল জুড়ে এমন জমজমাট হাসি কান্না, ঝগড়াঝাটি, ভালোবাসার ভেতর গাদাগাদি করে দু'তিন কোটি মানুষ মহামজায়-মহাদুঃখে-মহাআহ্লাদে কাজকর্ম করছে— ঘুমোচ্ছে-খাচ্ছে দাচ্ছে-অসুখে ভুগছে-নামাজ পড়ছে, ঠাকুর ভাসান দিচ্ছে— ভোট দিচ্ছে— গোহাটায় বলদ কিনছে— তাঁত বুনছে— ট্রানজিস্টরে গান, খবর সব শুনে যাচ্ছে— খবরের কাগজ পেলেও পড়ে ফেলছে— শীতে ধানকাটা মাঠে যাত্রা শুনছে।''[৪]

গঙ্গা নদী যেখানে ভাগীরথী থেকে হুগলী নাম নিয়েছে মূলত সেই অঞ্চলের (কালীনগর, মৌভাসা, উলুবেড়ে, আছিপুর ইত্যাদি) মানুষজন নিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। তবে এই উপন্যাস বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেনি। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হাজরা হালদার। স্ত্রী, সাত মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে তার দরিদ্র সংসার। গঙ্গা তার একদা বিচরণ ভূমি ছিলো। বার্ধক্যজনিত কারণ এবং অর্থের অভাব তাকে কাজ ছাড়তে বাধ্য করে। মানুষ কখনও কখনও জীবিকার সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে, সেই জীবিকা ত্যাগ করলেও মানুষের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। হাজরা হালদার সেই ধরনের চরিত্র। বড় গাঙে ইলিশ মাছ ধরার স্বপ্নকে হাতিয়ার করে সে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে চায়। নিজের সম্মান বৃদ্ধি, আর্থিক সঙ্গতি ও বার্ধক্যে আর্থিক নিরাপত্তা— এই স্বপ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকা হাজরা বড় গাঙে ইলিশ ধরতে গিয়ে তার বাস্তব বুদ্ধি ও সংযমের অভাব ধরা পড়ে। মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। ফলস্বরূপ হাজরার স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটে সেই নদীতেই। এভাবেই লেখক যেন এখানে দেখাতে চেয়েছেন একটি নদীকে ঘিরে কতজনের কত স্বপ্ন জন্ম নেয়, আবার সেই নদীতেই স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটে। তারপরেও অবশ্য স্বপ্ন দেখা বন্ধ থাকে না। কারণ জীবন তো চলমান, তাই স্বপ্নও জীবনের সঙ্গে চলমান।

গঙ্গার ওপারে বেলুড়ের একটি ইস্পাত কারখানায় প্রথম কর্মজীবন শুরু হয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের। প্রায় তিন বছর ধরে ন্যাশনাল আয়রণ অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানির ওপেন হার্থ ফারনসে তিনি কাজ করেছিলেন। এখানে কাজ করার অভিজ্ঞতাই 'নিবার্ন্ধব' (১৯৭২) উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে। উপন্যাসের মূল বিষয় হলো সঙ্গহীনতায় ভোগা নিঃসঙ্গ নায়কের সঙ্গ-ভালোবাসা অন্বেষণ। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিবারণ পাকড়াশি। কিছুটা নিজস্ব লড়াই এবং কিছুটা অনিল দত্তের আনুকূল্যে (কর্মক্ষেত্রের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ) বর্তমানে সে মোটামুটি সফলভাবেই প্রতিষ্ঠিত। সুন্দরী সংসারী স্ত্রী (রেবা), বড় বাড়ি, গাড়ি (ড্রাইভারসহ) নিয়ে নিবারণের সংসার সাজানো। কিন্তু তারপরেও সে সুখী নয়, তৃপ্ত নয়। অবশ্য মানুষ সাধারণত জীবনের কোনো অবস্থাতেই সুখী বা তৃপ্ত হয় না। কিন্তু নিবারণের সমস্যা অন্য জায়গায়।

উপন্যাস শুরু হচ্ছে আদালতে একটি মামলার শুনানির মধ্য দিয়ে। নিবারণ খুনের আসামী হিসেবে অভিযুক্ত। খুন হয়েছে নিবারণের অফিসের অফিসার অনিল দত্ত। সে আবার নিবারণের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত। যদিও খুন লুকোবার কোনও চেষ্টা আমরা নিবারণের মধ্যে লক্ষ্য করি

না। তার সহজ স্বীকারোক্তি, সে অনিল দত্তকে খুন করেছে। অবশ্য খুন করার কোনও অভিপ্রায় নিবারণের ছিলো না। যখন বিচারক তার কাছে জানতে চায়, সে কেন খুন করেছে? এর উত্তরে নিবারণ জানায়, ''উপায় ছিল না হুজুর।

কিসের?

আমি যে অনিলের আত্মার হদিশ পেয়ে গেছি স্যার। পরিষ্কার দেখতাম ওর বুক ফুটো হয়ে নীলচে আলো উথলে পড়ছে।''[৫]

বুক ফুটো করে বেরিয়ে আসা আত্মার নীল আলোর এই অন্বেষণই নিবারণকে সুখী করে না বা তৃপ্ত হতে দেয় না। কারণ ক্রমাগত তার অন্বেষণ চলতে থাকে। কিন্তু সফলতা সে কোনওখানেই পায় না। এরজন্য সে বিভিন্নজনের সঙ্গে মেলামেশা করে। স্ত্রী রেবার সঙ্গে অনেকদিন মেলামেশা করেও সে আত্মার নীল আলোর হদিশ খুঁজে পায়নি। স্ত্রীকে বড় বেশি সাধারণ, আর পাঁচজন স্ত্রীর মত লাগে তার। যার ভালোবাসার জন্যে নিজস্ব কোনও উদ্যোগ নেই, উদ্যম নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্কটা রেবা দেখে প্রথামাফিক ভালোবাসার সম্পর্ক হিসেবে, সামাজিক আর পাঁচ-দশটা নিয়মের মতো।

স্ত্রী ব্যতীত নিবারণ তার বন্ধুদের সঙ্গেও মেলামেশা করে। বন্ধুরা যাতে তার সঙ্গে বেশি করে সময় কাটায়, সেই জন্য নিবারণ প্রচুর অর্থ খরচ করে। এমনকি তার সঙ্গে মেশার জন্যে অর্থ দিতেও সে প্রস্তুত থাকে। মদ্যপানের প্রতি কোনও আসক্তি না থাকা সত্ত্বেও বন্ধুদের সঙ্গে বসে নিয়মিত মদ্যপান করে, তাদের সঙ্গে নিষিদ্ধ পল্লীতে যায়। কিন্তু এত কিছু করার পরেও সে ব্যর্থ হয়। এছাড়াও আরও দু'জন মানুষের ওপর তার অন্বেষণ প্রক্রিয়া চালায়। একজন লতা (বন্ধু মাখনের স্ত্রী) ও অন্যজন অনিল দত্ত। লতার কাছে নিবারণের এই অন্বেষণ তার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া অন্য অনেক পুরুষের মধ্যে এক পুরুষের আকাঙ্ক্ষা হিসাবেই দেখে। অন্যদিকে অনিল দত্তের মনে হয় নিবারণ কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বা আরও বেশি আনুকূল্য পাবার জন্য তাকে 'তেল' (তোষামোদ) দেয়। অন্যদের ভাবনাকে নিবারণ খুব একটা পাত্তা দেয় না। কারণ তার এক ও একমাত্র লক্ষ্য ছিলো, যে কোনো উপায়ে ভালোবাসার নীল আলোয় অন্তত একবার স্নাত হতে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সে সবকিছু করতে প্রস্তুত। তাই একরাতে অনিল দত্তের সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে অনিল দত্তের বুক ফুটো করে বেরিয়ে আসছে আত্মার নীল আলো। ভালোবাসার সেই নীল আলোতে স্নান করবার লোভ নিবারণ সামলাতে পারেনি। তাই আলোর বেরিয়ে আসার পথ পরিষ্কার

করতে গিয়ে অনিল দত্তের বুকের বাঁদিকে একটা টেব্‌ল ফর্ক বসিয়ে দেয়, মৃত্যু হয় অনিল দত্তের। আদালতে নিবারণ খুনের স্বীকারোক্তি দিলেও তার ভাবনাচিন্তা বিচারকের কাছে অপ্রকৃতিস্থ মনে হয়। তাই মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে তাকে উপস্থিত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি ডাক্তাররাও তাকে অপ্রকৃতস্থ সাব্যস্ত করে তাহলে নিবারণ খুনের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। যে সঙ্গ-ভালোবাসার অন্বেষণ নিবারণ পাকড়াশির মূল লক্ষ্য ছিলো তা অনিল দত্তের কাছে এসে সফলতা লাভ করেছে। অনিল দত্তের সঙ্গসুখ নিবারণের স্মৃতি বা স্বপ্নে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সঙ্গ-ভালোবাসার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসেই বারে বারে এসেছে।

'পরস্ত্রী' (১৯৭১) উপন্যাসে অধ্যাপক জগদীশ রায়ের চরিত্রের মধ্যেও আমরা সঙ্গ-ভালোবাসার অন্বেষণকে দেখি। বর্তমানে জগদীশ রায় একজন প্রতিষ্ঠিত সফল মানুষ। কর্মক্ষেত্রে তার সুনাম রয়েছে। বাড়িতেও পারিবারিক সদস্য হিসেবে, স্বামী হিসেবে কর্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্বপরায়ণ। স্বামী জগদীশের প্রতি স্ত্রী হিসাবে দেবীর সেরকম কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু এই নিস্তরঙ্গ সাংসারিক ও কর্মজীবন জগদীশ রায়ের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, সাধকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তাই সে বলে, ''আমি রোজ ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে যাচ্ছি। আমি অনেক কিছু করতে পারি। আমার অনেক কিছু করার আছে। আমাকে পেছন থেকে বারবার বলতে হবে— বাক্ আপ, বাক্ আপ জগদীশ— তাহলে আমি রেসের এক নম্বর ঘোড়ার চেয়েও আগে আগে ছুটতে পারি।''[৬] আসলে জগদীশ রায় থেকে অধ্যাপক জগদীশ রায় হবার যাত্রাপথ তার জীবনে ঘটনাবহুল, তরঙ্গে আন্দোলিত। লেখকের অনেক উপন্যাসে তার প্রধান চরিত্রেদের মধ্যে সৎ হবার প্রবণতা লক্ষণীয়। এই উপন্যাসেও আমরা তা দেখতে পারি জগদীশের মধ্যে। জগদীশ রায় জীবনের প্রথম দিকে নানা অসামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। তার আগে প্রেমে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সে। প্রত্যাখ্যানের আঘাত জগদীশকে জীবন সম্পর্কে একটি কঠিন শিক্ষা দিয়ে যায়, একমাত্র ভালোবাসাই ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না।

জগদীশ রায়ের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো বিস্মৃত হওয়া। প্রত্যাখানের ধাক্কা কাটিয়ে নতুন ভাবে জীবন শুরু করে সে। কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে জড়িয়ে যায়। এই সব কাজের চাঞ্চল্যই তাকে ভালোবাসার অন্বেষণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এরপরই তার মধ্যে সৎ হবার প্রবণতা জেগে ওঠে। হয়তো তথাকথিত অসৎ কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার ফলেই জলের উপরে মাথা ভাসিয়ে নিশ্বাস (সৎ হবার ইচ্ছা) নেবার ইচ্ছা জোরাল হয়। তবে এই পথের কাঠিন্য

তাকে হয়তো ভালোবাসার অভাব অনুভব করতে দেয় না। কিন্তু যখন সে প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় অধ্যাপক হয়ে উঠলো এবং সংসারের স্বচ্ছলতা, ভবিষ্যৎ জীবনের ইনসিওরেন্সের নিরাপত্তা, স্বামীভক্ত স্ত্রী, পোষ্য গরু ও মুরগি নিয়ে সুখী গৃহকোণের আয়োজন সম্পূর্ণ তখন জগদীশের জীবন হয়ে উঠলো অনেক শান্ত, সুস্থির ও প্রায় তরঙ্গহীন।

এই আপাত তরঙ্গহীন জীবনে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে শুরু করে জগদীশ। তার অনুভবে ধরা পড়ে নিজের সম্পর্কে তারই আবিষ্কৃত এক তথ্য। সবাই তাকে পছন্দ করে কিন্তু কেউ ভালোবাসে না। জীবনের স্বাদ পান্‌সে হতে থাকে তার। লেখকের কাছে সবসময় গুরুত্ব পায় ভালোবাসাযুক্ত সঙ্গ। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোও এই ভালোবাসাযুক্ত সঙ্গের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেঁচে থেকেছে। এই অন্বেষণই মানুষের জীবনকে অনেক বেশি অর্থময় করে তোলে। উপন্যাসে দেখি পৌঢ় জগদীশের জীবনে প্রবেশ ঘটে তারই বাড়িতে আশ্রিতা মালতীর। জগদীশের কাঁধে দায়িত্ব বর্তায় মালতীর স্বামী সুকুমারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা। কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দায়িত্ব নেবার পর থেকে মালতীর প্রতি জগদীশের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। মালতী বিষয়টি মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও তার ও বিশেষ করে সুকুমারের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিশ্চুপ থাকে। জগদীশের ভালোবাসাযুক্ত সঙ্গ পাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে দখলের ইচ্ছা, অন্য প্রজন্মকে নিবিড়ভাবে জানার ইচ্ছা, নতুনত্বের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি। মালতীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনে সে শেষপর্যন্ত অনুভব করে জোর করে কখনও (এমনকি ভিক্ষে করেও) ভালোবাসা পাওয়া যায় না। কোনও তুক-তাক্, ঝাড়-ফুক্, মাদুলি, বশীকরণ মন্ত্রের মধ্য দিয়েও পাওয়া যায় না। ভালোবাসা খুঁজে নিতে হয়, আবিষ্কার করতে হয়। আর তা করতে হয় হয়তো আমাদের দৈনন্দিন যাপন থেকেই। অধ্যাপক জগদীশ রায় দৈতরির (বাড়ির ভৃত্য) গ্রামে গিয়ে দেখে তার স্ত্রী আজুবাঈ দৈতরির কাছে ফিরে এসেছে (দৈতরির স্ত্রী দৈতরির ভাইয়ের সঙ্গে একসময় ঘর ছেড়েছিল) কোনওরকম মাদুলি-কবচ-মন্ত্র ছাড়াই। আসলে ভালোবাসার মানুষকে দখলে রাখার জন্য, বশ করার জন্য, আটকে রাখার জন্য অন্য কোনও কিছুর দরকার হয় না; শুধু ভালোবাসা ছাড়া। জগদীশ রায়ের এই অনুভবগুলো স্ত্রী দেবীকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। আর দেবীর মধ্যেও একটি সুন্দর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে যতটুকু খামতি ছিল (মনে হয় মালতীর পরামর্শে), সেটা দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়। এভাবেই ভালোবাসার একটি রূপ দেখিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে লেখা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র উপন্যাস

'ফিরোজা' (১৯৭৪) । উপন্যাসের পটভূমি খুলনা শহর। সদ্য বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন হবার আট-নয় মাস আগে লুৎফর (আওয়ামি লিগের M.L.A) ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী ফিরোজা সন্তানসহ কলকাতায় পালিয়ে এসেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর লুৎফর স্ত্রী-সন্তানসহ বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। এদের সঙ্গে রয়েছে লুৎফরের বাল্যবন্ধু খোকন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরপরই ভারতে চলে আসে। নিজের জন্মভূমিকে দেখার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই খোকন সঙ্গী হয় ওদের। কৈশোরের স্মৃতি খোকনের মনে বারবার ভেসে উঠেছে। এছাড়াও সংক্ষিপ্ত আকারে রাজাকারদের অত্যাচার, মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা, নেতৃত্বহীন বাংলাদেশের ছবি লেখক তুলে ধরেছেন। তবে উপন্যাসে অনেকটা জায়গা নিয়েছে লুৎফরের বন্ধু খোকনের সঙ্গে ফিরোজার এক ধরনের ভালোবাসার সম্পর্ক। তার ফলে অন্যান্য প্রসঙ্গগুলো কিছুটা কম গুরুত্ব পায়। তবে লেখক এই ফিরোজার মধ্য দিয়ে যেন মানবতার জয়গান করেছেন। একদা রাজাকারদের দলের সদস্য রশিদকে বাঁচানোর জন্য ফিরোজার মরিয়া চেষ্টা এটাই প্রমাণ করে। অন্যদিকে খোকন চরিত্রের মধ্য দিয়ে জন্মভূমির প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য টান (বাঙ্গালদের) আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

উড়িষ্যার কোনারক মন্দির ও সমুদ্রসৈকতের প্রেক্ষাপটে লেখা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস হলো 'স্বর্গে তিন পাপী' (১৯৭৫)। পরশুরাম, চন্দ্রকান্ত ও অক্ষয়— এই তিন বন্ধুকে নিয়ে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। তিন বন্ধু অনেকদিন পর একদা কলেজের বান্ধবী মীরার কাছে এসেছে। মীরা বিবাহিত। তার স্বামীর কর্মসূত্রে তাকে উড়িষ্যায় থাকতে হয়। এই মীরাকে ঘিরে তাদের মধ্যে এক ধরনের দেহজ আকর্ষণ কলেজের সময় থেকে এখনও বিদ্যমান। বিষয়টি মীরার কাছেও অজনা নয়, তাই হয়তো কিছুটা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় মীরার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। এটা প্রায় 'বনবাসী' মীরার কাছে জীবনের রসাস্বাদনের একটি উপায় মাত্র। ফলে এই চারজনকে ঘিরে আকর্ষণের অতীত স্মৃতি ও বর্তমান মুহূর্তের একটি বুনোট তৈরি হয়। মীরার স্বামী নীলাদ্রি তাদের একসময়ের সহপাঠি ছিল (তাদের মত ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়)। উপন্যাসে যাকে অনেক নিষ্ক্রিয় ও প্রায় দর্শকের ভূমিকায় দেখা যায়। পরবর্তীকালে তিনজনের হঠাৎ করে মীরা ও নীলাদ্রির কাছে আসার আসল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এখান থেকে মূর্তি চুরি করে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা। মূল পরিকল্পনা ছিল চন্দ্রকান্তের (বন্ধুদের মধ্যে লিভার স্বরূপ)। এই কাজ করতে গিয়ে সমুদ্রের জোয়ারের জলে তারা আটকে যায়। প্রায় ভেসে যাবার পথে তিনজনে তিনখানা পাথর ধরে নিজেদেরকে

সামলে নেয়। কিন্তু ডাঙায় ফিরে আসার উপায় নাই। চারিদিকে চাঁদের আলোয় জোয়ারের জল সাদা হয়ে আছে। শুধু শোনা যাচ্ছে জলের প্রবাহিত হবার একটানা আওয়াজ ও ঢেউয়ের শব্দ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা তিন বন্ধুকে আত্মমূল্যায়ন করতে দেখি। এরমধ্য দিয়েই উঠে আসে জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। প্রথমদিকে জীবন সম্পর্কে উদাসীন, বেপরোয়া তিন বন্ধুর সঙ্কটকালীন মুহূর্তে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও বেঁচে থাকার প্রবলতর ইচ্ছাই এই উপন্যাসকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

মধ্যবয়স্ক অনেক চরিত্র শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। 'হিম পড়ে গেল' (১৯৮২) উপন্যাসে এমনই এক চরিত্র হলেন দেবকুমার বসু। মধ্যবয়সে এসে তিনি হঠাৎ মানসিক ভাবে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে নিজের পরিবার, এলাকা, কর্মস্থল, বন্ধুবান্ধব— সবার কাছ থেকে অনেকটাই দূরে সরে যেতে হয় তাকে। দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে এক প্রকার বিচ্যুত হয়ে যান তিনি। অবশ্য এই বিচ্যুতি তাকে কখনোই গভীরভাবে আঘাত করে না। কবিতা রচনার মধ্য দিয়েই নিজের আশ্রয় খুঁজে পান তিনি। আমাদের তথাকথিত ছকে বাঁধা জীবন তার এই বিচ্যুতিকে 'পাগলামো' আখ্যা দেয়। ফলস্বরূপ তাকে বাধ্য করা হয় পরিচিত পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে দূরে সরে যেতে। বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা 'হিম পড়ে গেল' উপন্যাসটি লেখকের বিষয়বৈচিত্র্যের অসাধারণ নিদর্শন।

কিছু কিছু বিষয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বারবার ফিরে আসে। প্রথম বিষয়, দখল এবং দ্বিতীয় বিষয়, নিঃসঙ্গতা। এই দুটি বিষয়বস্তুর আবরণ হিসাবে কাজ করে ভালোবাসা পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। নগর জীবনের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস ও গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা তা লক্ষ্য করতে পারি। আসলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় হয়তো জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই দু'টি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। লেখকের উপন্যাস সমগ্রের ধারাবাহিক পাঠ আমাদেরকে এই ধরনের উপলব্ধি নিয়ে আসে। যেমন নগর জীবনের প্রেক্ষাপটে লেখা 'সরমা ও নীলকান্ত' ও 'সতী অসতী' উপন্যাস।

'সরমা ও নীলকান্ত' (১৯৭২) উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র নীলকান্ত। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, গৃহস্থ, মধ্যবয়সী হলো নীলকান্ত। নিশ্চিত আয় ও ভরা সংসার (পালিত পশু নিয়ে) একটি গতানুগতিক যাপন পদ্ধতি দিয়েছে নীলকান্তকে। বিনিময়ে দখলের মানসিকতা ও উদ্যমী ভালোবাসা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গেছে। ফলে নীলকান্তর হৃদয়ে ঘুণপোকার মত বাসা বাঁধে নিঃসঙ্গতা। অফিসে

কাজ করার সময় একদা কৈশোর-প্রেম সরমার ফোন তার একঘেয়ে হয়ে আসা জীবনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার মনে হয় 'ব্যাংক অ্যাকাউন্টে'র মত 'ভালোবাসাও ট্রান্সফার' করা যেতে পারে। সরমার সঙ্গে সময় কাটানোর পরেও তার মনে হয়, ''... সাধ মেটে না কিছুতেই। শেষ হয় না। একটা জায়গা দরকার। একখানা ঘর। আগাগোড়া খুলে দেখা দরকার— সরমা কিরকম? সরমা কেমন?''[৭] একটি আপাতভাবে সুখী ভর-ভরান্ত সংসার থাকার পরেও সরমাকে একেবারে নিবিড় করে একান্ত নিজের করে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনিশ্চিত, অস্থির জীবন কাটানো সরমাকেও চমকে দেয়। কারণ সরমার মনে হয়, তাকে নিবিড় করে পাবার নীলকান্তর ইচ্ছা আসলে পুরোপুরি দখল বা অধিকার পাবার জেদ। এই জেদ কোনও মানুষের মধ্যে নিশ্চিত, নিরাপদ, সুখী সংসারে দীর্ঘদিন কাটানোর ফলশ্রুতি থেকে উদ্ভূত হতে পারে। আবার সেই সঙ্গে স্বাদ বদলানোর ইচ্ছা সেই জেদকে পুষ্টি জোগায়।

আসলে নীলকান্তর মত মানুষদের রোজকার ঘর সংসারের কাজে ডুবে থাকার ফলে প্রেমে শ্যাওলা ধরে। ফলে ধীরে ধীরে এই যাপন-পদ্ধতি থেকে ভেসে ওঠে নিঃসঙ্গতা যা রোজকার ঘর-সংসারের কাজ মুছে দিতে পারে না। যাদের মোটামুটি নিরাপদ নিশ্চিন্ত আয় রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই সাধারণত নিঃসঙ্গতা বড় হয়ে ওঠে। কারণ এই সব মানুষেরা মধ্যবয়সে এসে 'মিডল এজ প্রবলেম'-এ ভোগেন। এদের কাছে খুব বেশি আনন্দ বলতে সম্ভোগের মুহূর্তের সমষ্টি। তারপর কেজো কথার পরিবর্তে আর তেমন কিছু করার বা বলার কথা স্ত্রীর সঙ্গে থাকে না। এজন্য নীলকান্ত পরিষ্কার দেখতে পায়, ''আমরা পৃথিবীতে আছি ভালোবাসাবাসির জন্যেই। আমাদের আত্মা বা সোল কোন রঙের তা জানি না। ... অথচ সবসময় আমরা একজন আরেকজনের ওই জিনিসটা ছুঁতে চাইছি, হাত দিয়ে ধরে দেখতে চাই। হয় না বলেই যতটা কাছে যাওয়া যায়— এই ভেবে আমরা বুকে বুক লাগাই, পারলে পিষে ফেলে আত্মার খোসা একেবারে ভেঙে ফেলতে চাই।''[৮] এজন্যই হয়তো সবকিছু থাকার পরেও নীলকান্তর মধ্যে সরমাকে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মায়।

সরমার কাছে একটি স্থির, নিশ্চিত, নিরাপদ জীবনের হাতছানি থাকলেও শেষপর্যন্ত সে পুরানো অভ্যস্ত জীবনকেই বেছে নেয়। কারণ দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত জীবন থেকে বের হবার জন্য যে সাহস দরকার হয়, তা সরমার মধ্যে ছিল না। আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যতগুলো মানসিক বাধা পেরোতে হত, তা সরমা করতে পারেনি। ফলে মধ্যবয়সে এসে নীলকান্তর দীর্ঘকালের পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্যুতি তার একঘেয়ে জীবনের একটি পরিণাম হিসাবে আসে।

প্রায় একই রকম বিষয় নিয়ে লেখা উপন্যাস হলো 'সতী অসতী' (১৯৭৫)। উপন্যাসের প্রথম অংশটির নাম 'সতী' এবং দ্বিতীয় বা শেষ অংশটির নাম 'অসতী'। উপন্যাসটিকে ঘিরে রয়েছে প্রেম, অপ্রেম, দখলের অধিকার, দেহ নির্ভর ভালোবাসা, মধ্যবিত্ত নিরাপত্তাবোধ ইত্যাদি। উপন্যাসের দু'টি অংশে দুটি কাহিনি বলেছেন লেখক। দু'টি কাহিনিতেই সমাজে প্রচলিত সতীত্বের ধারণা প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নারী-পুরুষের ভালোবাসায় বিশেষ করে নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসায় পুরুষের মধ্যে নারীর সবটা দখলের মনোভাব সুপ্ত থাকে। 'সতী' অংশে দেখা যায়, হেমন্ত একসময় রোগাটে গরীব রাজেশ্বরীকে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে করেছিল বাসবীকে। তার দেহজ ভালোবাসা হেমন্তের কাছেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। বাসবী নিজের চেয়ে কম বয়সের একটি ছেলের (অবিনাশ) সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়। হাতেনাতে ধরার পর হেমন্ত তাকে ঐ ছেলেটির কাছেই পাঠিয়ে দেয়। দাদা-বৌদির সংসারে সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই গতানুগতিক জীবন কাটাতে থাকে হেমন্ত। একদিন ঝোঁকের মাথায় বেশ্যাপল্লীতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আদালতে জামিন নিয়ে ফেরার পথে হঠাৎ দেখা হয় একদা প্রেমিকা রাজেশ্বরীর সঙ্গে। যাকে জীবন যুদ্ধের কঠিন পথে বেঁচে থাকার জন্য বেছে নিতে হয়েছে পুরুষের দৈহিক ক্ষুধা মেটানোর কাজ। হেমন্ত পুনরায় ফিরে যেতে চায় সেই পুরানো দিনগুলোতে । হেমন্ত নিজের দোষ স্বীকার করে রাজেশ্বরীকে বিয়ে করে তার বর্তমান জীবন থেকে মুক্তি দিতে চায়। কিন্তু অনেক পুরুষের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পাওয়া রাজেশ্বরী উপলব্ধি করে আর পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে হেমন্তের ভালোবাসার কোনও পার্থক্য নেই। হেমন্তর ভালোবাসা এখনও দেহকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। এখনও হেমন্তর মধ্যে দখলের মানসিকতা রয়েছে। তাই রাজেশ্বরী বলে, ''এই এক দোষ তোমাদের। পুরোপুরি দখল না করতে পারলে সুখ পাওনা।''[৯] হেমন্ত নিজেও উপলব্ধি করে, সে রাজেশ্বরীকে পুরোপুরি দখল করতে চায়। আর তা পারে না বলেই অতৃপ্তি হেমন্তকে তাড়া করে বেরায়। শেষপর্যন্ত হেমন্তর দখলে কোনও নারীই থাকে না, এমনকি ছেলেরও দখল ছেড়ে দিতে হয় বাসবীর কাছে। এই কাহিনির শেষে দেখা যাচ্ছে হেমন্ত আবার উপস্থিত হচ্ছে বেশ্যাপল্লীতে যেখানে অর্থের বিনিময়ে কিছুক্ষণের জন্য কোনও নারীর পুরোপুরি দখল নেওয়া যায়।

'অসতী' অংশের কাহিনিতেও আমরা এই দখলের গল্প শুনি। 'সতী' অংশে বাসবী বা রাজেশ্বরী কেউই শেষপর্যন্ত ফিরে আসেনি হেমন্তর কাছে। কারণ তারা জানত পুনরায় হেমন্তর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। বাসবী দ্বিতীয়বার ঠকাতে চায়নি কিংবা রাজেশ্বরী

অনুভব করেছিল নতুন করে হেমন্তকে ভালোবাসা সম্ভব নয়; তাই দু'জনের কাছেই সামাজিক সম্মানযুক্ত পথ বেছে নেবার সুযোগ থাকলেও তা নেয়নি। লেখকের চোখে এরাই 'সতী', সমাজ অন্য কথা বললেও। অন্যদিকে 'অসতী' অংশে নন্দা বাসবী বা রাজেশ্বরীর বিপরীত মেরুর চরিত্র। সমাজের চোখে নন্দার মত নারীরা সতী হলেও, এরাই প্রকৃত অর্থে অসতী। এছাড়া এই নন্দাকে ঘিরেও রয়েছে স্বামী পৃথ্বীশ ও রীতেশের মধ্যে সুপ্ত প্রতিযোগিতা যার ইন্ধন দাতা স্বয়ং নন্দা। এখানেও পুরুষের প্রেমে দেখা যায় দখলের মানসিকতা।

বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম একটি উপন্যাস হলো 'অদ্য শেষ রজনী' (১৯৭৭)। গ্রামের কবিয়াল বা অপেরা পার্টি নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাস রয়েছে বা বিশেষ কোনও লোকগানের গোষ্ঠী নিয়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও একটি উপন্যাস লিখেছেন কিংবা মদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির জীবন নিয়ে লেখা 'কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। অন্যদিকে নগর কলকাতার আধুনিক জীবনের অন্যতম একটি সাংস্কৃতিক অঙ্গ হলো গ্রুপ থিয়েটার। এই গ্রুপ থিয়েটারের বিভিন্ন কুশীলব, তাদের ব্যক্তিজীবনের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা, অভিনয় জীবনের উত্থান-পতন বা নতুন মোড় নেওয়া, সেই সঙ্গে গ্রুপের সদস্যদের সংযোজন-বিয়োজন, অন্য গ্রুপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষাকাতরতা, ছল-চাতুরী, সর্বোপরি একটি গ্রুপের টিকে থাকার লড়াই— এমন বিচিত্র জগৎ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে কখনও উঠে আসেনি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রথম লেখক যিনি এই অনালোচিত বিষয়কে উপন্যাসে জায়গা দিলেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজস্ব বয়ানে বলেছেন, ''দেখাতে চেয়েছি— উঠতি চাকায় চড়ে গ্রুপ থিয়েটার যখন সাফল্যে পৌঁছায়— তখনি চাকা পড়তির মুখে। সেটাই শেষ রজনীর দিকে যাত্রা শুরু। মঞ্চের নাটকের চেয়েও নাটকের মানুষগুলো নিয়ে গ্রিনরুমে আরও বড় নাটক হয়ে যায়। সে নাটকের নায়ক স্বয়ং নিয়তি।''[১০]

এই উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই উদ্যোগে তৈরি হয়েছে 'পঞ্চমুখ' নামক গ্রুপ থিয়েটার। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের দিকে তার প্রবল টান। এর পিছনে ছিল দিদার (দিদিভাই) প্রশ্রয় ও প্রেরণা। বড় হবার পর অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাটক রচনা ও নির্দেশনার কাজ। শুধু তাই নয়, প্রতিযোগিতা ও মন্দার বাজারে একটি গ্রুপ থিয়েটারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কাজ। এরজন্য অমিয়কে অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। মোটামুটি ভালো বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে গ্রুপ থিয়েটারে মনোনিবেশ করেছে। তার স্ত্রী লীলাও স্বামীর

স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সব রকমের কষ্ট স্বীকার করেছে অত্যন্ত হাসিমুখে বিন্দুমাত্র অভিযোগ ছাড়া। নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অন্যতম জায়গা হলো গ্রুপ থিয়েটার। অমিয়ও সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কখনও পিছপা হয়নি। সাংসারিক জীবনের সব রকম দায়িত্ব ও টেনশন লীলার কাঁধে অর্পণ করে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসের কাহিনি মঞ্চে প্রদর্শিত নাটক নিয়ে নয়; মঞ্চের পিছনের মানুষগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ে যে প্রকৃত নাটক গড়ে ওঠে, সেটা নিয়ে।

উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই প্রথম দিকে 'পঞ্চমুখ'-এর দর্শক টানার ব্যর্থতা। এরফলে ঋণের জালে জড়িয়ে যেতে থাকে অমিয়। তার স্ত্রীর সব গয়না ও সঞ্চিত অর্থও শেষ হয়ে যায়। তারপরেও নাটক মঞ্চস্থ করে যেতেই হবে। এটা শুধু এক শিল্পীর স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারের সকল অভিনেতা ও কর্মীর ভবিষ্যৎ জীবন-জীবিকা। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও অমিয় প্রায় একার হাতে চালিয়ে নিয়ে যায় নাটক ও 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারকে। এই ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে অমিয়র সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তৎকালীন সময়ে প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী রজনীর। বিপর্যস্ত সময়েও নতুন নাটক লেখা ছাড়েনি অমিয়। তার দুঃসাহসিক পরীক্ষায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় রজনী। মঞ্চে ও মঞ্চের বাইরে নতুন যুগলবন্দী হয়ে ওঠে অমিয় ও রজনী। তাই প্রথম কোনও নাটক হাউসফুল হবার পরেও অবলীলাক্রমে নতুন পরীক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ে অমিয়। 'সুজাতা' নাটকের মঞ্চায়ন বিরাট সাফল্যের মুখ দেখে। রজনীর ব্যক্তিগত জীবনের শোচনীয় ঘটনাও পাঠকের সামনে তুলে ধরেন লেখক। অভিনয় জীবনের জন্য রজনীর দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা, শশাঙ্কর (রজনীর স্বামী) রজনীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অবহেলা, উদাসীনতা, রজনীর প্রতি তৃপ্তির (পুরানো গ্রুপের সিনিয়র অভিনেতা) প্রবল টান ইত্যাদি এক জটিল নাটক সৃষ্টি করে। অন্যদিকে অমিয়র সঙ্গে রজনীর ঘনিষ্ঠতা, লীলার সন্দেহ এবং ধীরে ধীরে লীলার দূরে সরে যাওয়া আর একটি নাটকের জন্ম দেয়।

সাফল্য মানুষকে অনেক সময় এক ধরনের নিশ্চয়তা, স্থিতাবস্থা প্রদান করে। গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রেও সেটা ব্যতিক্রম নয়। 'সুজাতা' নাটকের বিরাট সাফল্য 'পঞ্চমুখ'কে আর্থিকভাবে সচ্ছল, প্রতিষ্ঠিত করলেও গ্রুপকে অলস করে তোলে। সফলতার শীর্ষে রোপিত হয় মৃত্যুর বীজ। সফলতার অতিবিস্তার পুরানো মাটিকে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরে যে চলমানতার শক্তিই হারিয়ে ফেলে। আর্থিক স্বচ্ছলতা মানসিক স্বস্তি ও ভাবনায় জড়তার সৃষ্টি করে। ফলে এখানে শুরু হয় আর একটি

নতুন নাটক। যে রজনীর হাত ধরে এই সাফল্য, তার স্থায়ী স্বরভঙ্গ হওয়া, স্ত্রী লীলার সন্তানসহ দূরে সরে যাওয়া, শংকরের গ্রুপের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও ছেড়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি প্রতিকূলতার মধ্যেও অমিয় বুঝতে পারে এগিয়ে চলা ছাড়া তার আর কোনও উপায় নেই। কাজ ও ভাবনার স্থবিরতা ভাঙতে একটু দেরি হলেও অমিয় পুনরায় নতুন পরীক্ষার পথে যাত্রা শুরু করে। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষের সংগ্রামের কথা যেভাবে এই উপন্যাসে উঠে এসেছে, তাতে 'অদ্য শেষ রজনী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমূল্য রত্নে পরিণত হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত চম্পাহাটিকে পটভূমিকে করে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি অন্যতম উপন্যাস হলো 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬)। আমরা আগেই বলেছি যে, একটি উপন্যাসই যেন লেখক সারাজীবন ধরে লিখে গেছেন। একটি চরিত্রকেই যেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ফেলে লেখক পরীক্ষা করেছেন। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসের কুবের চরিত্রই যেন এই উপন্যাসে হয়েছেন অনাথবন্ধু বসু। এবার তিনি মফস্বল ঈশ্বরীতলায় এসে বাড়ি করেছেন। স্ত্রী (শান্তা), দুই কন্যা (টুকু ও লিলি) আর একপাল বিভিন্ন রকমের পশু (যাদেরকে তিনি সন্তানতুল্য দেখেন) নিয়ে অনাথ বসুর গোছানো সংসার। আর্থিক সচ্ছলতার জন্য মফস্বলের মানুষ তাকে বিশেষ সমীহের চোখেই দেখে। নগরজীবনের কোলাহল ও জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে বেশ ভালোভাবেই দিন কাটছিল অনাথ বসুর। কিন্তু আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এই জীবন ও জগৎ যেভাবে ধরা দেয়, তার কাছে সর্বদা সেই ভাবে ধরা দেয় না। যেমন, ''এ সময় ঈশ্বরীতলার ওপর দিয়ে সম্ভবত নিরক্ষরীয় বায়ু বয়ে যায়। ওই বায়ু বোধ হয় কোনো লেখাপড়া শেখেনি। কেননা খালপাড়ের গাছগুলোর ডালপালা পাতাসুদ্ধ এই বাতাসে ওলট্‌পালট্‌ খাচ্ছে। ... আজ পূর্ণিমা হতে পারে। চন্দনেশ্বর মৌজা পেরিয়ে দূরের ধোঁয়াটে জায়গার ওপরকার আকাশে এরই ভেতর চাঁদের একটা আউটলাইন ফুটে উঠল। ভালো জ্যোৎস্না পেলে ঈশ্বরীতলার এদিকটা একদম বুনোপরী হয়ে যায়।"[১১] এই রকম অসংখ্য উদাহরণ এই উপন্যাসে সমগ্র কাহিনি জুড়ে আছে। ঈশ্বরীতলায় বাস করার ফলেই জীবন ও জগৎকে দেখার একটি অন্য রকম দৃষ্টি পেয়েছেন অনাথ বসু। কারণ 'জীবন এখানে প্রত্যক্ষ'। জীবন ও জগতের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ মেলামেশার পর্বের মাঝখানে তার পরিচয় হয় এক বাজিকরের সঙ্গে। এরপরেই অনাথ বসু জীবনের যাত্রাপথে আরেকটি নতুন পথের সন্ধান পান। প্রকৃতিকে শুধু নিবিড়ভাবে উপলব্ধি, উপভোগ করা নয়, সেই প্রকৃতির মাঝে নিজের উদ্যোগে কিছু জিনিস তৈরি করার আনন্দ। এরপরেই অনাথ বসুর নেতৃত্বে শুরু হয়ে যায় এক বিশাল কর্মযজ্ঞ।

প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল বিঘা চারেক জমিতে কৃষিকাজ করবে। কিন্তু তাতে তার মন ভরছিল না। সে লক্ষ্য করল ঈশ্বরীতলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে শীতকালে ধান উঠে গেলে প্রায় সবার জমি পতিত পড়ে থাকে। সব কৃষককে একজোট করে ধান চাষ করার পরিকল্পনা করেন তিনি। শুরু হয়ে যায় গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রচার। যেখানে অবিশ্বাস প্রবল সেখানে অনাথ বসুর কথায় মানুষ বিশ্বাস করে। অনাথ বসু বলে, '' আমরা ব্যাংক থেকে ধার করে যন্ত্রপাতি, পাম্প, সার, বিষ, বীজ কিনব। যাদের জায়গা এখন পড়ে থাকে— তারা চাষ করতে দিলে এক বস্তা ধান পাবে। ফসল উঠলে জমিদারের ভাগ বাদ দিয়ে অর্ধেক চাষীর। অর্ধেক ব্যাংকের। ...আমার কাজ হল— এদের সবাইকে একত্র করা।''[১২] অনাথ নিজে জামিন হয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ করলো। সকলে মিলে ধান চাষ উৎসবের চেহারা নিল ঈশ্বরীতলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। আর সেই উৎসবের রস প্রতিমুহূর্তে শুষে নিতে থাকল অনাথবন্ধু বসু। কিন্তু প্রকৃতি তার নিজের খেয়ালে চলে। এই বিশাল কর্মকাণ্ডে একের পর এক প্রাকৃতিক বাণ আছড়ে পড়তে থাকে। প্রথমে মাজরা পোকা, তারপর পাম্প থেকে জল না ওঠা। ব্যাংক থেকে আরও ঋণ করে মাটির নিচে বসানো হয় পাইপ। কিন্তু জলধারা এত ক্ষীণ যে তাতে বিশেষ লাভ হয় না। শেষপর্যন্ত যে ধান হল বেশিরভাগ তা পোকায় কাটা। বিঘার পর বিঘা জমি কঙ্কালের চেহারা নিয়ে পড়ে থাকে অনাথবাবুর চোখের সামনে। বিপর্যয় তখনও শেষ হয়নি। তুমুল বৃষ্টিতে বিদ্যাধরীর বাঁধ ভেঙে গিয়ে অনাথের হাঁস, মুরগি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বেড়াল, কুকুর, হাঁস, মুরগি, ছাগল অনাথের যা কিছু প্রিয়; সবাই তার সঙ্গ ছেড়ে দিল। শেষপর্যন্ত অর্থকষ্টে তার অত্যন্ত প্রিয় গরু (উমা)-কেও তিনি বেঁচে দিলেন। দেনার দায়ে ঈশ্বরীতলায় তৈরি করা বাড়িও বিক্রি করে দিতে হলো। মেয়ে, বউ নিয়ে ঠাঁই নিল কলকাতার ভাড়া বাড়িতে।

অনাথবন্ধু বসুর জীবনের পরিবর্তন দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঈশ্বরীতলার পরিবর্তনও এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। ডাকাত সন্তোষ টাকি, প্রভাবশালী দক্ষিণা চক্কোত্তি, তেলেভাজা বংশী কাপালি, জগেন যাত্রা প্রমুখ চরিত্রের পরিবর্তন ঈশ্বরীতলায় পরিবর্তীত সময়কেই ইঙ্গিত করে। এদের সকলকে নিয়ে লেখক ঈশ্বরীতলার রূপোকথা নির্মাণ করেন।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আবিষ্কার' (১৯৭৭) উপন্যাসটি নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপটে লেখা। আমরা জানি শ্যামলের লেখায় বিভিন্ন বিষয়-প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে। এই উপন্যাসেরও বীজ আমরা খুঁজে পাই শ্যামলেরই লেখা 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে। সেই উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র প্রমথ শেষপর্যন্ত যাকে বিয়ে করে, সেই বীথির ছোড়দি ভক্তিকে কেন্দ্র করে এই (আবিষ্কার) উপন্যাসের

কাহিনি নির্মিত হয়েছে। আমরা আগেই জেনেছি নারীপাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত নির্মল চক্রবর্তী কাঠের ব্যবসায়ীর পরিচয় দিয়ে ভক্তি লাহিড়ীকে বিয়ে করে। বিয়ের পর ভাড়া বাড়িতে তিন মাস একসঙ্গে কাটায় তারা। তারপরেই এরোপ্লেনের টিকিট কাটতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে সেই নির্মল চক্রবর্তী ফিরে আসে। নিতাই নাম নিয়ে বর্তমানে সে হোমিওপ্যাথের ডাক্তার। উভয়ই উভয়কে আবিষ্কার করে। যে বিশ্বাসকে সম্বল করে ভক্তি সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি, সেই বিশ্বাস (নির্মল চক্রবর্তী আবার ফিরে আসবে) শেষপর্যন্ত জয়ী হয়। এই বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ভালোবাসার অনুভূতিও। কিন্তু দীর্ঘ পনেরো বছরের ব্যবধানে ভক্তি দ্বিতীয়বার বিয়ে না করলেও তার যাপিত জীবনে পরিবর্তন এসেছিল স্বাভাবিক নিয়মেই। ফলে আধপাগলা ব্রজেন্দ্রের প্রতি ভক্তির মনে জন্ম নেয় ভালোবাসা। পরিণতিস্বরূপ অতীত ভালোবাসার চাহিদার তুলনায় বর্তমান ভালবাসার দাবি দ্বিধাগ্রস্ত ভক্তির মনে প্রবল হয়ে ওঠে। তাই যে পুনর্মিলন হবার ছিল, তা হয় না।

''রেখার ডাক নাম মেনি। তার সঙ্গে প্রেম হয়েছিল। ... তাকে একবার পরী হতে দেখেছিলাম। ... তখন আমি আর পরী একসঙ্গে ব্যবসা করি। ...

দ্বিতীয়ার নাম মনে নেই। সেও তো একজন নারী। আসলে মধ্যরাতের।... আর আমরা তিনজন- তিনখানা চেয়ারে। বাইরে অনর্গল কলকাতা ভেসে গেছে। আমরা দারাদরি করে ওকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম তার কোনো ঠিক ছিল না।''[১৩] দু'টি নাতিদীর্ঘ কাহিনি নিয়ে 'পরীর সঙ্গে প্রেম' উপন্যাসটি তৈরি হয়েছে। কোনো কোনো মেয়েদের নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কীভাবে পরী সাজতে হয় তা দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে। শুধু নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই নয়, এই সুযোগসন্ধানী পৃথিবীর সুযোগসন্ধানী মানুষের ধূর্ততা ও লালসার জন্যেও তাদেরকে পরী সাজতে হয়। এই সব বিষয়কেই উন্মোচিত করেছে 'পরীর সঙ্গে প্রেম' (১৯৭৭) উপন্যাসটি।

পুরুষের ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসার মধ্যে নিহিত দখল বা অধিকারের স্বরূপ উন্মোচন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম প্রিয় বিষয়। বিশেষ করে নারীর দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে পুরুষের ভালোবাসার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন লেখক। আর আমরা তো জানি, 'দখল' সেটা জমিকে নিয়েই হোক বা নারী শরীরকে কেন্দ্র করেই হোক— মানব সভ্যতার একটি আদিমতম বিষয়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপন্যাসে আমরা তা বারবার দেখতে পাই। আমাদের আলোচ্য 'পরবর্তী আকর্ষণ' (১৯৭৮) উপন্যাসটিতে এই বিষয়টি উঠে এসেছে। রবিরঞ্জন গুহ মধ্যবয়সে পৌঁছে হঠাৎ

তার একদা প্রেমিকা তপতীকে খুঁজে পায়। রবিরঞ্জন ও তপতী দুজনেই বর্তমানে সংসারী জীবন পালন করছে। অবশ্য তপতী বিবাহ পরবর্তী সময়ে গুরুদেবের শরণাপন্ন হয়ে পুরো পরিবারসহ সংসারে থেকেই আধ্যাত্মিক জীবন (মেয়ে এষা সহ) বেছে নিয়েছে। অন্যদিকে এতদিন পর তপতীর সন্ধান রবিরঞ্জনের মধ্যে ব্যর্থ প্রেমের বেদনা জাগিয়ে তোলে। সেই সঙ্গে জেগে ওঠে শোধবোধ বা প্রতিশোধের এক ধরনের স্পৃহা। এই মনোভাব জেগে ওঠার পেছনে কাজ করেছে হয়তো একদা তপতীকে সম্পূর্ণরূপে দখল করতে না পারার ব্যর্থতা থেকে। আবার তপতী চায় রবির মন থেকে সমস্ত ক্ষোভ, না পাওয়ার ব্যর্থতাবোধ থেকে মুক্ত করে, তাকেও ধর্মের জীবনে নিয়োজিত করতে। ফলে শুরু হয় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সঙ্গে রক্তমাংসের আদিমতম চাহিদার লড়াই। শেষপর্যন্ত এই লড়াইয়ে জয়ী হয় রক্তমাংসের আদিমতম চাহিদার। এই কাহিনির পাশাপাশি সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে তপতীর বাবা বিনয় বসুর কাহিনি। এই কাহিনির মধ্যেও আমরা দেখতে পাই ভয়ঙ্কর এক দখলদারি মানসিকতা। যে মানসিকতার কবলে পড়ে এক নারীকে তার স্বামী, সন্তান ছেড়ে অন্য এক পুরুষের রক্ষিতা হয়ে কাটাতে হয় একই শহরে। এই নারী তপতীর ছোট মাসি এবং সেই অন্য পুরুষ তপতীরই বাবা বিনয় বসু। ধর্মীয় জীবনের ভন্ডামিও বিনয় বসুর মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত করেছেন লেখক। ভগবান সম্পর্কে লেখক বলেছেন, ''ভগবানের কোন অ্যাড্রেস নেই। কিছু বই, মন্দির, তীর্থস্থান, ভক্ত, গুরুদেব, অবতার, ভজন আর লীলাখেলার কাহিনিই ভগবানের স্মৃতি মানুষের মনে জীইয়ে রাখে। এর সঙ্গে থাকে কিছু অনুষ্ঠান। সমুদ্রস্নান। গঙ্গা পুজো। হিমালয় বন্দনা। এবং সংবৎসরে ক্যালেন্ডারে ক্যালেন্ডারে ছবি ছেপে ছোট বড় মাঝারি ব্যবসায়ীরা ভগবানের স্মৃতি গেরস্থের হৃদয়ে জাগরুক রাখে।''[১৪] আমরা কীভাবে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছি কিন্তু দখলের আদিমতম চাহিদাকেও অস্বীকার করতে পারছি না— এই বিষয়ই উঠে এসেছে 'পরবর্তী আকর্ষণ' উপন্যাসটিতে।

মফস্বলের জীবন-অভিজ্ঞতার আর একটি অন্যতম ফসল হলো 'স্বর্গের আগের স্টেশন' (১৯৮০)। প্রায় একই গ্রাম লেখকের প্রায় সব মফস্বল কেন্দ্রিক উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে। এই উপন্যাসের গ্রামের নাম 'দক্ষিণ মালঞ্চ'। ঠিক যেভাবে কুবের চরিত্র রূপান্তরিত হয়েছে অনাথবন্ধু চরিত্রে; এখানে আবার রূপান্তরিত হয়ে মিশে গেছে কখনও খগেনে— কখনও বিজনে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র খগেন নস্কর। পায়ের পাতা বাঁকা বলে কৃষিপ্রধান অঞ্চলে সে কোনও কাজ পায় না। স্ত্রী বেস্পতি ও দুই ছেলে হাজরা ও বজরা সকলেই পৃথক খায়। আর ছোট ছেলে ঘটির বয়স কম বলে সে

কখনও বাপের সঙ্গে থাকে কখনও বা মা বেস্পতির সঙ্গে থাকে। বড় ছেলে হাজরা মজুরি করে, ব্যাঙ বেচে আর সুযোগ পেলে চোর হয়েও কাজ করে। অন্যদিকে ওয়াগন-ব্রেকার বজরা । আর বেস্পতি তার আহার্য জোগাড় করে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে দুধ বিক্রি করে। খগেন ক্ষেতমজুরি করতে না পেলেও গ্রামের মধ্যে 'সৎ মানুষ' হিসেবে তার একটা পরিচিতি আছে। তাই ভদ্দরলোকের বাড়িতে বিভিন্ন কাজে পাহারা দেবার জন্য তার ডাক পড়ে। চাহিদা কম থাকায় গাছের ফল, রস, কখনও মাছ ধরে খগেন নস্করের দিন চলে যায়। তবে এই খগেনের অন্য ধরনের গুন আছে। বিভিন্ন গাছের শেকড়বাকড়ের বৈশিষ্ট্য তার নখদর্পণে, সাপেদের জগতে তার অবাধ বিচরণ। সাধারণ মানুষ থেকে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টি পেয়েছে প্রকৃতিকে অনুভব করার জন্য, দেখার জন্য। প্রকৃতিকে দেখার এই দৃষ্টি দৈনন্দিন কেজো জগতে যারা ডুবে থাকে, তারা কোনও দিন অর্জন করতে পারে না। খগেন প্রকৃতির সাধারণ বাতাসের ভেতর আরেক রকম বাতাস, সাধারণ আলোর ভেতর অন্য রকম আলো দেখতে পায়।

অন্যদিকে বিপিন বসু বাইরে থেকে এসে জমিজমা কিনে বাড়ি করেছে 'দক্ষিণ মালঞ্চ'তে। সে একদিকে যেমন কলকাতায় গিয়ে চাকরি করে তেমনি সৌখিন চাষি হিসাবে কৃষিকাজে মগ্ন থাকে। মানুষদের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষদের রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে খগেনকে দেখে বিপিনের মাথা থেকে বের হয় সাপের বিষ, সাপের চামড়া, গোসাপ চালান দেওয়ার বুদ্ধি। যে ব্যক্তি সাপ ও মানুষকে এক করে দেখে, সেই খগেনের কাছে এই কাজ বিবেকে বাঁধে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিপিনের বুদ্ধিতে সায় দেয় খগেন। মানুষদের থেকে সাপেদের সঙ্গেই খগেনের ভাব বেশি। কারণ সে মনে করে মানুষ সাপেরই মতো বরং সাপেদের চেয়ে মানুষের বিষ আরও ভয়ঙ্কর, আরও ক্ষতিকর। এক সময় তন্ত্রসাধনার সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছিল খগেন। খগেনের স্বপ্ন, তার মনের অবচেতন অংশের চিন্তা-ভাবনা, সাপেদের সঙ্গে তার মেলামেশা— এই সবকিছু নিয়েই নির্মিত হয়েছে উপন্যাসটি।

'চন্দনেশ্বর জংশন' (১৯৮০) উপন্যাসটি 'স্বর্গের আগের স্টেশন' উপন্যাসের সম্প্রসারিত অংশ বলা যেতে পারে। আগের উপন্যাসের অনেক ঘটনা, চরিত্র, স্থান-নাম আমরা আলোচ্য উপন্যাসেও দেখতে পাই। এখানে খগেন নস্করের মেজো ছেলে ওয়াগান-ব্রেকার বজরা প্রধান চরিত্র। তবে এখানে বজরার বড় দাদার নাম হাজরা নয়, হৃদয় (হৃদয় নস্কর)। চন্দনেশ্বর মৌজার নাম আমরা 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসেও পাই। আসলে দক্ষিণ ২৪পরগনার চম্পাহাটিতে যে সময় কাটিয়েছেন লেখক

এবং তার ফলশ্রুতিতে যে বিখ্যাত চারটি উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য একই সুতোর বুনন। বিষয়বস্তুর রকমফের করে প্রায় একটি কাহিনিই যেন লেখক লিখে গেছেন। কখনও চরিত্র এক রেখে, কখনও প্রধান চরিত্রের ভূমিকা পাল্টে দিয়ে, কখনও কিছু চরিত্র-নাম পাল্টে দিয়ে লেখক নির্মাণ করেছেন এই উপন্যাসগুলো। এখানে হৃদয় নস্কর সরল এক ভাগচাষী। যার কাছে সংসারের সচ্ছলতা কল্পনাতীত কোনও বিষয়। তার সঙ্গে স্বভাব-চরিত্রে কিছুটা মিল রয়েছে তার বাবা খগেন নস্করের সঙ্গে। তবে বাবার সঙ্গে তার একটা বড় জায়গায় পার্থক্য আছে। বাবার মত প্রকৃতির অন্তর্চেতনা অনুভব করলেও সে বাবার থেকে বেশি আশাবাদী, ''বাতাসের চোকলা তুলে ভেতর থেকে আশার বীজ দেখতে পায়। এক রকমের আশার দানা। তাতে রং থাকে। আশার একটা নিজের গন্ধও আছে। ভালো সময়ের গায়ে হৃদয় নস্কর সব সময় বাসন্তী রং দেখতে পায়।''[১৫]

এই হৃদয় নস্কর তার ছোট ভাই বজরাকে সৎ করে তুলবার দায়িত্ব নেয়। এই 'সৎ' হবার বিষয়টি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসেই এসেছে। এই কাজে হৃদয় গ্রামের সকল মানুষের সাহায্য চায়। অন্যদিকে ব্রজেশ্বর হাজরা তার দাদার একেবারেই বিপরীত চরিত্রের মানুষ। বিভিন্ন সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত। এতে আফসোস তো দূরের কথা, তার গর্ব হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডাকাত বজরার জীবনেও পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের কাহিনি নিয়েই উপন্যাসটি নির্মাণ করেছেন লেখক।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাসম্ভারে বিষয়বৈচিত্র্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো 'নতুন ভবন' (১৯৭৩) উপন্যাসটি। কল্পবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে। তবে লেখক শুধু অনাগত সময়ের বিজ্ঞানকে কল্পনা করেননি— সেই সময়ে মানুষের জীবনধারারও পরিচয় দিয়েছেন। ফলে এই রচনায় একদিকে যেমন উঠে এসেছে আগত ভবিষ্যের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দুর্নিবার গতি অন্যদিকে সেই সময়ের সঙ্গে অভিযোজিত আর অভিযোজিত হতে না পারা মানুষদের চিন্তা-ভাবনা। উপন্যাসটির কাহিনিকাল ইন্দিরা গান্ধির জন্ম শতবর্ষ অর্থাৎ ২০১৬-২০১৭খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। এই সময় ঔপন্যাসিক প্রবোধ বিশ্বাস উপন্যাস লিখতে বসেছেন। সেই সূত্রেই উঠে এসেছে তৎকালীন সময়ে বিজ্ঞান- প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি, এই উন্নতিকে হাতিয়ার করে রাষ্ট্রশক্তির আরও ক্ষমতাধর হয়ে ওঠা, উন্নত বিজ্ঞানের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, রাষ্ট্রের সমাজজীবনকে একেবারে সমস্যামুক্ত করতে চেয়ে নতুন কিছু সমস্যার সৃষ্টি করা। এই সময়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে প্রবোধ বিশ্বাস ও তার দাদা-ভাইদের অতীত স্মৃতিচারণ বিশেষত হেমন্ত বিশ্বাস (তৃতীয় সন্তান)-এর আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে, পরিবর্তিত সময়ে প্রবোধ বিশ্বাস ও দাদা-

ভাইয়েদের খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা। প্রত্যেক ভাইদের সংসার জীবনের টুকরো ছবি এবং কাহিনির শেষ অংশে প্রবোধের দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি।

তখন কলকাতা সম্প্রসারিত হতে হতে আসানসোল থেকে বনগাঁ পর্যন্ত ছড়িয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এসেছে আমূল পরিবর্তন। আগেকার মোটর ট্যাক্সিগুলো শহরের বাইরে রিক্সার বদলে চলে। শহরে চলে আকাশপথে হেলিট্যাক্সি যার ইন্ধন পরমাণু শক্তি। ওভারহেড এক্সিডেন্ট প্রায় শূন্য। গহনার ক্ষেত্রে সোনার জায়গা নিয়েছে প্লাটিনাম। বাঁধ-পরিকল্পনা এত সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে যে নদীগুলো আবার জলে ভরে উঠেছে। এখানে না থেমে বিশেষজ্ঞরা মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল পড়ে পড়ে পুরানো নদীগুলোর খোঁজ করছেন যাতে সেখানেও জল চালান দেওয়া যায়। আকাশের চাঁদ এখন একটি স্টেশন যেখানে গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীদের অবাধ যাতায়াত। অতিকায় ভ্যাকাম ক্লিনারের সাহায্যে প্রতিনিয়ত এলাকা পরিষ্কার করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও উন্নতি হয়েছে। পড়াশোনা করার জন্য এখন আর প্রাইভেট টিউটরের দরকার কোনও ধরনের ছাত্রদের প্রয়োজন হয় না। 'ই-লার্নিং' এখন শুধু উন্নত দেশের করায়ত্ত নয়। শিক্ষকদের জায়গা দখল করেছে কম্পিউটার। 'হিউম্যান এরর' শব্দটি মানুষ ভুলে যেতে বসেছে। সব কিছুই পূর্ব-পরিকল্পিত। শুধু দরকার সেই পরিকল্পনা (রাষ্ট্র নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত) মতো মানুষদের এগিয়ে যাওয়া নিজের কোনও প্রয়োজনাতিরিক্ত (রাষ্ট্র মতানুসারে) বুদ্ধি না প্রয়োগ করে। ঘাসের বদলে গরুর খাদ্য হয়েছে নিউজপ্রিন্ট। তাই দুধের রঙ আগের চেয়ে অনেক সাদা।

তবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। এখন আর কোনও অসুখ মানুষকে যমের দুয়ারে পাঠাতে পারে না। সব ধরনের অসুখের জন্য ওষুধ সর্বদা প্রস্তুত। তাই 'ইন্‌কিওরেবল্' বলে কোনও অসুখ আছে কিনা, তা বর্তমানে গবেষণার বিষয়। ক্যান্সারের মতো মারণব্যাধি এখন ইতিহাস। ওষুধের সাহায্যে বার্ধক্যে ও যৌবনে বিশেষ পার্থক্য নাই। মানুষের ন্যূনতম গড় আয়ু হয়েছে একশো বছর। বাতাবি লেবুর খোসা থেকে তৈরি হওয়া ওষুধে জন্মনিয়ন্ত্রণ, পরিবার-পরিকল্পনা এখন হাতের মুঠোয়। তাই গত বিশ বছরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারতের জনসংখ্যা। কিন্তু এত কিছুর মাঝেও 'আত্মহত্যা' মড়কের মতো দেখা দিয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, যেসব কারণে আগে মানুষ আত্মহত্যা করত তার একটা কারণও বর্তমান নেই। শীতকালে এই ছোঁয়াচে রোগের বৃদ্ধি ঘটে। অবশ্য সরকার এই রোগকেও নির্মূল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। 'পোলিও'র টিকার মতো বাজারে এনেছে 'প্রফুল্ল'— ট্যাবলেটগুলোর নাম 'খুশি'। কিন্তু 'প্রফুল্ল', 'খুশি'-র অতিরিক্ত ব্যবহার বা অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার

সমাজে সৃষ্টি করেছে এক নতুন সমস্যা। তৈরি হয়েছে স্মৃতিভ্রষ্ট বিগতবুদ্ধি জড়ভরতের দল। আত্মহত্যার মতো এই বিষয়টিও সরকার এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। জড়ভরতদের সংখ্যা ক্রমশ বর্ধমান— শহরের বাইরের বনগুলো তাদের আশ্রয়স্থল। রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণে যা নেই—তা মুছে ফেলাই রাষ্ট্রশক্তির এখন অন্যতম কাজ। বিজ্ঞানের সৌজন্যে মানুষের শুভ্র শোণিতের গোপন রহস্য জানার পর কতিপয় শক্তিশালী মানুষ মিলে পেছন থেকে রাষ্ট্রকে চালায়। তাদেরই উদ্যোগে পছন্দমতো মানুষ বানানো হচ্ছে। যাদেরকে বলা হয় বিবেকবান বাহিনী (বি.বি.বি)। প্রবোধের মতে এরা আসলে বিবেকহীন বাহিনী। কারণ রাষ্ট্র তাদেরকে দিয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করিয়ে নেয়। তারা ভাবনা-চিন্তা করতে পারে না— ভালো-মন্দ, সাদা-কালোর কোনও ফারাক বোঝে না।

মানুষের স্বপ্ন রেকর্ড করা এই সময়ে এক রকমের ব্যাবসা। ফলে স্বপ্ন পেটেন্ট করাতে হয় যাতে অন্য কেউ চুরি করতে না পারে। প্রবোধ বিশ্বাস নিজেই 'ফরওয়ার্ড ড্রিমস' নাম দিয়ে ব্যাবসা শুরু করে। পৃথিবী জুড়ে যে কজন আগাম স্বপ্ন দেখা শুরু করে, সেই সব জীবনরহস্য সন্ধানী ড্রিম মারচেন্টদের সম্মেলনে তৈরি হয় সমগ্র ভাবনা-চিন্তা-স্বপ্নের সংকলন। এটা রাষ্ট্রের হাতে চলে যেতেই তারা নিজেদের পছন্দমতো মানুষ তৈরি করার সূত্র পেয়ে যায়। সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রীয় ক্যাডার বাহিনী বি.বি.বি.। যার মূল কাজই হলো জড়ভরতের দলকে নিশ্চিহ্ন করা। অবশ্য রাষ্ট্র মানুষকে সমৃদ্ধশালী হবার নানান পথ তৈরি করে দিয়েছে। তাদেরকেই তারা নিশ্চিহ্ন করতে চায় যারা অবাধ্য, যাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কিন্তু এই সমৃদ্ধি মানুষের জীবনে নিয়ে আসে অঢেল অবসর। আর যে অবসর পাবার জন্য অতীতে কর্মব্যস্ত মানুষ মাথাখুঁড়ে মরত, সেই অবসর বর্তমান মানুষদের কাছে শত্রু হয়ে দাঁড়াল। কারণ অঢেল অবসরেই মানুষ আরামে-বিরামে অবসন্ন, বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। আর এই অবসন্নতা আত্মহত্যার প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। কাহিনির শেষে দেখা যায় প্রবোধ জড়ভরতদের সঙ্গেই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এই রকম বিষয় নিয়ে লেখকের আর কোনও উপন্যাস আমরা পাই না। তাই বিষয়বৈচিত্র্যে 'নতুন ভবন' অদ্বিতীয়তম।

'চম্পাহাটি পর্ব' পরবর্তী সময়ে লেখক পুনরায় নগর কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ফলে এই সময়ের লেখায় আবার ধরা দিতে শুরু করেছে নাগরিক জীবনের নানান জটিলতা, সমস্যা ও সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে মিশে থাকছে নগর কলকাতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই ধরনের লেখার যাত্রাপথে প্রথম যে উপন্যাসটি পাই, তা হলো 'স্বর্গের পাশের বাড়ি' (১৯৭৮)। বিভিন্ন বয়সের মানুষের জীবনকে পাশাপাশি রেখে কাহিনি নির্মাণ করেছেন লেখক। প্রতিটি চরিত্রই একে

অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কাহিনি শুরু হচ্ছে তিয়াত্তরের বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র রায়ের কাহিনি দিয়ে। এরপর কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে গিরিশচন্দ্রের ছোট ছেলে ভূদেব, ভূদেবের বন্ধু একদা সফল সিনেমা ডিরেক্টর সুখেন দত্ত, তার দাদা নবীন দত্ত, সুখেন দত্তের ছেলে গজেন্দ্রনাথ (গজা), গজার প্রেমিকা সরমা, ব্যাংকের চেয়ারম্যান শ্রীনাথ পুরকায়স্থ ও একদা ভারতীয় সিনেমার গ্ল্যামার কুইন সুরেখা দেবী। এদের প্রত্যেকের জীবনের বিভিন্ন অংশ নিয়ে লেখক যেন একটি নগরজীবনের কোলাজ তৈরি করেছেন। তবে গ্রামীণ জীবনের রেশ লেখক তখনও হয়তো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই কলকাতার রূপ ফুটে উঠেছে এভাবে, ''কলকাতা আসলে কোনো শহর নয়। বড় সাইজের একটা অগোছালো গ্রাম। কেননা, এই এখানে দাঁড়িয়ে লেনসের ভেতর দিয়ে গজা পাশাপাশি এইটিনথ, নাইটিনথ, টোয়েনটিনথ আর টোয়েনটিফার্স্ট সেঞ্চুরি দেখতে পাচ্ছিল। গরু চরানো দুর্গের মাথায় পতাকা, মেয়েলোকের বল খেলা, কাচের তৈরি দোতলা রেস্তোরাঁ। গজা জানে রেস্তোরাঁর নিচেই গঙ্গার ঘাটে গুরুদশার শেষে কোনো হিন্দু হয়ত ঘাট কামাতে বসেছে। ঋত্বিক ঘটকও এ কলকাতাকে কোনোদিন তুলে আনতে পারেননি। এই কলকাতা আসবে জি দত্তের ছবিতে— আস্ত। আগাগোড়া।''[১৬]

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলো কাহিনির পটভূমিরূপে মূলত গ্রাম ও নগরজীবনের চেনা পরিবেশ ব্যবহৃত হলেও এমন অনেক উপন্যাস রয়েছে যেখানে আমরা দেখতে পাই কিছুটা অল্প-পরিচিত বা অচেনা পটভূমি। এই উপন্যাসগুলোতে ঐ অঞ্চলগুলোর বিশেষত্ব কাহিনিগুলোর মধ্যে স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। যেমন— 'পরীর সঙ্গে প্রেম' (ডুয়ার্সের চা বাগান), 'মহাজীবন' (আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল), 'স্বর্গে তিন পাপী' (কোনারক), 'একদা ঘাতক' (পুরী), 'এক সিংহ ও তার রমণী' (গির অভয়ারণ্য), 'বড় হওয়ার আগে' (শান্তিনিকেতন), 'সুধাময়ীর দিনলিপি' (কালাহাণ্ডি), 'কহেল গাঁও' (সাওতাল পরগণা)।

'মহাজীবন' (১৯৯৫) উপন্যাসে আসানসোলের নিরসা খনি অঞ্চলের কথা হয়েছে। যদিও কাহিনির মাঝখানে প্রবেশ করেছে বিহারের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম 'জেন্দাহা'-এর পটভূমি। এই গ্রামের সুবাদে সেই অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রা, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার- বিচার ইত্যাদির বিশ্বাসযোগ্য তথ্য এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। মূল কাহিনি নির্মিত হয়েছে সাংবাদিক রজত পালিতকে কেন্দ্র করে। ' এখন' পত্রিকার পক্ষ থেকে ক্যামেরাম্যান বিশুকে সঙ্গে নিয়ে রজত কলকাতা থেকে এসে পৌঁছেছে আসানসোলে অগ্নিবিধ্বস্ত নিরসা কয়লাখনি অঞ্চলে। তবে কয়লাখনির আগুন লাগার সাধারণ খবর করা রজত পালিতের মূল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দিষ্ট, ''এমন মৃত্যুর থাবা কতটা বড়—

তার পরিণাম কতখানি— যাদের গেল— তাদের কতটা গেল।”[১৭] এই বিষয়টি লেখার মধ্যে তুলে অন্য একটি দৃষ্টিকোণের সৃষ্টি করাই তার ইচ্ছা। এই কাজ করতে গিয়ে রজত পালিত জড়িয়ে পড়ে খনির আগুনে দগ্ধ হওয়া রামটহল দুসাদের পরিবারের সঙ্গে। ক্যামেরাম্যান বিশু কলকাতায় ফিরে গেলেও ফেরা হয় না রজতের। মৃত রামটহল দুসাদের স্ত্রী চামেলীর মধ্যে নিজের মেয়ে ইরাকে অনুভব করে সে। ইরার বিবাহ পরবর্তী সময়ে যে পিতৃত্ব অভুক্ত অবস্থায় মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল— চামেলীকে দেখার পর রজত পুনরায় বেঁচে থাকার স্বাদ ফিরে পেতে শুরু করে।

আসলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন কীভাবে একটি মানুষ বিভিন্ন সম্পর্কের (যেমন— স্বামী, পিতা ইত্যাদি) বন্ধনে থেকেও সেই মানুষটির কাছে একটা সময় এই সম্পর্ক গুলোর রস শুকিয়ে যেতে থাকে। ফলে আগের মতো টান অনুভব করা যায় না। যেমনটা হয়েছে রজত পালিতের সঙ্গে। স্ত্রী ছায়ার সঙ্গে একটানা চৌত্রিশ বছর সংসার করার পরে আজ স্বামী রজতের মনে হয়েছে, তারা এতদিন জীবন কাটিয়েছে অনেকটা রুমমেটের মতো করে। যে ইরাকে সে ভালোবাসত এবং পিতা রজতের সর্বদা মনে হত তাকে ছেড়ে ইরা কখনও থাকতে পারবে না— সেই মেয়ে ইরা অল্প বয়সে ভালোবেসে অভিষেকের সঙ্গে বিয়ে করে সন্তানসহ দিব্যি সংসার করছে। রজতের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার ছিল যে, সে যে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে তার লেখা বের হয়— সেই কাগজ উঠে যেতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সেই কাগজ উঠে যায় এবং সাংবাদিক রজত অবসরকালীন পি.এফ.,গ্যাচুইটির টাকাও পায় না। ফলে তাকে বিনা ডেজিগনেশনে ‘এখন’ পত্রিকায় কাজ নিতে হয়। তবে এই সবের মধ্যে যেটা বড় হয়ে উঠেছে, সেটা হলো রজতের পিতৃত্ববোধ, ‘‘ একদিন আমার মেয়ে ছিল। এখন সে অভিষেকের বউ। শঙ্কু-চিনির মা। আমরা— আমি সেখানে রিডানডেন্ট। আমরা মনে মনে সেই ইরাকে ভাবি— যে ফ্রক পরে মাথার চুল দুলিয়ে ছুটে আসত— বাবা কী এনেছ দেখি— বলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে ইরা তো আর নেই। চিরকাল কি মানুষ একরকম থাকে!

কিন্তু আমি যে দিনকে দিন একা হয়ে গেলাম ছায়া। আমার কাজের জায়গা এক বিরাট শূন্য। বাড়ি ফিরে এসে সেই আনন্দ আর পাই না।”[৩১৮] রজত পালিতের এই একাকীত্ব, মেয়ের ছোটবেলার স্মৃতিতে আটকে থাকা— বিধবা চামেলী দুসাদের মধ্যে পিতার নির্ভরশীলতা পাবার আকুলতা; ফলে চামেলী দুসাদের পরিবারের সঙ্গে জীবনের কিছুটা অংশ একজন বাবা হিসেবে তাদের মতো ব্যয় করা এবং শেষে চামেলী যখন পুনরায় ফৌজদারের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করবে— সেই বিষয়টি পাকা

বন্দোবস্ত করে আবার পথে নামা, এই বিষয়গুলো নিয়েই উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে।

''সত্তরের দশকটি ধরে মুক্তির সাধনা বিচিত্র পথে চলেছে। এই নিয়ে লেখা খুব কম হয়নি। সবরকমের বাদের চেয়ে মানুষ সর্বদাই বড়। মানুষের এই বড় হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিই তুলে ধরতে চেয়েছি। মানুষের কথাই সর্বশিল্পে চিরায়তের তিলক।''[১৯] এই মন্তব্যটি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'একদা ঘাতক' উপন্যাসের ভূমিকাতে বলেছেন। বাংলায় সত্তরের দশকে যে অগ্নিগর্ভ নকশাল আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট নির্মাণে সাহায্য করেছে। কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে পুরীর সমুদ্রের সামনে লেখক তিনটি চরিত্রকে দাঁড় করিয়েছেন। একজন একদা নকশাল-বিপ্লবী জেলখাটা সুকুমার রায় যার বর্তমান পেশা আঙ্কুপাংচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করা। দ্বিতীয়জন সুধীন দত্তের পঙ্গু মেয়ে রাধা দত্ত, ছোটবেলায় মালসাঁর আগুনে পা পুঁড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে যায়। আর তৃতীয়জন হলো সুধা যার এ.এস. আই (পুলিশ) স্বামী নকশাল-বিপ্লবীদের হাতে মারা যায় বিয়ের মাত্র আট মাসের মাথায়। এরাই এই উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্র। এই তিনজনের ইতিহাস কাহিনির পরতে পরতে উন্মোচন করে লেখক একটি রোমাঞ্চের আবহ তৈরি করেছেন।

রাধার চিকিৎসা করতে গিয়েই সুকুমারের সঙ্গে রাধার প্রথম পরিচয়। সেখান থেকেই প্রেম— দু'জনেই অন্ধকার, স্থবিরতা থেকে আলো, চঞ্চলতার নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্নে বুঁদ। এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবেই সুকুমার রাধাকে নিয়ে এসেছেন পুরীর সমুদ্রের ধারে। যেখানে সে রাধাকে পুনরায় হাঁটার অভ্যাস তৈরি করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে একেবারে বিপরীত পরিস্থিতিতে সুধার পুরীতে আগমন। স্বামী-মৃত্যুর পর একলা বিধবা সুধা অনন্যোপায় হয়ে শেষপর্যন্ত পেট চালাবার দায়ে বেশ্যাবৃত্তিকেই গ্রহণ করে। লজের মালিক নৃপেনবাবুর সঙ্গে দু'সপ্তাহের চুক্তিতে কলকাতার বড়াল পাড়া থেকে সুধা পুরীতে আসে। সমুদ্র স্নানের সময়েই সুধা চিনতে পারে তার স্বামীর একদা ঘাতক সুকুমারকে। তারপরেই সুকুমারের প্রতি সুধা ঘৃণা, প্রতিশোধে ভাসতে থাকে। অন্যদিকে সুধার পরিচয় জানার পর সুকুমারের মন বিষাদে ভরে ওঠে। লেখক জানান, ''তিনজন তিন ঢেউয়ের মানুষ। তারা ভালোবাসা, ঘৃণা, বিষাদ আর প্রতিশোধে ভাসতে ভাসতে একটি বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে।''[২০]

সুধার প্রতিশোধস্পৃহা সুকুমার ও রাধার নতুন জীবনের পথে অন্যতম বাধা। সুকুমার বুঝতে পারে এক্ষেত্রে সুধার স্মৃতি তার প্রধান শত্রু। কারণ স্মৃতি অবিনাশী। একজনের স্মৃতিনাশ করতে পারলেই তাদের (সুকুমার ও রাধার) নতুন জীবন শুরু করার পথে কোনও বাধা থাকে না। সুকুমার সেই ধরনের পরিকল্পনাই গ্রহণ করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সুধার প্রতিশোধ স্পৃহার চাপ সহ্য

করতে না পেরে সুকুমারের নিজেরই স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। ভালোবাসা, ঘৃণা, বিষাদ ও প্রতিশোধে দোলাচল জীবনের কাহিনিই তুলে ধরেছেন লেখক 'একদা ঘাতক' উপন্যাসে।

'এক সিংহ ও তার রমণী' (২০০১) উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই গির অভয়ারণ্যের পরিবেশ। বাংলা সাহিত্যে অনেক রচনাতেই নারীর সঙ্গে নাগিনীর তুলনা রয়েছে। নাগিনীর সঙ্গে পুরুষের সঙ্গমচেতনার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। আর এই উপন্যাসে এক পুরুষ সিংহের (যাকে গ্রামবাসিরা নাম দিয়েছে 'বুধুয়া') সঙ্গে এক রমণীর ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখতে পাই। অজয় সোম এই গির অভয়ারণ্যের একজন পদস্থ অফিসার। তার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রথম পক্ষের সন্তান অলক সোমের উদ্যোগেই দ্বিতীয়বার বেশি বয়সে বিয়েতে বসে অজয় সোম। বিয়ে হয় জাতীয় স্তরের অ্যাথলিট রজনীর সঙ্গে। অন্যদিকে রজনীর দীর্ঘদিন বিয়ে না করার কারণ হিসেবে উঠে আসে অনেকদিন আগে তার প্রেমিক পরিতোষের বোমার আঘাতে মৃত্যুর ঘটনা। তবে এটি নিছক দূর্ঘটনা ছিল না, রজনীর এক গুপ্ত প্রেমিক অশোক রজনীকে পাওয়ার জন্যই পরিতোষের গায়ে বোমা ফেলে। এতদিন পরে পরিতোষের মুখ আবছা হয়ে এলেও প্রেমের স্মৃতি ও সেই প্রেম পাবার আকুলতা এখনও রজনীর মধ্যে বিদ্যমান। তাই কাহিনির শেষদিকে আমরা দেখতে পাই রজনী সিংহ বুধুয়ার মধ্যে পরিতোষকেই দেখতে পায়। অন্যদিকে বুধুয়াকে লক্ষ্য করে রাইফেল তাক্ করা অজয় সোম যেন অশোকের ভূমিকা গ্রহণ করে রজনীর চেতনায়। যে রজনী একদা তার প্রেমিক পরিতোষকে বাঁচাতে পারেনি— সে এবার বুধুয়াকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। তাই বেপরোয়া ভঙ্গিতেই অজয়ের তাক্ করা (বুধুয়ার দিকে) রাইফেলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত স্বরে যেন সর্বশক্তি দিয়ে অজয়কে গুলি না করতে বারংবার নিষেধ করে। কারণ রজনী বুধুয়ারূপী (সিংহ) পরিতোষকে এবার সারাজীবনের জন্য হারাতে কোনো ভাবেই রাজি নয়। আসলে লেখক এই উপন্যাসে এক অতৃপ্ত নারীর (শরীরে ও মনে) আকাঙ্ক্ষাকেই মূল উপজীব্য বিষয় করেছেন।

বয়ঃসন্ধিক্ষণে পা দেওয়া এক কিশোরের প্রেমে পড়া— প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কাহিনি বর্ণিত হয়েছে 'বড় হওয়ার আগে' (২০০১) উপন্যাসে। এখানে সতেরো বছর বয়সের সমীরের বয়সোচিত আবেগ, অনুভূতি, সমস্যা, চিন্তা-ভাবনা লেখক যেন ওই বয়সে বসেই লিখেছেন। জীবনের কঠিন বাস্তবতা সমীর তার স্কুলের হেডমাস্টারের মেয়ে কণার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পর ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে। বড় হওয়ার আগে তার এই অভিজ্ঞতা তাকে যেন বয়সে বড় হওয়ার অনেকটা আগেই বড় করে দেয়। কালাহাণ্ডির আরণ্যক পাহাড়ি পরিবেশের ছবি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন 'সুধাময়ীর

দিনলিপি' (১৯৯৭) উপন্যাসে। কালাহান্ডির করালকোটার বাঙলোতে বড় হয়ে ওঠা সুধাময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের শেষপর্বে এসে স্মৃতিচারণ করেছে ডায়ারির পাতায়। নগরজীবনের বাইরে এক আরণ্যক জীবন-কথা লেখক এখানে শুনিয়েছেন সুধাময়ীর জবানীতে। বাবা শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঠের ব্যবসা, দাদার বড় হয়ে ওঠা, দিদির বিয়ে, জামাইবাবুর পাগলামির রোগ ধরা পড়া, সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ, শিবদাসের মৃত্যুর পর করালকোটার জীবন ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি নিয়েই গড়ে উঠেছে 'সুধাময়ীর দিনলিপি' উপন্যাসের কাহিনি। তবে এই উপন্যাসে কাহিনি ব্যতীত কালাহান্ডির প্রাকৃতিক ছবি অত্যন্ত জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে।

সময় বদলায়, শাসক বদলায়, মালিক বদলায়; বদলায় না জমি। তাই জমিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয় বিভিন্ন সময় দখলদারির নানান গল্প। এই দখলের গল্পই শুনি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কহেলগাঁও' (২০০৪) উপন্যাসে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী নবাব আমলের ইতিহাস-প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে পাঠকেরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বাতাবরণের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারেন। সম্পত্তি বিনিময় করে যেসব মানুষ ওপার বাংলা থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল, স্বরূপ তালুকদার তাদের মধ্যে একজন। ময়মনসিংহের পৈত্রিক সম্পত্তির বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন সাঁওতাল পরগণায় নবাব ইসমাইল রেজা চৌধুরী নির্মিত কহেল গাঁও-এর প্যালেস। এছাড়াও নবাবের নানান জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সম্পত্তি যার পুরো হদিশ স্বরূপ এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি। স্বরূপের সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত কলেজ-বন্ধু রণেন ঘোষের কথোপকথনের মাধ্যমে উঠে আসে আইনি পথে বিনিময় হবার পরেও প্যালেসের অধিকার নিয়ে ঝামেলা, নবাবের জমিয়ে রাখা দলিল থেকে নবাবের সম্পত্তি খুঁজে বের করা, সেখানে অধিকার স্থাপনের সমস্যা, প্যালেসে আগে যারা বাস করত তাদের জড়িয়ে নানান ঘটনা। বর্তমানে এই প্যালেসকে সরকারি ট্যুরিস্ট স্পট বানাবার ইচ্ছা স্বরূপ তালুকদারের। দখল নেওয়ার প্রবৃত্তি মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটা আদিমতম বিষয়। শুধু বদলে যায় সময়ের সঙ্গে পদ্ধতি। তাই লেখক জানান, ''দখল নেওয়া, দখলে রাখা, এসবে স্বরূপ কেন, যে কোনও মানুষই বীরের মত একটা সাহসী ভাবে ডুবে থাকে, একটা যেন ন্যায্য ন্যায্য সাহসী ভাব পেয়ে যায়। কেস, ডকুমেন্ট, এফিডেভিট, ভারডিক্ট, ডিক্রি—এসব কথায় যেন কেমন একটা তেজ আছে।

কথাগুলো যেন বুলেট বা কার্তুজ। একটা গাছ পর্যন্ত তার জায়গা ছাড়ে না। শিকড়ে সিধে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়।''[২১] কাহিনির শেষদিকে আমরা দেখা পাই ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়ের সঙ্গে যাকে গঙ্গার

দু'পাশের লোক শুধু 'মশায়' বলে ডাকে। চারশ বছর আগে আকবর বাদশা মশায়ের পূর্বপুরুষকে 'মহাশয়' খেতাব দিয়ে গঙ্গার সোতা ধরে একশ তিরিশ মাইল জুড়ে জলকরে মাছ ধরার অধিকার দেন। সেই অধিকার বংশপরম্পরায় কমতে কমতে এখন বর্তমান মশায়ের দখলে রয়েছে পঞ্চান্ন মাইল। দখলের পরে আসে দখলে রাখার বীরত্ব ব্যাখ্যান। স্বরূপ ও মশায়ের আলোচনাতে এই প্রসঙ্গই উঠে আসে। এভাবেই দখলের গল্প বলে যান লেখক 'কহেলগাঁও' উপন্যাসে।

'অলীকবাবু' (১৯৮১) উপন্যাসে লেখক রমেন ঘোষের লেখক হয়ে ওঠার কাহিনিতে আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের জীবনের ছায়া দেখতে পাই। লায়ার থেকে লুস্কেন, লোফার হতে হতে লেখক হয়ে ওঠা। জীবনের পৌঢ়ত্বে এসে (প্রায় পঞ্চাশ) লেখক রমেন ঘোষ এভাবেই নিজের লেখক হয়ে ওঠার ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন। তবে উপন্যাসের কাহিনি লেখক রমেন ঘোষকে নিয়ে নয় আবার তাকে বাদ দিয়েও এই কাহিনি বলা যাবে না। এখানে এক কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে এক অলীক রমেন ঘোষ (উপন্যাসে প্রকৃত নাম নেই) যে কিনা আসল লেখক রমেন ঘোষের নাম নিয়ে মানুষ ঠকিয়ে বেড়ায়। আসল রমেন ঘোষ সুযোগের অপেক্ষায় থাকে মিথ্যা রমেন ঘোষের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সুদেষ্ণা দাশগুপ্তের সৌজন্যে কাকতালীয়ভাবে সেই সুযোগও এসে যায়। কারণ এই সুদেষ্ণাকে পুরীর হোটেলে একলা রেখে অলীক রমেন কিছু দিনের জন্য বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। নিতান্ত বিপদে পরেই সুদেষ্ণা লেখক রমেন ঘোষের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখে। সুদেষ্ণার চিঠি বুক পকেটে রেখে রাতের ট্রেন ধরেই আসল লেখক রমেন চলে আসে পুরীর সেই নির্দিষ্ট হোটেলে। ঘটনাচক্রে ঐ ট্রেনে করেই সুদেষ্ণার কাছে পুনরায় ফিরে আসে অলীক রমেন। হাতেনাতে ধরতে চেয়েও অলীক রমেনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে (একজন গুনমুগ্ধ ভক্ত হিসেবে), সেই ইচ্ছা আর থাকে না। নাম ভাঁড়ালেও অলীক রমেনের মধ্যে আসল রমেন নিজের কম বয়সের রমেনকে উপলব্ধি করে যখন সে লায়ার থেকে ধীরে ধীরে লেখক হয়ে উঠছিল। আসল রমেনকে চিনতে পেরে তাই অলীক রমেন বলে, ''তখনই হয়ত লেখার কাঁচামাল আপনার স্টমাকে জমা হচ্ছিল। মনে মনে লিখতে শিখছিলেন। মানে মিথ্যেগুলো সাজাচ্ছিলেন। লোকের ওপর দিয়ে ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন। তারপর 'আমি' হতে হতে হঠাৎ একদিন 'আপনি' হতে শুরু করলেন— রমেন ঘোষ হয়ে ওঠা আরম্ভ হয়ে গেলো আপনার। লেখা আপনাকে টাকা এনে দিল। যে-টাকার অভাবে আপনি মিথ্যে বলে যাচ্ছিলেন। সেই টাকা এসে আপনাকে ঘিরে একটা ইমেজ গড়ে উঠতে লাগল। যার অন্য নাম খ্যাতি। অথবা মানী হয়ে উঠতে লাগলেন। এরপর কি আপনি আর ভাসতে ভাসতে ডোবার সুযোগ পেয়েছেন? ডুবতে ডুবতে

ভাসার?"[২২] আসল রমেন ঘোষ এখানেই লেখক হিসাবে নিজেকে আয়নার সামনে দেখতে পায়। কারণ অনেক লেখকই একটি বয়স পার হয়ে এলে, খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে, একটি লেখার জন্যে যে পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়, তা করে না। ফলে চলতে থাকে চর্বিত চর্বণ— তৈরি হয় শব্দের অযথা পাহাড়। এভাবেই লেখক হয়ে ওঠা, লেখকের স্থবিরতা বিষয় হয়ে উঠেছে 'অলীকবাবু' উপন্যাসে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আয়তনের দিক থেকে একটি অন্যতম বৃহৎ উপন্যাস হলো 'হাওয়াগাড়ি' (প্রথম খণ্ড-১৯৭৯ ও দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৮০)। দু'টি খণ্ডে সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠা নিয়ে এই উপন্যাসের কলেবর তৈরি হয়েছে। আমরা জানি, একই রকম চরিত্র, ঘটনা, প্রসঙ্গ লেখকের অনেক উপন্যাসেই ঘুরেফিরে আসে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসেও এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই না। কারণ এই উপন্যাস পাঠে প্রথম খণ্ডে আমরা 'নির্বান্ধব' ও 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাস দুটির ছায়া প্রতিফলিত হতে দেখি। গ্রামজীবনের কুবের যেন এখানে পরিণত হয়েছে নগরজীবনের দিলীপ বসুতে। আর এই দিলীপ বসুর মধ্যে এখানে লক্ষ্য করি নিবারণ পাকড়াশির নিঃসঙ্গতাবোধ। নগরজীবনের জটিলতা, কোলাহল, ষড়যন্ত্র, গোপন দ্বেষ, ল্যাং মেরে ফেলে দেবার প্রবণতার মাঝে দিলীপ বসুর হাসফাঁস অবস্থা। একজন কর্মদক্ষ মানুষকে (দিলীপ বসু) বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিয়ে স্থবিরতার দিকে ঠেলে দেওয়া। তার কর্মদক্ষতাই হয়তো এই পচনশীল নাগরিক সমাজে তাকে নিঃসঙ্গ করে তোলে— প্রকৃত বন্ধুর অভাব তার মনের নিঃসঙ্গতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কাজ করার ইচ্ছা নিয়ে সে চাকরি জীবনে প্রবেশ করেছিল— সেই অফিসেই তার কর্মক্ষমতার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। এক সৃজনশীল মানুষের সৃজনশীলতা নষ্ট ও অপচয় করার বিষয় নিয়েই তৈরি হয়েছে 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসটি।

কোল ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে যখন দিলীপ বসু কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে না তখন কয়েকজন সহকর্মী মিলে গোপনে অন্য একটি কাজে ঝাঁপ দেবার পরিকল্পনা করে। অচল এক কয়লা খাদানকে দিলীপ বসু নিজের কর্মক্ষমতায় এমন এক জায়গায় নিয়ে যায় যে কোল ইণ্ডিয়ার মত কোম্পানিতে অজ্ঞাতকুলশীল ভৌমিক খাদানের কথা ওঠে। দিলীপ বসুর কর্মক্ষমতায় ভীত হয়েই যেন তার সহযোগীরা কোল ইণ্ডিয়ার উপরমহলে তার নাম ফাঁস করে দেয়। ফলে যে ভৌমিক খাদানকে কেন্দ্র করে দিলীপ বসুর সৃজনশীলতা পথ পেয়েছিল— সেই পথও বন্ধ হয়ে যায়। কিছু একটি গড়ে তোলার ইচ্ছা তখন পেশাগত জায়গা ছেড়ে অন্য জগতে প্রবেশ করে। পুরানো গাড়ি কিনে, তাকে নতুন রূপে

সজ্জিত করে, কিছুদিন ব্যবহার করে পুনরায় বেঁচে দেওয়া। কারণ দিলীপ বসুর সব সময় কিছু না কিছু বানাতে ইচ্ছে করে। এই বানানো বা গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই তার শরীর দিয়ে সিক্রেশন হয়। এ ধরণের কাজ না হলে কাজে সে কোনো স্বাদ পায় না। পুরানো গাড়ির খোলনচে বদলানো প্রসঙ্গে দিলীপ জানায়, ''আবার ওরা চলুক। পৃথিবীর গায়ের ওপর দিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াক। হর্নের বদলে দমকলের ঘণ্টা বাজুক। স্টিয়ারিংয়ের পাশে বসুক— চিড়িয়াখানার হরিণের একটা বাচ্চা। তার গায়ে রোদ পড়ে পিছলে যাবে।''[২৩]

এই উপন্যাসে লেখক নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ এনেছেন দিলীপ বসুর ছেলে রবি নামক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নকশাল বিপ্লবীদের স্বপ্ন, লড়াই, কাজ করার পদ্ধতি রবির বিভিন্ন কথোপকথনে উঠে এসেছে। এই রবি খুন করে কালু ঘোষকে যে ছিল কলকাতার একজন কেউকেটা ব্যক্তি। কালু ঘোষের প্রিয় অস্টিন ট্যুরারটা কিনে নেয় দিলীপ বসু। এরপরেই মৃত কালু ঘোষের সঙ্গে দিলীপ বসুর বাস্তব-অবাস্তব মেশামেশি মিলে এক রোমাঞ্চকর যাত্রা শুরু হয়। তার যে একটা চাকুরে জীবন রয়েছে— সেটা যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুলতে শুরু করে দিলীপ। কোল ইন্ডিয়ার কর্তারা যেমন তার হাত থেকে রেহাই পেতে চাচ্ছিল তেমনি দিলীপ বসুও যেন কোল ইন্ডিয়া থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছিল। সেই সময় ঘটনাচক্রে তার নাম একটি হত্যার অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। যদিও পরবর্তীকালে ডাক্তারের রিপোর্টের মাধ্যমে সে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্ত হয়। কিন্তু ততদিনে তার চাকরি চলে গেছে। আর যে স্ত্রী তার কাছে ছিল 'শালগ্রামশিলা', সেই রাণী তার একদা প্রেমিক প্রবোধের সঙ্গে ঘর বাঁধে। নকশাল-বিপ্লবী ছেলে ফেরার, মেয়ে নিজের ইচ্ছামত একজনের সঙ্গে প্রাক-বিবাহ সম্পর্কে বাস করে। যে আশ্রয়কে তার এতদিন মনে হতো দীর্ঘদিনের অভ্যাস— এখন তার স্ত্রীর কাছে সেই আশ্রয় পাবার জন্যই দিলীপের আকুলতা দেখা যায়। খোঁজ নিয়ে দিলীপ জানতে পারল যে, তার স্ত্রী রয়েছে চন্ডীতলায়, রেল-কোয়ার্টারে। গিয়ে দেখল রাণীর গর্ভে তখন প্রবোধের সন্তান। ফলে রাণীর পক্ষে আর দিলীপের কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। পারিবারিক প্রায় সব সম্পর্ক থেকে এভাবেই দিলীপ বসুর বন্ধন আলগা হয়ে যায়।

প্রকৃত বন্ধুত্বের অভাবে দিলীপ বসু যে অশরীরী কালু ঘোষের সত্তাকে সৃষ্টি করেছিল তার মনের চেতনা থেকে, পুনরায় সেই কালু ঘোষই হয় দিলীপের সঙ্গী। এবার সে রবির ছেলে খোকনকে নিয়ে পৌঁছে যায় কালু ঘোষেরই জন্মভূমি গ্রামে। ত্রিশ বছর পর গ্রামের লোক তাকেই কালু ঘোষ বলে ধরে নেয়। অগোছালো, অলস গ্রামজীবন দেখে দিলীপের মধ্যে নতুন করে কিছু বানানোর অদম্য

ইচ্ছা পুনরায় জেগে ওঠে। দিলীপ বসুর জীবনের এই পর্বে আমরা 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা'র অনাথবন্ধুকে দেখতে পাই বা 'কুবেরের বিষয় আশয়'-এর চক্‌দার কুবেরকে। অনাথ বা কুবেরের মত কৃষিজীবনে মগ্ন হয়ে যায় দিলীপ বসু। শুধু তাই নয়, 'স্বর্গের আগের স্টেশন'-এর সাপ-ধরা খগেন ও 'চন্দনেশ্বর জংশন'-এর ওয়াগান-ব্রেকার বজরা চরিত্রের দেখা মেলে দিলীপ বসুর জীবনের এই পর্বে। কালু ঘোষের গ্রাম দেখে, তার ভাঙা বসতবাড়ি দেখে দিলীপ বসুর বড় চেনা মনে হয়। যেমনটা হয়েছিল কুবেরের মেদনমল্লর দুর্গ দেখে। দিলীপ বসু বানাবার ইচ্ছাশক্তিতে ভর করে জুটিয়ে নেয় শ'তিনেক বিঘার জমি। সকলে মিলে পতিত জমিকে পরিণত করে সুজলা সুফলা ধানক্ষেতে। ফলে দেখা যাচ্ছে, দিলীপ বসু বারবার ভেঙে পড়েও উঠে দাঁড়ানোর শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে নাই। উঠে দাঁড়ানোর বিষয়টিই তো অনাদিকাল থেকে কর্মঠ সৃজনশীল মানুষের ঐতিহ্য। যারা আমৃত্যু কিছু বানিয়ে তোলার নেশায় সর্বদা বুঁদ হয়ে থাকে। কিছু বানিয়ে তোলার বিষয়টি তাদের কাছে অনিবার্য অমোঘ নিয়তি হিসাবে যেন ধরা দেয়। কিন্তু এবার তার প্রতিপক্ষ তার নিজেরই বিপ্লবী ছেলে রবি। যার ভাবনায় মানুষের ভালো করার পথে বাঁধা তার নিজেরই বাবা। আর রবির বাবা হিসেবে দিলীপ বসুর ভাবনা হলো মানুষকে নিশ্চিহ্ন করলেও তার স্মৃতি নষ্ট করা যায় না। এই দুই চিন্তার সংঘর্ষে পুত্রের গুলিতে নিজের তৈরি ধান ক্ষেতে লুটিয়ে পড়ে দিলীপ বসু। আর সেই সঙ্গে হয়তো পড়ে থাকল নতুন কিছু বানাবার অক্লান্ত উদ্যোগ, উদ্ভাবনী কৌশল, প্রকৃত বন্ধু পাবার তীব্র আকুলতা, একটি মনের নানান সৃজনশীল খেয়াল।

''এমন উপন্যাস আগে কখনো লিখিনি। ভেবেছি। সাহসে কুলোয়নি। তীরে দাঁড়িয়ে ভয় পেয়েছি। এত বিরাট। এত জটিল। মানুষের মন। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে। দেশের ধর্ম। দেশের মানুষ।"[২৪] 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসের ভূমিকায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একথাই বলেছেন। দু'টি খণ্ডে এগারোশো ষাট পৃষ্ঠা নিয়ে এই উপন্যাসটি লেখকের রচনাসম্ভারে আয়তনের দিক থেকে সর্ববৃহৎ উপন্যাস। শুধু তাই নয়, মোঘল ইতিহাসকে বিষয় করে লেখকের এটি একমাত্র সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৯৯১ সালের বইমেলায় পুস্তকাকারে এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়— দ্বিতীয় খণ্ড পরের বছরে। ১৯৯৩ সালে এই উপন্যাসের জন্যই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'সাহিত্য একাদেমী' পুরস্কার পান। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটি এমন একজন ঐতিহাসিক মানুষের জীবনকে নিয়ে যাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষা নকল করে বলা যায় 'ইতিহাস উপেক্ষিত চরিত্র'। শাহজাদা দারাশুকো যিনি মোঘল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও দিল্লীর মসনদে বসতে পারেননি। এমন একজন মানুষের

জীবনেতিহাস তুলে ধরার কারণ হিসেবে লেখক জানান, ''শাহজাদা দারাশুকো হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মচিন্তায় মিলনবিন্দুটি খুঁজতে গিয়ে সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যান। তাই তিনি হিন্দুস্থানের ইতিহাসে একটি কালো গোলাপ। ব্যথা, সৌন্দর্য, কালের ইতিহাসের সঙ্গে এই গোলাপ জড়িয়ে গেছে। হিন্দুস্থান যুগে যুগে তাঁকে বার বার আবিষ্কার করবে।''[২৫] আলোচ্য উপন্যাসে দারাশুকোর চরিত্রকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আবিষ্কার করে লেখক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের কাহিনি শুরু হচ্ছে ১৬১৫ খ্রি. (১০২৪ হিজরি মহরম মাস) নাগাদ। আকবর বাদশার মৃত্যুর পর সিংহাসনে এখন বিরাজমান সম্রাট জাহাঙ্গীর যার বাদশাহী দশ বছরে পা দিয়েছে। ঢাকা থেকে কাবুল, কাশ্মীর থেকে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা অব্দি চাঘতাই বংশের কাছে নতিস্বীকার করেছে। দারাশুকোর জন্ম হতে আরও কিছুদিন বাকি। সেলিমের চার সন্তানদের মধ্যে বড় ছেলে খসরু তারই নির্দেশে আজ অন্ধ। কারণ সে সিংহাসন লাভের জন্য বিদ্রোহী হয়েছিলেন। যদিও খসরুর চোখে আকন্দের আঠা লাগাবার নির্দেশ দেবার জন্য সেলিম পরে খুব অনুতপ্ত হয়েছিলেন। সেজো ছেলে পরভেজ অপদার্থ। আর ছোট ছেলে শারিয়ার নিতান্তই বালক মাত্র। তাই সম্রাট সেলিম জাহাঙ্গীরের বড় ভরসা একমাত্র মেজো ছেলে খুর্রম। তবে সম্রাটের প্রধান পরামর্শদাতা তার অন্যতম প্রিয় স্ত্রী নূরজাহান। বাজারে কানাঘুষো চলে, নূরজাহানই নাকি এখন হিন্দুস্থান চালায়। সম্রাট স্ত্রীর পূর্বনামে (মেহেরউন্নিসা) মোহর এনেছে বাজারে। আকবরি মোহরের খাতির ছিল সারা পৃথিবীতে— কিন্তু সম্রাট যে নতুন মোহর এনেছে বাজারে তার মূল্য আকবরি মোহর থেকে প্রায় অর্ধেক। ফলে বাজারমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি ঠিক রাখতে জাহাঙ্গীরের দিশেহারা অবস্থা। তার ওপর রাজত্বের নানান দিক থেকে বিদ্রোহ মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠছে। বাদশা জাহাঙ্গীরের বেগম নূরজাহানের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার ফলেই রাজত্বের এই অরাজক অবস্থা। তবে তৎকালীন সময়ে একমাত্র মহাবৎ খাঁ বাদশাকে বাদশাহীর দুর্বল হবার কারণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর সাহস রাখে।

লেখক সপ্তদশ শতাব্দীতে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে হিন্দুস্থানের নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সময়কার মোঘল বাদশাহী নামক বিশাল কলেবরের রাষ্ট্রযন্ত্র—তার মনসবদার, জায়গীরদার, ঘোড়সওয়ার, আহেদি, ধানুকি, ওয়াকেনবীশ, সরবান, তশীলদার, রোজিনাদার, বন্দুকচী, আমির-ওমরাহ, উজির, উজিরে আজম, আতালিক, সুবেদার, ডিহিদার— সেই সঙ্গে ব্যাপারী, ভিখারী, চাষী, সন্ত, বেশ্যা, বাদী, গোলাম, নর্তকী, পাইক, পেয়াদা ইত্যাদি নিয়ে এক বিশাল ক্যানভাসে তৎকালীন সময়ের হিন্দুস্থানের ছবি। জাহাঙ্গীরের আমলে রাজস্বের ঘাটতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাদশা দশ

বছরের রাজত্বকালেই শাসক হিসেবে যেন ক্লান্ত। এখনি মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে কার হাতে চাঘতাই বংশের পতাকা দিয়ে যাবে? কারণ বাদশাহীর চেয়ে মেহেরউন্নিসার প্রেমে মগ্ন থাকতেই ভালোবাসে বাদশা, ''আমি তো মেহেরকে ভালোবাসি। আমি খোদার দোয়ায় আওরত জানি। জানি ভালোবাসা। তার পাশে বাদশাহী কী এমন? ... তো তোমরা আমার বাদশাহী নিয়ে যা ইচ্ছে কুচ্ছ করো— তাতে আমার কী যায় আসে! আমি আশিক্। মেহের মাশুকা! বাকি হিন্দুস্থান গোল্লায় যাক্। তাতে আমার কী!''[২৬] এই প্রেক্ষাপটে আজমিরের শহরতলিতে হেকিম আবদুল হাজি সিরাজির হাতে আরজুমন্দ বেগমের গর্ভ থেকে জন্ম নেয় শাহজাদা খুর্রমের পয়লা আওলাদ যাকে সেলিম বাদশা নাম দিলেন 'সুলতান দারাশুকো'।

এরপর আমরা দেখতে পাই, হিন্দুস্থানের মসনদ দখল করার জন্য ষড়যন্ত্র, লড়াই, কূটনীতি। দক্ষিণের সুবেদার হয়ে শাহজাদা খুর্রম মালব ও গুর্জরের শাহী ফৌজকে সঙ্গে নিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হয়। তার আগেই অবশ্য খুর্রম বুরহানপুরের দুর্গে নিজের বড় ভাই খসরুকে নিজের হাতে গলা টিপে হত্যা করেছে। এদিকে আগ্রায় বাদশার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বেগম নূরজাহান যেনতেন প্রকারে মসনদের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চায়, এমনকি যদি বাদশা জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয় তারপরেও। এই নূরজাহানের কূটনীতিতেই শাহজাদা খুর্রমের আগ্রা জয় সহজ হয় না। প্রায় জিততে জিততে প্রত্যেক যুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করতে হয় খুর্রমকে। শাহী ফৌজের তাঁড়া খেয়ে নানান দিকে পালাতে হচ্ছে— স্ত্রী আরজুমন্দ ও ছয় সন্তান নিয়ে পাহাড়ে, জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেও লড়াই করে খুর্রম। শাহজাদার বাগী হবার দু'বছর পর সম্রাট সেলিম জাহাঙ্গীরের জরুরী তলবে মির্জা রঘুনাথকে ছুটে আসতে হয়েছে কাশ্মীরের বনিহাল দুর্গে। এখানেই মির্জা রঘুনাথের মাধ্যমে 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর' লিখতে লিখতে সম্রাট সেলিম জাহাঙ্গীর ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। মেরে ফেলা হয় শাহজাদা পরভেজ ও শাহজাদা শারিয়ারকে। বন্দী হন বাদশা-বেগম নূরজাহান কাশ্মীরের দূর্গে। উজিরে আজম আসফ খাঁ-এর (খুর্রমের শ্বশুর) কূটনীতি ও সহযোগীতায় হিন্দুস্থানের মসনদে বসে খুর্রম— নাম হয় শাহজাহান। বাদশা-বেগম আরজুমন্দের নাম হয় মমতাজমহল। অবশ্য কিছুদিন পরেই একটি শিশু কন্যার (চতুর্দশতম সন্তান) জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। ধীরে ধীরে শাহজাহানের সন্তানেরা বড় হতে থাকে। প্রথম আওলাদ দারাশুকো সাদিও করে ফেলেছেন করিমউন্নিসার সঙ্গে যার বিবাহ পরবর্তী নাম হয়েছে নাদিরা বেগম। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিতে শাহজাদা দারাশুকো সদ্য যুবক— বাদশা তাকে খেতাব দিয়েছেন 'ফৌজদার-ই-হিসার'।

উপন্যাসে আমরা বাংলা সুবার কথা বারবার পাই। কাহিনির শুরুতেই আমরা উত্তর-পূর্ব বাংলায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে খুন্তাঘাটের গভীর জঙ্গলের কথা শুনি। সেখানকার অধিবাসীরা মূলত হাতিধরা ঘরদুয়ারি পাইক। এদের নেতা সনাতন পাইক তার স্ত্রী মীনাক্ষী আর দুই ছেলেমেয়ে বিষ্ণু আর লক্ষ্মীকে নিয়ে এই অঞ্চলে বাস করে। রাজপরিবারের কাহিনির সমান্তরালে আমরা এই বাঙালি পরিবারের কাহিনি দেখতে পাই। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অবশ্য আহমেদি মীর সফির কাহিনিও। আবার লক্ষ্মীর মেয়ে রানাদিলের কাহিনি এখানে একটা অন্যমাত্রা জুড়ে দিয়েছে। এই রানাদিলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ঘটে শাহজাদা দারাশুকোর। দারাশুকো ও রানাদিল-এর সম্পর্ক দারাশুকোর চরিত্রের একটি দিক উদ্‌ঘাটিত করেছে।

প্রথম খণ্ডে আমরা পেয়েছি এক থেকে তেতাল্লিশতম পরিচ্ছেদ আর দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে চুয়াল্লিশতম পরিচ্ছেদ থেকে একশতম পরিচ্ছেদ। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডেই শাহজাদা দারাশুকো প্রাধান্য লাভ করে। অন্যান্য ভাই-বোনের সঙ্গে তার বড় হয়ে ওঠা। অন্যান্য ভাই-বোনদের থেকে তার জ্ঞানলাভের প্রবল তৃষ্ণা, স্বভাব, আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা, মানস প্রবণতা পাঠকের সামনে নিখুঁত চিত্রকরের মত তুলে ধরেছেন লেখক। মোঘল বংশে আকবরের ভাবশিষ্য হবার একমাত্র দাবিদার হলেন এই দারাশুকো। লেখক জানান, ''দারাশুকো প্রেমের ভেতর, যুদ্ধের ভেতর, ষড়যন্ত্রের ভেতর ভাসতে ভাসতেও মানুষের ধর্ম খুঁজে বেড়িয়েছেন।''[২৭] কিন্তু কূটনৈতিক বুদ্ধি, রাজনীতির জটিল মারপ্যাচ না জানার ফলে জাগতিক বিষয়ে পরাস্ত হতে হয়েছে। তার দু'টি রূপ আমরা দেখতে পাই— একদিকে প্রেমিক দারা অন্যদিকে ধার্মিক দারা— মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম তার চেতনায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অলৌকিকতায় তার বিশ্বাস থাকলেও আওরঙ্গজেবের মত তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। যোদ্ধা হিসাবে নাম থাকলেও যুদ্ধের কৌশল তৈরিতে সেরকম পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু মানুষের প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা ও বিশ্বাস। এর প্রতিদানে রাজপুতদের কাছ থেকে পেয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা— আমির ওমরাহরাও সুযোগ বুঝে পাশ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। তাকে ধর্মদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দারাশুকোর প্রেমিক-সাধক রূপ বোঝার মতো সে সময় খুব কম মানুষই ছিল— যারা ছিল, তারা ক্ষমতালোভীদের কাছে নিরুপায়, অসহায়। লেখক জানান, ''সেসব আঁকতে গিয়ে সেদিনকার হিন্দুস্থানকে দেখতে পাই। সেই সময়— সেইসব মানুষজন তাদের কলরোল নিয়ে কয়েক শতাব্দী পেছনে সময়ের ধুলোয় চাপা পড়ে আছে। সেই ধুলো সরিয়ে দেখতে গিয়ে তাদের ক্ষোভ, দুঃখ, ঈর্ষা, অভিমান, ভালবাসা, ঘৃণা—সবই দেখতে পাই। সাধ্যমত তা আঁকার চেষ্টা করেছি।''[২৮]

দু'টি খণ্ডে প্রকাশিত 'আলো নেই' উপন্যাসটিতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিষয় করেছেন অখণ্ড ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলার এক অস্থির গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কালখণ্ডকে। দেশ স্বাধীন হতে আর বেশি দেরি নয়। কিন্তু স্বাধীনতার আনন্দকে ছাপিয়ে গেছে আসন্ন দেশভাগের মর্মান্তিক যন্ত্রণা— ভিটেমাটি, শেকড়সহ উপরে ফেলার বেদনা। তৎকালীন বঙ্গের রাজনীতিতে কোথাও আশার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কবি জীবনানন্দের ভাষায় এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা যেতে পারে, ''বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ/নিস্তেল।'' ('১৯৪৬-৪৭' কবিতা) শুধু তাই নয়, ধর্মকে রাজনীতির মাঠে হাতিয়ার করে একদল মানুষ গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে ছড়িয়ে দেয় বিভেদ-বিভাজনের কু-মন্ত্রণা। ফলস্বরূপ ভালোবাসার জায়গা নেয় দ্বেষ, সহাবস্থানের জায়গা নেয় দাঙ্গা। প্রথম খণ্ডের কাহিনি শুরু হচ্ছে ১৯৩৭ খ্রি. থেকে। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল কংগ্রেস পরাধীন ভারতবর্ষে কোন কাজকে অগ্রাধিকার দেবে— সে বিষয়ে দিশেহারা। ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন শক্তিশালী করতে পারছে না। যে ভূমি-সংস্কার গ্রাম-বাংলার মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে পারত, তা করতে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। ফলে কংগ্রেস দলের আবেদন হ্রাস পেতে শুরু করে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের কাছে। সেই সুযোগে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভার মত দলগুলোর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কমিউনিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি সহ বামপন্থী সংগঠনগুলো সারা দেশের প্রেক্ষিতে এত দুর্বল যে, তাদের চিন্তা-ভাবনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না। এরকম প্রেক্ষাপটে আবুল কাশেম ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ভোটে জিতে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গড়তে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকায় কংগ্রেস পিছিয়ে আসে। শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে মুসলিম লিগ। সেদিনই যেন বাংলাদেশের ভাগ্যলিখন সম্পন্ন হলো। তারপর ভাগ্যলিখন অনুসারে বাঙালি এগিয়ে গিয়েছে দেশভাগের দিকে, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দিকে, পড়শিতে পড়শিতে আলাদা হবার দিকে।

এই অস্থির কালপ্রবাহে লেখক উপন্যাসে চরিত্র হিসাবে এনেছেন মহাত্মা গান্ধি, সুভাষচন্দ্র বসু, মহম্মদ আলি জিন্না, জওহরলাল নেহেরু, শরৎ চন্দ্র বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, দিলীপকুমার রায়, আব্বাসউদ্দিন, প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া, কাজী নজরুল ইসলাম, সজনীকান্ত দাশ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, কানন দেবী, মুজফ্ফর আহমেদ, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দি, অহীন্দ্র চৌধুরী, হেমেন্দ্র কুমার রায়, বঙ্কিম ঘোষ, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, নরেশ সেনগুপ্ত, মৌলানা আক্রম খাঁ, চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ। এই বিশাল ক্যানভাসে লেখক ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার

সঙ্গে সঙ্গে পেশকার অনন্ত ঘোষালের কাহিনি তুলে ধরেছেন। মধ্যবয়স্ক অনন্ত খুলনা কোর্টের সেসন জজের পেশকার হিসাবে কাজ করে। পাঁচ সন্তান (টুনু, পানু, তনু, খোকন, গৌর) ও স্ত্রী রত্না ঘোষালকে নিয়ে সে অবিভক্ত বঙ্গের খুলনা শহরে মাসিক চোদ্দ টাকার ভাড়া বাড়িতে থাকে। টুনু কলেজে, পানু এবছর ম্যাট্রিকুলেশন দেবে, তনু ক্লাস থ্রিতে পড়ে। আর বছর চারেক বয়স খোকনের ও গৌর সবে এক বছর পেরিয়েছে। আয়ের দিক থেকে অনন্ত ঘোষাল নিম্নমধ্যবিত্ত যে বাড়িতে এখনও ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করতে পারেনি। এছাড়াও আমরা উল্লেখযোগ্য কাল্পনিক চরিত্র হিসেবে পাই কংগ্রেস কর্মী ভবানীকে (সুভাষপন্থী) যার স্বামী দিলীপ সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। এই ভবানীর সঙ্গে টুনুর একটা মিষ্টি প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। টুনু সংসারে আয় বাড়াতে কলকাতায় দাঁতের মাজন কোম্পানিতে কাজ নেয়। পানু বড় হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লেখায়। তেভাগার দাবিকে সফল করতে আরও অনেকের সঙ্গে পানু গ্রামে গ্রামে ঘোরে। জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তার বাবা শিরীশবাবুর দুই জারজ সন্তান কালা আর ফোতো, ফ্যাকাশি দাই, জমিদার কালিদাস ঘোষ, মুসলিম লিগ সংগঠক ফেরদৌস প্রমুখ চরিত্র অনায়াসে জায়গা করে নেয় ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে। এভাবেই বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান— জমিদার, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, জারজ সন্তান, অতিবৃদ্ধ, ভূমিহীন চাষি; সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা উপন্যাসের কাহিনিতে তৎকালীন বঙ্গের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আসলে 'আলো নেই' উপন্যাসটি অবিভক্ত বঙ্গের ত্রিশ-চল্লিশ দশকের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনকে তুলে ধরেছে।

'ক্ষমতার বারান্দা' (১৯৮৮) উপন্যাসটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অক্ষয় দত্তের পশুপালন, পূর্ত ও গৃহমন্ত্রী হয়ে শপথ নেওয়া দিয়ে শুরু হয়েছে। পাশাপাশি চলেছে অক্ষয় দত্তের কিছুটা স্মৃতিচারণ। সাধারণ জীবনকে খুব কাছের থেকে দেখা, পলিটিক্স-এ নিজের মাটি শক্ত করার গল্প এটি। তাইতো রাজনীতির যাঁতাকলে এই চরিত্রটি বারবার ক্লান্ত বোধ করে। তার কাছে এই 'মন্ত্রীত্ব' প্রমোশন বলে মনে হলেও স্ত্রী ইলা মনে করিয়ে দেয় এ বরং 'ডিমোশন'। কতগুলো চোখ সারাক্ষণ নজরে রাখে, সহানুভূতিও হয়ে দাঁড়ায় কটাক্ষের কারণ। হয়তো জীবনকে বিভিন্ন অনুভূতিতে দেখেছেন বলেই এমন দরদি কথা বলে চরিত্রটি। কোনও দিন বড়লোক হবে এই ভাবনায় চিন্তিত হয়নি অক্ষয়। সতেজ স্নায়ু, অল্পেই খুশি। একসময় যে গান্ধিবাদী সরলদার কাছে অসময়ে সাহায্য পেয়েছিলেন এবং ১৯৪৫ খ্রি. জেল থেকে বেরিয়ে যখন আর সরলদার খোঁজ পেলেন না তখন তার মনে হলো যেন প্রথম যৌবনের উপবন তছনছ হয়ে গেছে। আজ যখন সেই সরলদার ঘরেই যেতে হচ্ছে সিমেন্ট মামলার

আসামিদের জামিন পাওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে তখন ভেতরে ভেতরে অনেকটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। হর্ষ ঘোষ হলেও হয়ত এতটা হত না। কিন্তু যখনই তিনি ক্লান্ত হয়েছেন, যখনই মনে হয়েছে সব মিথ্যে তখনই তার নিজের ভেতরে পেয়েছেন 'ডগলাস'কে। ভেতর থেকে যে সাহস যুগিয়েছে তাকে। মন্ত্রী হবার পর নানাদিক থেকে তাকে গো স্লো বলা হলেও চুপ করে থাকেননি তিনি। নিজের কথাকে কাজে রূপায়িত করেছেন বরাবরই। শরৎ সেতুর মামলা যেন অক্ষয়কে নাড়িয়ে দেয়। দল থেকে বেরিয়ে নতুন করে রাজনীতির কথাও তাকে ভাবতে হয়। কিন্তু মন্ত্রীত্ব ছাড়াও সহজ কথা নয়। ক্ষমতার বারান্দা থেকে দেখলে অনেক সহজ দেখা জিনিসও জটিল হয়ে ওঠে। ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ না করার গ্লানি অক্ষয় অনুভব করে। মনে হয় যেন শুধু তিনি কথার খেলাপ করে চলেছেন। এক সময়ের আইন অমান্য, হরতাল, জোড়া বাংলা বন্ধ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ রাজবন্দী আজ রাজপ্রতিনিধি। ফিরে গেছেন প্রতিমার কাছে একটু স্বস্তির জন্য। ভালোবাসার জায়গাকে আঁকড়ে ধরে ক্ষমতায় এসে আজ সব মোহ কেটে গেছে। রাজনীতি ছেড়ে আবার নতুন করে বাঁচার ইচ্ছা— এটাই স্বাধীনতা। এই সার কথাটাই উপন্যাসের শেষে উঠে এসেছে।

'ডুব সাঁতারের বিপদ আপদ' (১৯৮৮) উপন্যাসটিকে একটি সামাজিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। যেখানে একই সময়ের নানা চরিত্রের আনাগোনা। উপন্যাসটি মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী ঊর্মির নতুন বাড়িতে উঠে আসা দিয়ে শুরু হয়েছে। নতুন ভাড়াবাড়ির আশেপাশের মানুষদের নিয়ে উপন্যাসটি। যেখানে দুর্গা মৌলিক মৃত স্বামী মৃগাঙ্কমোহন মৌলিকের স্বপ্ন দেখে বাস্তবতায় ভাসে। দুই সন্তানের মা পুটুকে দেখে মোহিত হয়ে যায়। আলু আর লেবু, দুই ভাইয়ের মধ্যে লেবুর পাড়ারই তার চেয়ে কম বয়সের কঙ্কাবতীর প্রেমে পড়া আর রঘুপতি ঘোষের রোগা হওয়ার অদম্য ইচ্ছা— এইসব রয়েছে গোটা উপন্যাস জুড়ে। গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবন নিয়েই যেন মেতে থাকে মোহিত। আবার কখনও পুটকে দেখে নিজেকে ঘষেমেজে রোগা করার তাগিদ জাগে। এছাড়াও রয়েছে ঝকঝকে স্লিম তরুণী নন্দা। মোহিতের মনে হয় তার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই কেননা সে আর অস্থির হয়ে ওঠে না। আকাঙ্ক্ষা মরে যাওয়া মানুষ সে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কঠিন সময়' (১৯৯৯) উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে প্রণবেশ দস্তিদারের ওজন যন্ত্রে নিজের ওজন মাপা নিয়ে। 'ডুব সাঁতারের বিপদ আপদ' উপন্যাসটিতেও যেমন দেখা যায় মানুষের রোগা হওয়ার তীব্র ইচ্ছা, এখানেও দেখা যায় পুরানো চেহারার প্রতি মোহ কিংবা বর্তমানের প্রতি অনীহা। মানুষ মোহের বশবর্তী হয়ে আশ্রয় নেয় অলৌকিকতার (প্রসঙ্গ বশীকরণ)। জানে না

ফল কী হবে, তারপরেও।

'তারসানাই' (১৯৯৩) উপন্যাসে দেখি ষাট বছরের এসরাজ শিল্পী সুধীর পালিতের নিঃসঙ্গতা। বত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের শেষে এসে তিনি দেখেন, এসরাজ বাজাবার জন্যে একজন শিল্পীর ভেতর যে আনন্দ থাকা দরকার— তা আর নেই। আরতির সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবন একটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। এসরাজ বাজানো যখন বোঝা হয়ে উঠছিল সুধীর পালিতের কাছে তখন তার এক গুণমুগ্ধ ভক্ত সোহিনীর সঙ্গে তার পরিচয় হয় ধীরে ধীরে যা অসম বয়সের প্রেমে পরিণত হয়। যদিও এই প্রেম নিয়ে কোনও লুকোছাপা নেই সুধীরের। এই প্রেমই তার শিল্পীসত্তাকে পুষ্টি জোগায়। এমনকি সুধীর পালিত নিজের শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। আরও বেশি অর্থের সংস্থান করতে ছোটে একদা স্কুলের বন্ধু বর্তমান শেয়ার-ব্রোকার দেবুর কাছে। সোহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক হলেও আরতির প্রতি ভালোবাসা সুধীরের কম হয় না। আসলে সুধীর একই সঙ্গে দু'জনকেই ভালোবাসতে চায়। দু'জনকে নিয়ে সবার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে চায়। এই ধরনের ভাবনা না আরতি না সোহিনী কেউই গ্রহণ করতে পারে না। তাই সোহিনী শেষপর্যন্ত পিছু হটে। একজন শিল্পীর শেষ বয়সেও শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। 'সুশ্রী, গৌরী এবং ...' (১৯৯৩) উপন্যাসে লেখক এমন এক সময়ের কথা বলেছেন যখন চাকরি নির্ভর বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে প্রবল হতাশা বাসা বেঁধেছে। শিক্ষিত বেকার ছেলের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে বিয়ে না-হওয়া মেয়েদের পাড়াবেড়ানো স্বভাব। শতকরা নব্বই জনকে কাজ দিতে হবে— এই দাবি নিয়ে ভোটের ময়দানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল লড়াই করে। কাগজে সুশ্রী, গৌরী, স্বাস্থ্যবতী ইত্যাদি দিয়ে পাত্রীর বিজ্ঞাপন বের হয় কিন্তু বিয়ে করার জন্য একটি পুরুষের যে আর্থিক নিরাপত্তার দরকার, তা না থাকার ফলে বিয়ে করতে সাহস পায় না সেই সময়ের অবিবাহিত যুবকেরা। অদিতি এরকমই এক বিবাহযোগ্যা সুন্দরী মেয়ে। তার প্রেমে পড়ে তারই দিদির ছেলে রানা। আবার ষাটোর্দ্ধ বিপত্নীক বিপন্ন পালক বসু পেনশনের টাকা সম্বল করে নিজের বেকার ছেলের বিবাহ প্রস্তাব দেবার বদলে নিজের বিবাহ প্রস্তাব রাখে অদিতির কাছে। অন্যদিকে অদিতি ভালোবাসার জন্য নিজের মনের মত যুবক না পেয়ে তার চেয়ে বয়সে অনেক বড় বিবাহিত তড়িৎবাবুর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। তার একদা প্রেমিক পার্থ আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে না পেরে পার্থর আত্মবিশ্বাস তলানিতে গিয়ে ঠেকে। ফলে অদিতি রাজি থাকলেও সম্পর্ক থেকে পিছিয়ে আসে পার্থ। এজন্যই অদিতি শেষপর্যন্ত তড়িৎ-এর সঙ্গেই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আসলে লেখক সেই সময়ের চাকরির অভাব,

অবিবাহিত মেয়েদের সমস্যা, শিক্ষিত বেকার যুবকদের সমস্যা ইত্যাদি কীভাবে আমাদের সামাজিক-পারিবারিক জীবনে সম্পর্কের রসায়ন পাল্টে দিচ্ছিল, তাই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'তারসানাই' উপন্যাসে আমরা যে কাহিনি পাই—সেই একই রকম কাহিনি আর একটু পল্লবিত আকারে দেখতে পাই 'কামিনীকাঞ্চন' (১৯৯৪) উপন্যাসে। এসরাজ শিল্পী সুধীর পালিত এখানে লেখক কনক পালিত। স্ত্রী আরতি উভয় উপন্যাসে একই নামে রয়েছে— যেমন রয়েছে পালিত-প্রেমিকা সোহিনীর নাম। শেয়ার বাজার ইনভেস্টর দেবু এখানে হয়েছে ভরত চৌধুরী। দু'জায়গাতেই অফিসের নাম লায়নস রেঞ্জ। তবে এই উপন্যাসে ভরত চৌধুরীর জীবন ও পরিবারের কাহিনি একটি বড় জায়গা জুড়ে আছে। সোহিনী বুঝতে পারে শুধু ভালোবাসলেই বা দু'জনেরই নতুন জীবন শুরু করার ইচ্ছা থাকলেই তা করা যায় না। কারণ 'ভালোবাসায় টাকারও একটা জায়গা আছে। ভালোবাসা স্রেফ গাছতলায় হয় না। ... সে জানত না— ভালোবাসায় এক শর্ত থাকে। যে শর্ত তারকাঁটা হয়ে পিঠে ফুটে যায়। সব সময় যন্ত্রণার পাথর হয়ে মনের ভেতর ডেবে বসে থাকে।"[২৯] তাই শেষ বয়সে এসে কনক পালিতকে টাকা বাড়ানোর খেলায় নামতে হয়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় হিন্দু ধর্মের একটি অন্যতম বিশ্বাস জন্মান্তরবাদ, কর্মফলবাদ-কে বিষয় করে উপন্যাস নির্মাণ করেছেন। আমরা এই বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা দু'টি উপন্যাস পাই 'গত জন্মের রাস্তায়' (১৯৮৫) ও 'ভালবাসিব না আর' (১৯৯৮)। 'গতজন্মের রাস্তায়' উপন্যাসে বঙ্কুনাথ মহত্তমের একমাত্র ছেলে বিপুল তার গতজন্মের সব ঘটনা মনে করতে পারে। যেমন— সাঁতার না জানার ফলে পুকুরে ডুবে তার মৃত্যু হয়, বাবা-মা, তার দাদার র‍্যাকেট কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল, কোথায় আগে থাকত ইত্যাদি। প্রথমে বিশ্বাস না হলেও গতজন্মের বাবা নীরদ, মা অনিমা, দাদা তনুর ধীরে ধীরে বিপুলের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও টান জন্মাতে থাকে। সেই টানকে লক্ষ্য করেই এজন্মের বাবা-মা বঙ্কু ও নয়নতারার মধ্যে অর্থপ্রাপ্তির লোভ জন্মাতে থাকে। এই চরিত্রগুলো ছাড়াও আমরা গুণিন সত্য মহত্তম, স্ব-ঘোষিত অবতাররূপী শান্তি মহত্তম প্রমুখ চরিত্রদেরও দেখি। ধর্ম, ভগবান, অবতার, লোকবিশ্বাস ইত্যাদির সঙ্গে অর্থের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তা এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন। জাতিস্মর হবার ঘটনা আমরা 'ভালবাসিব না আর' উপন্যাসেও দেখতে পাই। এখানে অঘোরিবাবা কলেজের অধ্যাপক কমলেশকে বলে, ''দেখুন—আমরা আলাদা আলাদা আত্মা হলেও জন্মসূত্রে একই জাতকের সঙ্গে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সুতোর যোগ থাকে। কোনও রাস্তা দেখলে মনে হয়— বড় চেনা। কোনও অপরিচিত মানুষকে দেখলে মনে হয়— যেন চিনি। যেন চিনতাম। এমন হয় কেন? হয়—

কারণ, চাপা পড়া স্মৃতি যখন সংস্কার ভেদ করে জেগে ওঠে।"[৩০] এই বাবার পরামর্শেই কাজের ছেলে পটল ও স্ত্রী খুকুকে নিয়ে কমলেশ বেনারসের গোধূলিয়ায় যায়। সেখানে গিয়ে কমলেশ ও খুকুর গতজন্মের বিভিন্ন স্মৃতি ফিরে আসতে থাকে। কমলেশ সেই স্মৃতিতে পুরোপুরি ডুবে গেলেও পটল খুকুকে সেই স্মৃতিতে পুরোপুরি ডুবতে বাঁধা দেয়। আসলে দীর্ঘদিন কমলেশের বাড়িতে কাজ করতে করতে বালক পটলের খুকুর প্রতি ভালোলাগার টান জন্মেছে। পটলের মনে ভয় জন্মায় এই যে, খুকু যদি এই জন্মের স্মৃতিতে ফিরে না আসে, তাহলে হয়তো পটল দূরে সরে যাবে। তাই সর্বশক্তি দিয়ে বাঁধা দিতে থাকে মামিমা বলে সম্বোধন করা খুকুকে। এখানে বালক পটলের ভালোবাসা অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

'ভালোবাসলে জ্বর হয়' (১৯৮২) ও 'চিন্ময়ী' (১৯৯৬) উপন্যাসের কাহিনিসূত্র এক। একটি কাহিনিসূত্র দিয়েই পৃথক নামে গ্রন্থ প্রকাশ বলা যেতে পারে। সমাজ, সময় বদলালেও নারীরা যে পুরুষের চোখে ভোগ্যপণ্যের বেশি কিছু নয়, তা চিন্ময়ীর প্রতি মিহির, গোপাল প্রমুখের আচরণেই প্রমাণিত। সেই নারী যদি আবার আর্থিক ও মানসিক দিক থেকে অসহায় ও একাকী হয়। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চিন্ময়ীকে সুযোগ তুলে ধরতে হয় লোভী শকুনের মত চেয়ে থাকা পুরুষদের সামনে। কিন্তু সময় বদলায়, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে একদিন ঘুরে দাঁড়ায় চিন্ময়ী। বিয়ে হয় কল্যাণদের অফিসের বড় কর্তার সঙ্গে। এবার বিভিন্নভাবে তাদের উদ্দেশ্যে করুণা বিতরণ করে তাদের অসহায়তার সুযোগ নেয় এবং বুঝিয়ে দেয় সমাজে তাদের অবস্থান। 'কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল' (১৯৮৫) ও 'শেষ দরবার' (১৯৮৮) উপন্যাসের কাহিনিও একসূত্রে গাঁথা। এখানে এক রাজনীতিবিদের জীবনকাহিনি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লেখকের অনেক উপন্যাসেই বেশি বয়স্ক পুরুষ মানুষের কম বয়স্ক বা কখনও মেয়ের বয়সী নারীর প্রতি প্রেমের সম্পর্ক দেখতে পাই। শিল্পী, সাহিত্যিক থেকে রাজনীতিবদ্, সাধারণ গৃহস্থ প্রায় সবক্ষেত্রের পুরুষ মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি। এখানে রাজনীতিবিদ্ কুন্দনলালের বহুগামীতা লেখক তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আর্থিক প্রতিপত্তি— দু'টো বিষয়ই তার বহুগামী প্রবণতাকে লাগাম পরাতে দেয়নি। দুই স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নিজের এক স্ত্রী (বিমলা)-র বোনের মেয়ে শিপ্রাকে বিয়ে করে সে। নিজের অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু অমিয়র একমাত্র মেয়ে মায়ার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায়। তার এই বহুগামী প্রবণতা ও রাজনীতিতে কুন্দনলাল এতটাই ডুবে যায় যে পরিবারের প্রতি ও পরিবারের অন্যান্য লোকজনের (ছেলে-মেয়ে) প্রতি কোনও নজরই থাকে না। কিন্তু যে রাজনীতি ছিল কুন্দনলালের অন্যতম অস্ত্র— যাকে হাতিয়ার করে সে

এতদিন কাপতেনগঞ্জে কাপ্তানি করে গেছেন; নিজের সেই অতিপরিচিত জায়গাতেই রাজনীতির জন্য নিজেরই ছেলে প্রবীরের হাতে খুন হতে হয়।

'দশ লক্ষ বছর আগে' (২০০১) উপন্যাসে লেখক ইতিহাসের স্মৃতি ও বিজ্ঞানের কল্পনার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। টালিগঞ্জের সংহতি কলোনির বাসিন্দা রাখাল মাস্টারের স্মৃতি আটকে থাকে দু'শো বছর আগের হেস্টিংস-কর্ণওয়ালিশ-টিপু সুলতানের সময়ে। অন্যদিকে জলধর কুণ্ডুর একমাত্র ছেলে পরিতোষ ও তার স্ত্রী এলসা টিচবোন জেনেটিক্স টেকনোলজি নিয়ে গবেষণা করে। তারা প্রাণের কূট-রহস্যে ডুব দিয়ে এই পৃথিবীর প্রাণের অনুরূপ প্রাণ তৈরির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। বর্তমানে আমরা যা 'ক্লোন টেকনোলজি' নামে জানি, লেখক হয়তো সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে বলা যেতেই পারে, উপন্যাসে 'ক্লোন টেকনোলজি'র প্রসঙ্গও আমরা পাই। আবার জলধর কুণ্ডু পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে দাদার সঙ্গে মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল। সেই মামলাতেই দাদা নিঃস্ব হয়ে শেষপর্যন্ত মারা যায়— মৃত্যুর আগের তিন বছর পরস্পর একটি কথাও বলেনি। সেখান থেকেই এক গভীর পাপবোধের জন্ম হয় জলধরের মনে। এই পাপবোধ থেকেই স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত হয়ে সব ভুলে যায় সে। সংহতি কলোনির কুণ্ডুদের বাড়িতে ক'দিনের জন্য থাকতে এসে জলধরের পুত্রবধূ এলসা এক গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে খটখটে পুকুরের গর্ত থেকে কোনও প্রাগৈতিহাসিক জন্তুকে দেখতে পায় যাকে রাখাল মাস্টার নাম দিয়েছে কচিবাঘ বা বাঘডাঁশা। আসলে প্রকৃতি-পরিবেশ তার নিজস্ব খেয়ালে চলে— বিজ্ঞান সেটা নিয়েই কাঁটাছেঁড়া করে গালভরা নাম দেয় — জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ার। এই পৃথিবী সব সময় নতুন নতুন প্রাণের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। তাই যখন এলসা তার পেটের ভ্রূণকে ব্যবহার করতে চায় শ্বশুরমশাইয়ের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে তখন শাশুড়ি আরতি প্রবল বাধা দেয়। কারণ আরতির কাছে কৃত্রিম জীবন অপেক্ষা প্রকৃতি প্রদত্ত জীবন অনেক বেশি মূল্যবান।

'নয়ন' (১৯৯৮) উপন্যাসের প্রধান চরিত্রে আছে সাতানব্বই বছরের কৃপাসিন্ধু তালমিছরি কোম্পানির মালিক শিল্পপতি নয়নসিন্ধু রায়। বাবা কৃপাসিন্ধু যে প্রতিষ্ঠানের বীজ বুনে গিয়েছিলেন— তাই নয়নসিন্ধু অসম্ভব পরিশ্রম, অধ্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের অন্যতম একটি তালমিছিরির কোম্পানিতে পরিণত করে। এতগুলো বয়স পার করে এসেও নিজের হাতে তৈরি কোম্পানির প্রতি নয়নসিন্ধুর টান অটুট আছে। যদিও ব্যবসার সমস্ত দিক বর্তমানে দেখে একমাত্র ছেলে কুসুমসিন্ধু। কিন্তু ব্যবসা বাড়াতে গেলে বা ধরে রাখতে গেলে যে মনোযোগ, নিষ্ঠা থাকা দরকার, তার ছিটেফোঁটা নিজের ছেলের মধ্যে দেখতে পায় না। অফিসে কাজের সময় নিজের সেক্রেটারিকে নিয়ে দাবা খেলতে

বসে কুসুম। ব্যবসা বাড়ানো অপেক্ষা আধুনিকীকরণে তার মনোযোগ বেশি। ফলে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে পাওনা বৃদ্ধি পাওয়া, অফিসে ঘুঘুর বাসা বাঁধা, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে থাকে। কোম্পানিতে প্রেসিডেন্ট পদে থাকলেও নয়নসিন্ধুর নিয়ন্ত্রণ আলগা হতে থাকে। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা খুব বেশি গুরুত্ব পায় না কোম্পানিতে কিংবা কুসুমসিন্ধুর কাছে। নয়নসিন্ধু শেষ বয়সে এসে বুঝতে পারে, ''... আমি আর তোমার বাবাও নই— দাদাও নই। আমরা দুজন আলাদা মানুষ। সংসার করতে গিয়ে আমি তোমার বাবা। তুমি আমার ছেলে।''[৩১] তাই হয়তো তিলে তিলে তৈরি করা সিন্ধু গার্ডেন ছেড়ে যায় না নয়ন। এই বাড়িতে জড়িয়ে আছে তার স্ত্রী সত্যবতীর স্মৃতি। রয়েছে নিজের হাতে তৈরি করা দুষ্প্রাপ্য বইয়ের গ্রন্থাগার। আর গ্রন্থাগারের পেছনে পুরানো অচল নোট রাখার ঘর। যে টাকার হিসাব কৃপাসিন্ধু মিছরির খোলা খাতায় দেখানে অসম্ভব। এইসব টাকা শুধু নয়নসিন্ধুর বুদ্ধিবলে আয় করা। ফলে সে বাতিল টাকার মধ্যেই নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায়ের দিনগুলো দেখতে পায়। যে ছেলে তাকে বর্তমান ব্যবসার সময়ে বাতিল মনে করে, সেই ছেলের তৈরি বাড়িতে না গিয়ে এই বাতিল সিন্ধু গার্ডেনের বাতিল নোটের মধ্যে থেকে যেতে চান তিনি। যেখানে প্রতিটি ছত্রে ছত্রে নিজের সৃজনশীল হাতের ছোঁয়া, এক পরিশ্রমী হাতের ছোঁয়া লেগে আছে— বয়সের ভারে সেই হাত যতই কাঁপুক না কেন!

প্রকাশক চরিত্রও উঠে এসেছে লেখকের কলমে। 'তৃতীয় মেরু' (১৯৯৮) উপন্যাসে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থ সংস্কৃতজ্ঞ মার্জিত রুচির একজন প্রকাশক যিনি নিজের পরিশ্রম দিয়ে নয়নসিন্ধুর মতই ধরণী আর্ট প্রেসের পত্তন ও সমৃদ্ধি ঘটান। শুধু পার্থক্য এখানেই যে শ্রীকুমারবাবু গুণগতভাবে উন্নত মানের বই প্রকাশকে আঁকড়ে ধরে থাকেনি। তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চালিয়েছে পর্নোগ্রাফির বই প্রকাশের ব্যবসা। আর এসব অশ্লীল বই লেখার কাজে যুক্ত হত তারা যারা বুকভরা স্বপ্ন ও নিঃস্ব পকেটে শুধু পান্ডুলিপি হাতে নিয়ে প্রকাশকের দরজায় দরজায় হন্যে হয়ে ঘুরত— তাদের অসহায়তার সুযোগ নিতেন শ্রীকুমার। একসময় উদীয়মান লেখক অনিমেষ মিত্র বেদান্তের এই ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। এমনকি পুলিশের হাতে অনিমেষ ধরাও পড়ে। এরপরেই জীবন পাল্টে যায় অনিমেষের। এসবই অবশ্য অনেকদিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা। বর্তমানে অনিমেষ নাম পাল্টে টগর মিত্র নামে বিখ্যাত লেখক। ভাড়াটে হয়ে নতুন পাড়ায় উঠে আসলে সেখানে আলাপ হয় সরল বড়াল ও তার অন্ধ শ্বশুরের সঙ্গে। এক ধাক্কায় অনেক দিনের পুরানো ক্ষত যেন জেগে উঠল অনিমেষের হৃদয়ে। কারণ সরল বড়ালের অন্ধ শ্বশুরই হলেন একদা দাপুটে প্রকাশক বেদান্ততীর্থ। একদিন ভোরবেলায়

অশক্ত অসমর্থিত বেদান্ততীর্থের দেখা পেলে অনিমেষ তার সমস্ত ক্ষোভ উগরে দেয়। এমনকি হত্যার পরিকল্পনাও তার মাথায় আসে কিন্তু শেষপর্যন্ত যে দেবতুল্য ইমেজ নিয়ে পরিবারে-সমাজে বাস করছে বেদান্ততীর্থ— অতীতের সমস্ত ঘটনা ফাঁস করে সেই ইমেজটাকেই নষ্ট করে দিতে চায় অনিমেষ। কারণ অতীতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছিল তার সম্মানের। অনিমেষ বলে, ''কেউ আজ তা মনে করে বসে নেই ঠিকই কিন্তু সব ভুলে গেলেও সেই লজ্জা ভুলতে পারি না শুধু তোমার জন্যে, শুধু তোমার জন্যে— শীতকালের ব্যথার মত টনটন করে ওঠে। আমি ভুলতে পারি না।''[৩২] অন্যদিকে শ্রীকুমার নিজের বয়স, অসহায়তার কথা বলে একদা দাপুটে প্রকাশক করুণা ভিক্ষা করতে থাকে অনিমেষ ওরফে টগর মিত্রের কাছে।

' সূর্যাস্তের আগে' (১৯৯৮) উপন্যাসটি অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন মানুষের কাহিনি। এদের মধ্যে কেউ পুনরায় কাজে যোগ দিয়ে কাজে ডুবে থাকে, কেউ প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে এখনও আলোড়িত হয় আবার কেউ বা স্ট্যাটাস সিম্বলের ইগো অবসর জীবনেও বয়ে বেড়ায়। এই উপন্যাসের সুরথ ভাদুড়ির কাহিনি ও 'কহেলগাঁও' উপন্যাসের স্বরূপ তালুকদারের কাহিনি এক। দু'জনেই এনিমি প্রপার্টি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এদেশে নবাব নির্মিত প্যালেসের মালিক হন। আবার দু'জনকেই সম্পত্তির পুরো দখল নিতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল, যেটার মীমাংসা হয় আদালতে। শুধু 'কহেলগাঁও' উপন্যাসে যে রোশেনারার উল্লেখ সংক্ষিপ্ত আকারে করা হয়েছিল, এই উপন্যাসের শেষ অংশে সেই রোশেনারার সঙ্গে নীলাম্বরের কথোপকথনে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখা যায়। 'মানুষের রহস্য' (১৯৮৯) উপন্যাসে শ্রমিকশ্রেণির কথা উঠে এসেছে। এই শ্রমিকেরা নিজেদের মধ্যেই বিবাদমান। সংকীর্ণ স্থানীয় রাজনীতি ও মালিকপক্ষের কূটনীতিতে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্ম হয়। বিভাজনের রাজনীতি মানব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক পুরানো একটি বিষয়। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করেই লেখা এই উপন্যাস। যাদের উপরে এটা প্রয়োগ করা হয়, তারা বুঝতেই পারে না বৃহত্তর ক্ষেত্রে এটা নিজেদেরই ক্ষতি। এখানেও দেখি, একদল শ্রমিক ভিক্ষা করে অনাহারে দিন কাটায় আর অন্যদল কারখানার সামনে বসে তাস খেলতে খেলতে একদা সহকর্মীদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র পাকায়।

'জলপাত্র' (১৯৭৮) উপন্যাসে দেখি, অন্যকে জলপাত্র করে রাখার প্রবণতা — এই বিষয়কে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস লেখা। সময়, সুযোগ, পরিস্থিতি, সাধ্য— এগুলো এই প্রবণতা বা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঋষিরাজ পুরকায়স্থের পরিবারের মধ্য দিয়ে এই প্রবৃত্তির রূপ ও পরিণাম দেখিয়েছেন লেখক। একটা সচ্ছল সুখী পরিবার ঋষিরাজের । দীর্ঘ সুখী বিবাহিত জীবন কাটানোর পরেও পরিচারিকা

কুন্তি মান্নার প্ররোচনায় ও কিছুটা নিজের ইচ্ছাতেও বাবু হয়ে রক্ষিতা রাখার ইচ্ছা জন্মে। অন্যদিকে পুরকায়স্থের স্ত্রী মালাও নিজের শরীরী আবেদনের সাহায্যে তরুণ থেকে প্রৌঢ় সকলকে নিজের জলপাত্র করে রাখতে চায়। হয়তো দাম্পত্য জীবনের একঘেয়ামি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাদের মনের মধ্যে এই সাধ জন্মে। এখানে বাড়ির পোষা কুকুর খুশির মধ্যেও অন্য পুরুষ কুকুরের প্রতি টান দেখানো হয়েছে। আসলে পুরকায়স্থের পরিবারের প্রতিটি সদস্য কারও না কারও প্রতি আসক্ত। প্রত্যেকের মধ্যে অন্যকে জলপাত্র করে রাখবার ইচ্ছা। এটাই উপন্যাসের মূল বিষয়।

'গোলকধাম' (১৯৭৯) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছে 'দৈনিক প্রভাত' পত্রিকার নিউজ এডিটর বছর চুয়াল্লিশের রঙ্গলাল সেন। নিউজপ্রিন্টের গোডাউনের ক্লাক থেকে ধীরে ধীরে পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা ও কলমের জোরে আজ সে নিউজ এডিটর। কিন্তু রঙ্গলাল যখন দায়িত্ব নেয় তার আগে থেকেই 'দৈনিক প্রভাত'কে জনগণ সকাল বেলার সঙ্গী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা শুরু করেছিল। কারণ হিসেবে উঠে আসে শাসকদলের হয়ে অতিরিক্ত চাপলুসি, রাজনৈতিক এজেন্ডা ও চরিত্র দিয়ে কাগজের পাতা ভরানো এবং সেই শাসকদলের ভোটে হেরে যাওয়া ইত্যাদি। রঙ্গলাল সেন 'দৈনিক প্রভাতে'র এই পড়ন্ত বেলায় চলে যাওয়া নিউজ এডিটরের চেয়ারে বসে কীভাবে পুনরায় এই খবরের কাগজকে মানুষের সকালবেলার সঙ্গী করে তুলল— তারই কাহিনি হলো 'গোলকধাম' উপন্যাসের। এখানেও 'খুশি' নামের কুকুর দেখতে পাই। নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ কী ধরনের খবর পড়তে চায়, কোন্ কোন্ বিষয়ে জানতে চায়, কোন্ কোন্ বিষয়ে তারা স্বাদ পায় বাড়ির মহিলা থেকে ওয়ার্কিং লেডি ইত্যাদি জানার জন্য রঙ্গলাল নিজে বেড়িয়ে পড়ে কলকাতার রাস্তায়— তারপর সারাদিন ধরে চলে পর্যবেক্ষণ। এই সব কাজ করতে গিয়ে সমাজবিরোধী কাজও তার নজরে চলে আসে। ফলে তাদের হাতে পড়ে মাথায়, হাতে রডের মার খেয়ে সে হাসপাতালে ভর্তি হয়। খবর পেয়ে রঙ্গলালের স্ত্রী রুবি হাসপাতালে গিয়ে দেখে খবরের কাগজের এম. ডি. স্বয়ং রঙ্গলালের ঘরের দরজার সামনে বসে আছে। কারণ সে জানে রঙ্গলালকে এখন কতটা দরকার 'দৈনিক প্রভাত'-এর।

'সওদাগর' (১৯৮১) উপন্যাসে লেখক নন-ব্যাঙ্কিং ফাইনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান কীভাবে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে সর্বস্বান্তের অতল খাতে নিয়ে যাচ্ছে— এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ দত্ত এক বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসেবে দেখা করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। সেখানেই উঠে আসে বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত মার খাওয়া, সরকারি ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস কমে যাওয়া, অনাদায়ী ঋণের বোঝায় সরকারি ব্যাঙ্কের

ক্রমশ ধুঁকতে থাকা ইত্যাদি। ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ হওয়ার পরেও সাধারণ মানুষ কেন ঝুঁকছে না, তার কারণ খুঁজতে রবি দত্ত রঙ্গলাল সেনের মতো মানুষকে রাস্তায় নামায়। রঙ্গলাল মিশতে থাকে বিভিন্ন ধরনের মানুষদের সঙ্গে। সেখানে সে দেখতে পায়, বাজার অতিরিক্ত তিনগুণ বেশি সুদ দেওয়া, শক্তিশালী ডেডিকেটেড এজেন্ট নেটওয়ার্ক, দ্রুত লোন দেওয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি। কিন্তু তারপরেও রবি দত্ত বুঝতে পারে না এত অতিরিক্ত সুদ কোম্পানি দেয় কীভাবে? কোন ধরনের ব্যবসা বা বিনিয়োগ আছে যাতে লাভ করে এত সুদ দেওয়া যায়? অনুসন্ধানে নেমে সে খোঁজ পায় 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' নামক একটি চিটফান্ড কোম্পানি থেকে বিতাড়িত কর্মী শচীনের। তার সঙ্গে আলাপচারিতায় রবি দত্ত জানতে পারে, রেট থেকে অতিরিক্ত তিনগুণ বেশি সুদ দেওয়া চিটফান্ডগুলো চলেছে সাধারণ মানুষের অন্তহীন লোভকে আশ্রয় করে। শচীন বলে, ''ধরুন— আপনি পাঁচ হাজার টাকা জমা রেখে পর পর দশ মাস সুদ পেলেন। তখন আপনিই সুদের স্বাদ পেয়ে ঘটি বাটি বেচে আরও টাকা এনে জমা দিলেন— আরও সুদ পাবেন বলে। লোভের তো শেষ নেই মানুষের। এই জিনিসটি ভবেনদা ভালো করেই জানেন। এইটেই লক্ষ্মীর ঝাঁপির ব্যবসার আসল কথা।''[৩৩] একজনের মুখে শুনে অন্যরাও এসে টাকা রাখবে। বারবার রাখবে। আসলে মানুষের জন্মসংখ্যা কোনও দিনই কমছে না। ফলে এই বিরাট ভারতবর্ষে নতুন মানুষ থাকছেই সর্বদা, যারা অন্তহীন লোভের বশবর্তী হয়ে ছুটে আসছে এই ধরনের কোম্পানিতে টাকা রাখতে। এরপর একদিন 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' কোম্পানির মালিক ভবেন বোসের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে রবি দত্ত। কিন্তু চতুর ভবেন বোস তা বুঝতে পেরে রবি দত্তকে আটক করে 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' অফিসের সেফ ভল্টে। কারণ নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য বা ব্যবসার রহস্য যাতে ফাঁস না হয়, তারজন্য মানুষ খুন করা হয়তো ভবেন বোসের কাছে সামান্য ব্যাপার। 'শেষ বিকেলের আলো' (১৯৯৯) উপন্যাসে একজন নারীর লড়াইয়ের কথা উঠে এসেছে। বেশি মাইনের চাকুরে সুশান্ত বছর তিনেকের বাবলু ও স্ত্রী রূপাকে রেখে ব্রেন টিউমারে মারা যায়। তখন কাছের মানুষ হিসেবে পাশে থাকে বড়দা নিমাইচাঁদ ও দেবর সনৎ। কিন্তু কারও ওপর বোঝা হতে না চেয়ে রূপা নিজেই অর্থ সংস্থানের কাজে উদ্যোগী হয়। ডাকঘরের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রি করার কাজ হাতে নেয় সে— এ যেন একেবারে এক নতুন জীবন শুরু করা। অন্যদিকে এই রূপাকে সন্তানসহ গ্রহণ করতে রাজি হয় তারই দেবর সনৎ। দাদার বর্তমানে বৌদির প্রতি গোপন টান জন্মেছিল যা দাদার অবর্তমানে বৌদির সামনে প্রকাশ করে সে। এই সম্পর্কে রূপার বড়দা নিমাই চাঁদেরও তেমন কোনও আপত্তি থাকে না। কারণ সনৎ ভালো চাকরি করে, যত্নশীল, কম বয়স এবং সে রূপাকে আগাগোড়া

ভালোভাবে চেনে। কিন্তু রূপা এখানে গুরুত্ব দেয় সবচেয়ে বেশি মাতৃত্বকেই। তাই সে সনৎকে বিয়ে করতে রাজি, যদি তাকে আর কোনও দিন মা হতে না হয়। একজন নারীর আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম ও মাতৃত্ব, এই উপন্যাসের মূল বিষয়।

'তারসানাই', 'কামিনীকাঞ্চন' উপন্যাসে যে কাহিনিসূত্র পেয়েছি 'বাম অলিন্দ' (১৯৯০) উপন্যাসের কাহিনিসূত্রে সেটাই লক্ষ্য করি। এসরাজ শিল্পী বা সাহিত্যিকদের বদলে এখানে দেখি স্থপতি শিল্পী রঘুনাথ সেনকে। তার অন্যতম একজন গুণগ্রাহীর নাম বছর বাইশের জয়শ্রী বোস যিনি বর্তমানে কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ পড়ছে। বছর পঞ্চান্নোর রঘুনাথ জয়শ্রীকে বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিয়ে বলে, ''তোমার চিঠিখানা পেয়ে আমার ঝিমুনি কেটে গেল। আমি ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। একটি মেয়ে আমার তৈরি নানান বাড়ির স্থাপত্য দেখে আমায় চিঠি লিখছে— এটাই আমার কাছে জেগে ওঠার পক্ষে একটা থ্রিল।''[৩৪] কিন্তু কলকাতা ধীরে ধীরে কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে। উপরের মুক্ত আকাশ, ধুলোহীন আলোটুকুতে ভাগ বসাচ্ছে সামান্য কয়েকজন ভাগ্যবান। আর সাধারণ মানুষ তলায় বসে অন্ধকারে ধুঁকছে। এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে জয়শ্রীর বাবা নিরঞ্জন বোস। এই দুইজন প্রিয় মানুষের তার্কিক আলোচনায় জয়শ্রী বাম অলিন্দ বরাবর রক্ত গলির ভেতর একটা চিনচিন ব্যথা অনুভব করে। কলকাতা শহরে একসঙ্গে থাকা যাচ্ছে না জন্য গোবিন্দপুর গ্রামে ছোট মাসির বাড়িতে ওঠে জয়শ্রী রঘুকে সঙ্গে নিয়ে। ছোট মাসির বাড়ির জায়গা ও অবস্থা দেখে সেখানেও রঘুনাথ তার স্থাপত্য বুদ্ধি দিয়ে হলিডে বাংলো তৈরি করে। কিন্তু ভবা ও বিজনের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই কাজে ছেদ পরে। শেষপর্যন্ত রঘুনাথ বুঝতে পারে, সে ছবির মত কমপ্লেক্স তৈরি করতে পারে। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীকে ছবির মত তৈরি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। রঘুনাথের এই উপলব্ধি উপন্যাস-পাঠ শেষ করার পরেও পাঠকের মনে অনুরণিত হতে থাকে। 'অদৃশ্য ভূমিকম্প' (১৯৯৪) উপন্যাসে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া এডভার্টাইজিংয়ের অফিসার বছর আটান্নোর সন্দীপ লাহিড়ীর গুণমুগ্ধ ভক্ত মেয়ের বয়সি রজনী দুই বছর একসঙ্গে কাটিয়ে এক তরুণ (প্রায় সমবয়সী) ছেলের সঙ্গে বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করতে চায়। রজনীর এই আকাঙ্ক্ষা গত দুই বছর ধরে সন্দীপের বুকের ভেতর যে বাড়িগুলো একটু একটু করে গড়ে উঠেছিল, যেমন—আত্মবিশ্বাস ভবন, ভালোবাসার কুটির, মমতা নিবাস, স্নেহ আলয়, রূপমুগ্ধ কুঞ্জ ইত্যাদি যেন অদৃশ্য ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। তারপরেও রজনীর ইচ্ছামত সন্দীপ নিজেরই বন্ধু বংশীর ছেলে অশোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে উদ্যোগী হয় । কিন্তু অশোকের বাবা-মা রজনীর সঙ্গে বিয়ে নিয়ে আগ্রহ দেখালেও রজনীর পক্ষ থেকে প্রথম দিকে তেমন সাড়া না

আসায় তারা ছেলের বিয়ে অন্য জায়গায় ঠিক করে ফেলে। ফলে এখন সন্দীপের কথায় পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়। ফলে সন্দীপকে ছদ্মবেশ ধারণ করে অনাথবন্ধু নাম নিয়ে অশোকের বিয়ে ভাঙার খেলায় নামতে হয় শুধু রজনীর জন্য। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সন্দীপ বিয়ে ভাঙতে সফল হয় না— ছদ্মবেশেও ধরা পড়ে যায় অশোকের কাছে। তখন রজনীর হয়ে কাকুতি-মিনতি শুরু করে সন্দীপ কিন্তু অশোক নিজের বিয়ের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে এবং তাদের বিয়ে ভাঙার চেষ্টা থেকে সরে যেতে বলে। সন্দীপ লাহিড়ী যেন পুনরায় অদৃশ্য ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়।

অভয়ডাঙার পুলিশ থানার দোর্দণ্ডপ্রতাপ ও.সি. যতীন মিত্র দারোগাকে কেন্দ্র করে লেখক লিখেছেন 'যতীন দারোগার বেদান্ত' (১৯৯৩) উপন্যাসটি। যদিও উপন্যাসের কাহিনিতে সাংবাদিক নেপালের যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে। বলা যেতে পারে নেপাল আঢ্যি এখানে মুখ্য চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে। যে নেপালকে যতীন দারোগা ছোট-খাটো খবর সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে— বিভিন্ন সার্কাস পার্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, সেই নেপালই অভয়ডাঙ্গা থানার গত এক বছরে তিরাশিটা অমিমাংসিত খুনের ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করেছে। এরফলে একদিকে পুলিশ অন্যদিকে সমাজবিরোধী উভয় পক্ষকেই খেপিয়ে তুলেছে নেপাল। অন্যদিকে যতীন দারোগা এলাকার কুখ্যাত মাস্তান ভানুর তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা মালতির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। মালতিও ভানুর দেওয়া অনিশ্চিত জীবন থেকে বেরোবার পথ খুঁজছিল— তাই যতীন দারোগার মত নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয় আর কোথায় হতে পারে একজন মস্তানের জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চাওয়া স্ত্রী-র কাছে। তবে উপন্যাসে নেপালের এক নির্ভীক প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক হবার যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা— সেটাই যেন লেখক তুলে ধরতে চেয়েছেন। নিজের জীবনের কোনও পরোয়া না করে, দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে রিপোর্ট তৈরি করে— যে বিষয়গুলো নিয়ে বেতনভুক স্থায়ী সাংবাদিকরাও খবর করতে ভয় পায়। কিন্তু কোনও খবরের কাগজ থেকে সেরকম কোনও সাড়া পায় না বরং তার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে সাংবাদিকতা ছেড়ে অন্য চাকরির খোঁজ করতে বলে বা ছোট পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করার পরামর্শ দেয়। ইচ্ছা না থাকায় কোনোটাতেই নেপাল কিছু করতে পারে না। অগত্যা তাকে লিখতে হয়— লেখা ছাপানোর জন্য চাতকের মত চেয়ে থাকতে হয়। তাতে যা আয় হয় সেটাতে সংসার চলে না। তাই স্ত্রী ইলাকে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে যেতে হয়। এভাবে চলতে চলতে তাদের বছর তিনেকের ছেলের হার্টে ফুটো ধরা পড়ে। সরকারি হাসপাতালে মির‍্যাকেলের আশায় পরীক্ষামূলক অপারেশনে সম্মতি জানায় নেপাল। কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন, ছেলের মৃত্যু হয়। নেপালের

এই টানাটানি সংসারে থাকার জন্য স্ত্রী ইলার যেটুকু টান অবশিষ্ট ছিল, সেটাও শেষ হয়ে গেলে অন্য একজন পুরুষের নিরাপদ নিশ্চিত আশ্রয়ে ঠাঁই নেয় ইলা। প্রচন্ড হতাশ হয়েই নেপাল আঢ্যি নিজেকেই বলে, ''তুমি ভাই সাংবাদিক নয়। একজন পুত্রহীন সার্কাস সাঙ্গাবাদিক। যাদের বলে কয়ে ছবি, রিপোর্ট ছাপতে হয়— ভাল রিপোর্ট এনেও শেষ অব্দি যা মেঝেতে গড়াগড়ি যায়— তার লেখককে সাংবাদিক বলে না। বলে সাঙ্গাবাদিক। বাংলা ডিক্সনারিতে এই নতুন শব্দটা যোগ হওয়া দরকার।''[৩৫] নেপাল কবিতা, গল্প লেখে কিন্তু কোথাও কোনোখানে সে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। স্ত্রী ইলা তাকে বলে যে, তার মত লোকের কাছ থেকে ডিভোর্স নেবারও দরকার পড়ে না। ইলা না থাকায় বাড়ি ফেরার আর কোনও টান অনুভব করে না নেপাল। তাই সারাদিন কলকাতায় ঘোরে এবং খাওয়া দাওয়া বিষয়ে সহজ সমাধান করে ফেলেছে সে, মল্লিক বাড়ির ট্রাস্টের খাতায় নাম তুলে, যারা একশো বছরের ওপর দু'বেলা নিরামিষ কাঙালি ভোজন করায় যেখানে আফ্রিকার একটা বনমানুষও তাদের সঙ্গে খায়। শেষে অবশ্য সার্কাসে বামন ক্লাউনদের নিয়ে লেখা পড়ে নিউজ এডিটর দিগিনবাবু নেপালকে খবরের কাগজে মোটা অঙ্কের টাকার কাজের অফার দেয়। কিন্তু নিঙরাতে নিঙরাতে নেপাল আঢ্যির সাংবাদিক হবার সব উৎসাহ, উদ্যম, ইচ্ছাশক্তি মৃত্যুপথযাত্রী। তাই উপন্যাসটিকে এক তরুণ সাংবাদিকের লড়াইয়ের কাহিনি বলা যায়।

নেপালের কাহিনির সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলেছে দারোগা যতীনবাবু— মাস্তান ভানু— মালতীর কাহিনি। যদিও এখানেও কিছুটা অংশ জুড়ে আছে নেপাল নিজেই। এই চারজন পুরুষের সঙ্গে ভালোলাগার সম্পর্কে জুড়ে রয়েছে মালতি যদিও বর্তমানে সে দারোগার করায়ত্ত। মালতীকে একেবারে নিজের করে পাবার প্রধান প্রতিবন্ধক মাস্তান ভানুকে ধরে ফেলে দারোগা। কিন্তু একেবারে নিকেশ না করে মেরে মেরে একটা মাংসের দলাতে পরিণত করে। এরপর অনেকবার আত্মহত্যা করতে চেয়েও ভানু আত্মহত্যা করতে পারে না। শেষপর্যন্ত থানার বারান্দারই একটা অংশ তার আশ্রয় হয়ে ওঠে। সেখানেই একদা ঘোর শত্রু ভানুর সঙ্গে যতীনের একটা সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একসময় মালতীর প্রতি নেপালের মুগ্ধতার সম্পর্ক ছিল। সেটার জন্যেও হয়তো অমীমাংসিত খুনের রিপোর্টের অজুহাতে নেপালকে হয়রানি করিয়েছিল যতীন দারোগা। কিন্তু দিনের পর দিন ভানুর দলাপাকানো চেহারাটা দেখতে দেখতে নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয় যতীন দারোগা। তাই হয়েতো মালতীকে রাখার ফ্ল্যাটে নেপালকে দেখেও যতীন রেগে ফেটে পড়ে না। বরং নেপালের হাত দু'খানা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করে। যে নারীর জন্য এতকিছু সেই যেন শেষে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়।

শান্তিনিকেতনকে পটভূমি করে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয় উপন্যাস হলো 'টানেলের ভেতরে ট্রেন' (১৯৮৬)। কয়েকটি পরিবারের টুকরো টুকরো কাহিনি জুড়ে দিয়ে কাহিনি নির্মাণ করা হয়েছে। অর্জুনকিশোর রায় ও বিমলা রায়ের একমাত্র সন্তান বাবলু ওরফে অরুণকুমার রায়। পন্ডিচেরি থেকে বোলপুরে এসে নিজের ছেলেকে শ্রীনিকেতনে ভর্তি করে দেয় এবং নিজেরা ঘর ভাড়া করে থাকে। সময়ের আগেই অবসর নিয়ে অর্জুনকিশোর টাকা ব্যাংকে রেখে সুদ নির্ভর মাসিক আয়ে সংসার চালান। মোহিত দত্ত কলেজে ইতিহাস পড়ায়— সেও অবসরের দোরগোড়ায়। তার স্ত্রী হেনা দত্ত কলেজে সংগীত শেখায়। ভুজঙ্গ চৌধুরীর বিভিন্ন ক্যান্টিনে খাবার সাপ্লাই দেবার ব্যবসা আছে। থাকেন কলকাতায় কিন্তু তার মেয়ে মাধুরী শান্তিনিকেতনে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। অর্জুনের অন্যতম চিন্তা যদি বেশিদিন বাঁচে তাহলে একদিন জমানো টাকা শেষ হয়ে যাবে— তাই যেন হিসেব করে সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা যান। অন্যদিকে ভুজঙ্গ চৌধুরী ব্যবসায় মার খেয়ে বিশাল ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে ট্রেনের বাথরুমে আত্মহত্যা করে। মাধুরী অসুস্থ হওয়ায় কলকাতায় ফিরে যায়। অরুণও বাবার মৃত্যুর পর মা'কে নিয়ে কলকাতায় চলে যায়। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে বিশ্বভারতীতে তখন রামকিঙ্কর বেইজ কাজ করেন। এছাড়াও আছে ইউ. জি. সি. প্রফেসার দ্বিজেন ঘোষ ও তার স্ত্রী শক্তি, দুই মেয়ে রিনি ও পুষি ওরফে পারিজাত ঘোষ ও দ্বিজেনের শ্বশুরমশাই। অবিনাশ ও তার পাগল স্ত্রী ও ছেলে সুদীপও কাহিনির মধ্যে জড়িয়ে আছে। অরুণের সঙ্গে পুষির ও সুদীপের সঙ্গে রিনির একটা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাধুরী উপায়ন্তর না দেখে রক্ষিতা হয়। অরুণ কলকাতা চলে গেলেও পুনরায় শান্তিনিকেতনে পুষির কাছে ফিরে আসে। এই রকম বিভিন্ন রকমের পরিবারের টুকরো টুকরো ছবি নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনি নির্মিত হয়েছে।

'ভোরবেলার ভালোবাসা' (১৯৯০) উপন্যাসেও লেখক আত্মজৈবনিক উপাদান ব্যবহার করেছেন। এখানে মানিকলাল মিত্রের মধ্যবয়সের বিভিন্ন সমস্যা এবং তা থেকে মুক্তি পেতে কারও কাছে আশ্রয়প্রার্থী হবার আকুল প্রচেষ্টা দেখা যায়। মাঝবয়সে এসে মানিকলালের ক্ষোভ হয়েছে, কেন আগের মত— কেন সেই যৌবনের মত সবকিছু হচ্ছে না। কারণ শিল্পীর কাছে বয়স তো নেহাত সংখ্যা মাত্র। কিন্তু চারপাশের মানুষজন এমনকি পরিবার-প্রিয়জন আঙ্গুল তুলে তার বয়স হয়ে যাওয়াটা দেখাচ্ছে। মানিকলালের কষ্ট হলো, এই বিষয়টা কিছুতেই স্বীকার করতে সে পারছে না। তাই এমন কারও কাছে আশ্রয় পেতে চায় যে তাকে নতুন করে জাগাবে, নতুন উদ্যম আসবে উপন্যাস লিখতে— নতুন কিছু বানাতে। 'দৈনিক সুপ্রভাত' খবরের কাগজে কাজ করা মানিকলালের অন্বেষণ চলতেই

থাকে— এরমধ্যে তার পরিচয় হয় তারই লেখার এক গুণমুগ্ধ পাঠিকা বছর চব্বিশের জয়শ্রী পালিতের সঙ্গে। ত্রিশ বছরের দাম্পত্যে প্রায় বিশ বছর স্ত্রী বেলার সঙ্গে রুমমেটের মত কাটিয়ে লেখক মানিকলাল মিঠু ওরফে জয়শ্রীর মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত আশ্রয় খুঁজে পায়। কিন্তু সে অনুভব করে জয়শ্রীর সামনে একটা দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। তাই জয়শ্রীর পুরানো প্রেমিক সুব্রত মজুমদারকে অনুরোধ করে জয়শ্রীর সঙ্গে সম্পর্ক না ভাঙতে। নিজেদের মধ্যে ঘটা সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান করে যেন সুব্রত জয়শ্রীকে আবার আপন করে নেয়। মানিকলালের অনুভবে জয়শ্রীর প্রতি প্রেম অপেক্ষা যেন জয়শ্রীর প্রতি কর্তব্য বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু সুব্রত মানিকলালের অনুরোধে রাজি হয় না। প্রেম ও কর্তব্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন লেখক এই উপন্যাসে।

হাইকোর্টের বিচারক শরদিন্দু 'দূরবীনের উল্টোদিকে' (১৯৮২) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। মানুষের চরিত্রের মধ্যেই কত বৈপরীত্য রয়েছে তা শরদিন্দুকে না দেখলে বোঝা যায় না। যে বিচারক ধর্ষণের দায়ে দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ দেয়, সেই বিচারকই বাড়ি ফিরে যুবতী পরিচারিকা রানীকে দেখে নিজের কাম-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে ধর্ষণ করে। অবশ্য পদ- ক্ষমতা প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ হারানোটা ত্বরান্বিত করেছে। যদিও শেষপর্যন্ত লোকেরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শরদিন্দুকে জরিমানা দিতে বাধ্য করেছে। 'এখানে বিরাজি শুয়ে আছে' (১৯৯৪) উপন্যাসে বারাঙ্গনা বিরাজির জমি কিনে উকিল মোহিত বাগচি বাড়ি করে। একদিকে উকিলের পসার, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যদিকে বিরাজির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাজির ব্যবসাতে মন্দা আসে। উকিলের নামেই সেই জায়গার নাম হয় মোহিতনগর। মোহিত বাগচির বাড়ির পাশে একজন বিগতযৌবনা বারাঙ্গনার বাড়ি থাকবে— এটা যেন সেই জায়গার ক্ষেত্রে খুব অসম্মানজনক। কিন্তু বিরাজিও উঠে যেতে রাজি হয় না। এই বিবাদমান অবস্থায় একদিন বিরাজি নিজের পেটের ভাত জোগাড় করার জন্য একজোড়া অনন্ত (অলংকার বিশেষ) বিক্রি করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেকদিন পরে মোহিতের মৃত্যুর পর মোহিতের নাতি সৌরভের সামনে বাড়িটির প্রাচীন প্রাচীর ভেঙে পড়ে। সে দেখে ভেতরে দুমড়ানো-মোচড়ানো একটা কঙ্কাল—যার হাতে ধরা আছে একজোড়া অনন্ত। 'বেঁচে থাকার স্বাদ' (১৯৯৮) উপন্যাসে একজন কৃষকের কাছে ও তার পরিবারের কাছে জমির টান কতটা বড়, তাই দেখানো হয়েছে। গ্রাম বা শহর, শোষক শ্রেণির যে সর্বত্র উপস্থিতি—এই বিষয়টিও উপন্যাসে উঠে এসেছে। মহাজনের শোষণে চাষি বীরেন তার স্ত্রী তরলা ও দুই মেয়ে আঙ্গুরবালা ও শিশুবালাসহ দক্ষিণ সাহসপুর গ্রাম থেকে উঠে আসে ঝাল্লার মাঠের ঝুপড়িতে। সকলের

কাজ বদলে গেলো কিন্তু জমির টান, গ্রামের বাড়ির টান বদলানো না। গ্রামের মহাজনের ঋণ শোধ করার জন্য তরলা তার মনিবের কাছে চড়া সুদে ঋণ করে। ফলে এখানেও তারা শোষিত হয়। অসহায় মানুষকে শোষণ করার জন্য যেন এভাবেই নানা জায়গায় ফাঁদ পাতা থাকে।

'মাছের পেটে আংটি' (১৯৮৬) উপন্যাসে পুরানো প্রেমিক অশেষ, পুরানো প্রেমিকা দীপা ও তার মেয়ে সংঘমিত্রাকে কেন্দ্র করে ভালোবাসার এক অন্য রূপ তুলে ধরেছেন লেখক। অশেষ ও দীপা নিজেদের প্রণয়কে চাপা দিয়ে নিজেদের সংসারে যথাক্রমে স্বামী ও স্ত্রী হিসাবে মানিয়ে নেয়। কিন্তু দীপার কুমারী মেয়ে সংঘমিত্রা মায়ের পুরানো চিঠিপত্র ঘেঁটে মায়ের পুরানো প্রেমের কথা জানতে পারে। তারপর মা-মেয়ে ও অশেষকে কেন্দ্র করে ভালোবাসার এক নতুন আখ্যান বুনে চলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। 'বেঁচে থাকার স্বাদ' উপন্যাসের মত 'অতি বড় ঘরণি' (১৯৮৬) উপন্যাসেও শোষণের সেই রূপ ফুটে উঠেছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে বাধ্য হওয়া মানুষের কাহিনি এর বিষয় হয়ে উঠেছে। 'বাম অলিন্দ' উপন্যাসে যে প্রকৃতি-সচেতন নিরঞ্জন বোসকে পাই, সেই চরিত্রই রূপান্তরিত হয়ে যেন প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত চরিত্র পাই 'ভগবান বুনো রায়ের বংশধর' (১৯৮৯) উপন্যাসে মহেশ্বর প্রসাদ রায়কে। যিনি বড় হয়ে উঠতে উঠতে প্রকৃতির কাছ থেকে প্রকৃতির শিক্ষালাভে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। মহেশ্বর বিভিন্ন জায়গার খ্যাতনামা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা মহেশ্বর প্রসাদের কাছে পরামর্শ নিতে আসে। বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি করে নানা রকমের হাইব্রিড ফল বা ফুল। বছর আশির মহেশ্বর যেন মানুষরূপী প্রকৃতি হয়ে উঠেছেন। তাই তার আরেক নাম বুনো রায়। প্রকৃতি যেমন চির নতুন ঠিক তেমনি বুনো রায়ও যেন চির নতুন। তিনি সাইকেল নিয়ে দূর-দূরান্তে পাড়ি দেয় নতুন কোন বীজ বা ফলের সন্ধানে। নিজের হাতে তৈরি করা বাগানটির বিক্রি হওয়া আটকাতে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হন। প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষা করার জন্যই যেন মহেশ্বর প্রসাদ রায়ের এই পৃথিবীতে আগমন হয়েছে। এই চরিত্রের একেবারে বিপরীত মেরুর চরিত্রের দেখা পাই 'হননের আয়োজন' (১৯৯৪) উপন্যাসে। শ্বশুর নেপালচন্দ্র সাধু খাঁ তার পুত্রবধূর জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি করে হননের আয়োজন ক্রিয়া। প্রথমে পুত্রবধূকে পাগল সাজানোর চেষ্টা। কারণ এই অবস্থায় তাকে খুন করলে মানুষ ও আইন যাতে ভাবে এক পাগলের মৃত্যু হয়েছে পাগলামির জন্য। অবশেষে নেপালচন্দ্র তার পরিকল্পনায় সফল হয়। কলকাতা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে হননের আয়োজন। 'সে' (২০০১) উপন্যাসে লেখক সত্তর বছরের বৃদ্ধের স্মৃতিচারণ তুলে ধরেছেন। দেশভাগের আগের জীবন ও পরবর্তী জীবনের ছবি এই উপন্যাসে পাই। জীবনে এতটা বছর পার

করে আসার পর যখন জীবনরস টানার শক্তি বা ইচ্ছা কোনোটাই থাকে না তখন তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে মায়ের কাছে শোনা বড় পিসেমশাইয়ের বাহাদুরির নানান কর্মকাণ্ড। জীবনরসের রসিক মোহিনী দাদার কাহিনি। এই সব স্মৃতি তাকে সত্তর বছর বয়সেও 'তলানিশুদ্ধ জীবনরস' টেনে নিতে সাহায্য করে। সে সর্বদা অনুভব করে তাকে যে কোনও বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য তার পাশে কম্বল ঢাকা দিয়ে আছে তার মহাশক্তিমান বড় পিসেমশাই। তাই বিপদের তোয়াক্কা না করে নানান রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে এগিয়ে যায় সে।

'কন্দর্প দর্পণ' (১৯৯৪) উপন্যাসটি তুষার, মহুয়া ও তপতীর সম্পর্কের কাহিনি। সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ার ও নিজেদের ভেঙ্গে যাওয়ার কাহিনি। সারাজীবনই তুষার এক সুন্দর মুখ খুঁজেছে, পেয়েওছে কিন্তু তবু সুন্দর মুখের আকাঙ্ক্ষা তার মেটেনি। মহুয়াকে ভুলে তপতীকে আপন করার জন্য ধর্মান্তরিত হওয়া, আবার মহুয়ার স্মতি ভুলতে না পারা, সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে চাওয়ার অভিলাষ পূরণ হয়নি তুষারের। বাঁধ সেধেছে তুষারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নারীরা— স্ত্রী, প্রেমিকা, কন্যা (শিখা)। দু-দিক সামলাতে গিয়ে টালমাটাল হয়েছে তুষারের নিজের অস্তিত্ব। বোঝাতে পারেনি তপতীকে ও শিখাকে। শেষে যখন ছোট দুটি-হাতকে (তুষার আর তপতীর ছোট মেয়ে সোমা) তুষার আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে, অস্বীকার করেছে সোমাও। আসলে জীবনের উপান্তে এসে সে বুঝেছে সে বড় একা। কোথায় ফিরে যাবে সে? সব পথ, সব দরজা আজ রুদ্ধ।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'শিকড়' (১৯৯৭) উপন্যাসটিতে দুই ভাই রতন আর তপন গুহরায়ের কাহিনি দেখাতে গিয়ে এসেছে নানা প্রসঙ্গ। 'যোগফল' কাগজের সম্পাদক রতন, জগৎ পালিতের সাক্ষাৎকার নিতে এসে শোনায় নিজের জীবনের গল্প। দুই ভাই দু-মিনিটের ছোট-বড় হওয়ার পরও এক বিরাট ফারাক রয়ে গেছে দুজনের মধ্যে— এই নিয়েই কাহিনিটির বিষয়বস্তু এগিয়েছে। যেখানে রতন তার কাগজের ব্যাপারে মনোযোগী অন্যদিকে তপন খুঁজে চলেছে তার শিকড়। তপনের গ্রহরত্নের কমিশন এজেন্ট হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়, সে নিজেই ভাগ্য বিচার করার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পেরেছে। ফলে সে নিজের বিচার করে মানুষকে সঠিক পাথর দিতে পারবে। ফলে তপন গ্রহ-রত্নের জগতে আরও তলিয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যেই তপনের কনখল যাওয়া। বাশরির সবকিছু ছেঁড়ে বেনারসে পূর্ণার্থীদের চিকিৎসা করা, জগৎ পালিতকে নতুন করে অনুভব করায় যে সবাই নিজের জায়গায় ভালো আছে। ঊর্মিলার সামনে দুজনের বাস্তব অবস্থা শেষে এসে ধরা পরে যাওয়ায় এক আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে যায় প্রত্যেকের বাস্তবতা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শাহজাদা দারাশুকো' (১৯৯৭) উপন্যাসের ভূমিকা বলতে পারি 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাসটিকে। কাহিনির শেষে এসে সমরেন্দ্রনাথ বসুর (সমর) নিজেকে মনে হয়েছে দারা আর ইরা হয়েছে রানাদিল। শুভ্রর ভালোবাসাকে প্রত্যাখান করে ইরা কাছে এসেছে সমরের। ঝকঝকে এই তরুণীর কাছে এসে সমরের হীনমন্যতাবোধ জেগে উঠেছে। নিজের অযোগ্যতা, অক্ষমতা যেন আরও বেশি উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু তবুও শিল্পকে কে না ভালোবাসে! যদিও তার মনে হয় সে শুধু এই শিল্পের একটি জিনিস মাত্র। সমরের মতে নারীরা অবলীলায় আগুন হ্যাণ্ডেল করতে পারে আর ইরাও এই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে শেষে বুঝতে পারে আগুনে শুধু পুড়ে যেতে হয়। তাইতো সব ভালোবাসা আজ ভোগ বলে মনে হয় তার। সমর সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে চাইলেও শিপ্রা আর ইরা কেনই বা রাজি হবে ভাগে? এই বিষয়টি অনেক উপন্যাসেই দেখা গেছে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের। নতুন করে লিখতে গিয়ে সমরের লেখায় ফিরে আসে দুই নারীর শুকনো কথা। পড়া পড়া দিয়ে খেলা শুরু হয়েছিল— পরবর্তীকালে ক্রমাগত বেড়ে চলা বিবাদ, মতান্তরে খেলার সব আনন্দ শুষে নেয়। ফলে সমর-ইরার সম্পর্ক উদ্‌গীরণ করতে থাকে বিষ। দারার (সমরের) নিজেকে রানাদিলের (ইরার) সম্পত্তির তহশীলদার বলে মনে হয়। শেষপর্যন্ত সব আনন্দখেলা তীব্র যন্ত্রণায় পর্যবসিত হয়েছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মাতৃচরিতমানস' (২০০৪) উপন্যাসটি একটি সুখী পরিবার জীবনের কাহিনি হয়ে উঠত যদি তাদের মধ্যে অসিতে আগমন না ঘটত। কাহিনির নারীদের অসিতের কাছে আসা এবং যৌবনকে দ্বিতীয়বার অনুভব করা এর মূলে। সত্যপ্রসন্ন তালুকদার এবং তার স্ত্রী আভারাণীর ভরা সংসার পুত্র অরুণ, বরুণ ও তাদের স্ত্রী সরমা, রুবি আর নাতি কৌশিককে নিয়ে। এসরাজ শিল্পী আভা এবং তারই ছাত্র অসিতের সম্পর্ক বদলে দেয় রুবি আর সরমার ভাবনাধারাকে। আমরা প্রত্যেকে ভালোবাসা প্রত্যাশা করি এবং প্রতিটি নারীরই সেই অধিকার থাকা উচিৎ বলে মনে হয় তাদের। এই কারণে রুবির হিংসে হয় মাঝে মাঝে; অসিতের সামনে বরুণের লাউ-এর মতো পেট, যেটার ওজনে রুবি হাঁসফাঁস করে। রুবি বরুণের ভালোবাসায় কোনও গন্ধ পায় না। কারণ রুবির মতে, দুটি মানুষের মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হলেই পরস্পর পরস্পরের গন্ধ পায়। অথচ সে দেখেছে আটচল্লিশের আভার রূপ, এই বয়সেও আভার শরীরে সুঠাম খাঁজ। মৃত্যুর পরেও আভা যেন জিতে গেছে নারী হিসেবে, প্রকৃত ভালোবাসা পাওয়া মানুষ হিসাবে। সবার চোখে সারাজীবন থেকেছেন অ্যাট্রাক্টিভ। তাই অসিতও বারবার এসেছে আভার কাছে। উপন্যাসের শেষে সরমা যাকে এতদিন

কঠিন বলে মনে হয়েছে সেও ভেঙে পড়েছে অসিতের কাছে। এতদিনের একরোখা খটখটে সম্পর্ক ভালোবাসা পাওয়ার দাবিতে কম্পমান। সরমা ডানা মেলেছে নতুন আস্বাদে; আত্মসমর্পণ করেছে রুবিও।

জীবনকে ভেঙে চুড়ে দেখার কাহিনি 'সিদ্ধকামিনী' (১৯৮৪) উপন্যাসটি। যৌথ পরিবারের সদস্য পার্থ (পার্থসারথি দত্তগুপ্ত) পরিবার আর জীবনকে দেখেছে নানারূপে। যেখানে কনস্টেবল পুত্র হিসাবে গর্বিত ছেলে দেখেছে প্রমোশান পাওয়া ঘুষখোর বাবাকে। মাসি সম্পর্কের নারীর সঙ্গে জড়িয়ে পরেছে সে নিজে এবং জড়াতে দেখেছে নিজের বাবাকেও। নিজেদেরকে (বাবা ও নিজে) তার মনে হয়েছে দুটি কুকুর, মধ্যে ফারাক ছিল শুধু কয়েকটি তক্তার। পড়াশুনায় প্রথম সারির পার্থ নিজেকে দেখেছে খোকন হতে আবার খোকন কীভাবে হয়ে উঠেছে পার্থ। শুধু সময় বদলে দিয়েছে জীবনখাতকে। তীব্র অস্তিত্ব সংকটে পার্থ বিশ্বাস করেছে অলৌকিকতাকে। উপন্যাসে দেখা মিলেছে আগমবাগীশ তন্ত্রসাধক ঝাঁপা দিশী নিয়ে কারণ সঙ্গ করেছে আর মাসীও সেই বিশ্বাসে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে পার্থকে। পার্থর মনে হয়েছে, ''পৃথিবীতে মেয়েলোক, বিষয়-সম্পত্তি সবই তো সঙ্গ, অর্জন, অধিকারের নামে এক ধরনের খোয়াড় প্রথা।''[৩৬] কিন্তু জীবনের খেলায় সে নিজেই বলি হয়েছে এই খোয়াড় প্রথায়। তাই শেষে যখন বুঝেছে তখন আত্মসমর্পণ করেছে জীবনের কাছে, স্বীকার করেছে সমস্ত লজ্জা নিজের প্রতি নিজের মনে। পার্থ বিয়ে করতে রাজী হয়েছে মাধবীকে। 'এক গেরস্থর তিন সংশয়' (১৯৮০) উপন্যাসটি বীরেন আর রাধার কাহিনি। কলকাতার আন্ডারগ্রাউন্ডে কিলবিল করা অসংখ্য পোকাদের নিয়ে চিন্তিত বীরেনের ভাবনার কাহিনি এই উপন্যাসে। বীরেন এ ব্যাপারে সর্বদা চিন্তিত হলেও রাধা ছিল অন্যরকম, বাড়িতে থেকেও কখনও সে পোকাগুলোকে মারেনি। কিন্তু বীরেনের সর্বদা মনে হয়েছে, পোকাগুলো ক্রমশ যেন মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠে আসছে। তীব্র সংশয় বীরেনকে বারবার চিন্তিত করেছে। তার জীবনে আর এক বড় সংশয় ভালোবাসা, যার সংজ্ঞাটা দুজনের (বীরেন ও তার স্ত্রী) কাছে ভিন্ন ভিন্ন। সে কোনও দিনই তার ভালোবাসা রাধাকে বোঝাতে পারেনি। বীরেনের মনে হয়েছে সামান্য আরশোলা আর চারটি ছুঁচোকে যে এখনও বিষ দিয়ে সাবাড় করতে পারে না এবং শেষে নিজেকেই যে সাবাড় হতে হবে, একথা রাধা বুঝবে কী করে! যে রাধা ''তার শরীরের কোষগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ে সন্তুষ্ট না হইলে তার প্রতি আমার যতই ভালবাসা থাকুক না কেন— সব মিথ্যা হইয়া যায়।''[৩৭] সেই রাধাকে বীরেন ভালোবাসার কথা বোঝাবে কী করে! আর এরকম পরিস্থিতিতে তীব্র অস্তিত্ব সংকট, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের খোঁজ— সব মিলিয়ে বেঁচে থাকাটাই

যেন আরও বেশি সংশয়ের। তাই বীরেন হয়ত আর ফেরেনি বা ফিরতেও চায়নি। আসলে যে পোকাটা তার মাথার ভিতরে সর্বদা কিলবিল করছিল তাকে সে মারবে কোন বিষ দিয়ে? শুধু রাধা বা কর্ণেল নয়, আসলে আমরা প্রত্যেকেই 'গুপ্ত পাগল।'

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'আমার লেখা', রচনা সমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ১২-১৩

২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, আষাঢ় ১৪১৮, পৃ. ৩৫৩।

৩. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'অনিলের পুতুল', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ২৭৭।

৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'গঙ্গা একটি নদীর নাম', বুক ফ্রন্ট, পাবলিকেশন ফোরাম, কলকাতা-৯১, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ১৪০৭, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ১২।

৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'নির্বান্ধব', রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, আষাঢ় ১৪১৮, পৃ. ৬৪।

৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'পরস্ত্রী', রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, আষাঢ় ১৪১৮, পৃ. ১৫০।

৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'সরমা ও নীলকান্ত', রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল২০১২, পৃ. ৪৬।

৮. তদেব, পৃ. ৬১-৬২

৯. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'সতী অসতী', রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১২,পৃ. ১২৫।

১০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'তিন সম্পাদক', 'অদ্য শেষ রজনী' উপন্যাসের ভূমিকা অংশ, রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১২।

১১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', রচনাসমগ্র-৪, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৩, আষাঢ় ১৪১৮, পৃ. ১৯-২০।

১২. তদেব, পৃ. ৮৫

১৩. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘পরীর সঙ্গে প্রেম’, উপন্যাসের ভূমিকা অংশ, রচনাসমগ্র-৪, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,

১৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘পরবর্তী আকর্ষণ’, রচনাসমগ্র-৪, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৩৬৬।

১৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘চন্দনেশ্বর জংশন’, রচনাসমগ্র-৫, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৭৭।

১৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘স্বর্গের পাশের বাড়ি’, রচনাসমগ্র-৫, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩২৭।

১৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘মহাজীবন’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ১৬

১৮. তদেব, পৃ. ১০৪।

১৯. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘একদা ঘাতক’, উপন্যাসের ভূমিকা অংশ, দশটি উপন্যাস, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮

২০. তদেব।

২১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘কহেল গাঁও’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১১৫

২২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘অলীক বাবু’, দশটি উপন্যাস, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩৬৪।

২৩. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘হাওয়াগাড়ি’ (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ. ১০০।

২৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘হে মহান দিশারী’, ‘শাহজাদা দারাশুকো’ (প্রথম খণ্ড), উপন্যাসের ভূমিকাংশ, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯১

২৫. তদেব।

২৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘শাহজাদা দারাশুকো’ (প্রথম খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি

স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৪৩

২৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'মহাবিশ্বের মহা কলরোল', 'শাহজাদা দারাশুকো' (দ্বিতীয় খণ্ড), উপন্যাসের ভূমিকাংশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৯১।

২৮. তদেব।

২৯. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'কামিনীকাঞ্চন', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৭৮

৩০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'ভালোবাসিব না আর', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৫৫।

৩১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'নয়ন', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১১৯

৩২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'তৃতীয় মেরু', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৬৪।

৩৩. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'সওদাগর', 'দশ দিগন্ত', মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ৬ই আগস্ট ১৯৮৬, পৃ. ৮৩৫।

৩৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'বাম অলিন্দ', 'দশটি উপন্যাস', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪৮২।

৩৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'যতীন দারোগার বেদান্ত', করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ৭২।

৩৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'সিদ্ধকামিনী', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, কলকাতা পুস্তকমেলা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ৭৫।

৩৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'এক গেরস্থের তিন সংশয়', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ কলিকতা পুস্তকমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ২১৮, ১৫৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি

আমরা লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি তুলে ধরে, তা উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র কিংবা বিভিন্ন ঘটনা বা প্রসঙ্গ অবলম্বনে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব। যথা-

ক) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।

খ) উপন্যাসের গৌণ চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।

ক) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি:

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনকে যতটুকু দেখেছেন, জেনেছেন; সেটুকু খুব নিবিড়ভাবে দেখা ও জানা। আর সেই অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে গড়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসগুলোর জগত। আর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো যেন লেখকেরই বিভিন্ন সত্তার বিভিন্ন রঙে রাঙানো। তাই এত সজীব ও সরস। এই চরিত্রগুলো ঘিরেই প্রকাশিত হয়েছে লেখকের জীবন-ভাবনা বা জীবনদৃষ্টি। জীবনদৃষ্টি বলতে এখানে আমরা বুঝিয়েছি, জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব ও উপলব্ধি। লেখক বলেছেন, ''আমার মনে হয় শিল্পের বিষয় হল: সংশয় । আর ভক্তের বিষয় হল: সমর্পণ-নিবেদন। এই দুটি দু'রকমের জিনিসের ভেতর সংশয় নিয়েই সারা পৃথিবীর শিল্পের ইতিহাস। আমাদের আগে— আমাদের সময় এবং আমাদের পরেকার যাঁরাই লিখতে এসেছেন তাঁদের ভেতর শতকরা ৯৯ জন এই সংশয়ে দুলতে দুলতেই লিখে চলেছেন। শিল্প কোন মীমাংসা নয়। শিল্প একটি দোলাচল তর্কের ভেতর ছিন্ন-দীর্ণ হতে হতে যা পাওয়া যায় তাই।''[১]

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই সংশয়ী মন নিয়েই জীবনকে ভালোবেসেছেন। মানুষকে দেখেছেন। জগৎকে বুঝেছেন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যত খনন করেছেন, এক পৃথিবী-বিস্ময়ে তাঁর হৃদয় ভরে গিয়েছে। তখন তিনি আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে আরও খনন করেছেন। যা পেয়েছেন, সেই প্রাপ্ত সম্পদে তিনি ক্রমাগত ধনী হয়েছেন। এই জীবন ও জগৎ যেন লেখককে চেয়েছিল, তাই মানুষ ও প্রকৃতি যেন বৈচিত্র্য-সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছিল তাঁর কাছে। আর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আপাদমস্তক দিয়ে চেটেপুটে তার স্বাদ গ্রহণ করেছেন। এভাবেই লেখকের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন, ''দেখার দৃষ্টি থেকে আপনা-আপনি জমা

হতে হতে যদি লেখকের কোন দার্শনিক ভাবনার পত্তন না হয়— ... তবে তাঁর লেখা যতই নিপুণ হোক— যতই অভিনব হোক— তা আপনাআপনি নড়বড়ে হয়ে যাবেই— তলিয়ে যাবেই।

এই দার্শনিক ভাবনা তখনই একজন লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে জেগে ওঠে— যখন তিনি মানুষ হিসেবে বারংবার নিজের বিশ্বাসের জায়গা হাতড়ে চলেন— নিজেকে ভাঙেন— খুঁজে বেড়ান— নিজেকে নিশ্চিহ্ন করার ঝুঁকি নিয়ে— নিজেকে দৈবী অতৃপ্তির— অস্থিরতার শিকার হতে দিয়ে— ঘাম ঝরিয়ে কোনও ভাবনার অধিকারী হন।"[২] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের ইতিহাস বলে, এই কাজগুলো তিনি হৈ হৈ করে করেছেন। আমরা এই অধ্যায়ের এই অংশে নির্বাচিত উপন্যাসের নির্বাচিত প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে কীভাবে কী জীবনদৃষ্টি ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করব।

ছদ্মবেশে ক্রমাগত ধুঁকছিল 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রমথ দত্ত। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় গতিময়তার যুগে আমরা নিজেদের চেতনে বা অবচেতনে নিজেরাই ধুলো দিয়ে চিত্র বিচিত্র ছদ্মবেশ তৈরি করে ফেলি। তারপর শুধু সেই ছদ্মবেশ ধারণ করে জীবনের রাস্তায় চলে ফিরে বেড়ানো। এক ধরনের মিথ্যে মজা তখন সঙ্গী হয়। পেছনে ফিরে নিজেকে নিয়ে ভাবার অবকাশ মেলে না। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা প্রমথ দত্তের বা এই রকম মুষ্টিমেয় মানুষের। ছদ্মবেশের সুতোগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত অক্ষত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সেই ছদ্মবেশের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

প্রমথ দত্ত একটি নিম্নমধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারে বড় হয়ে উঠেছে। সাধারণ বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত যৌথ পরিবার প্রদত্ত সংস্কার, মূল্যবোধ, বিশ্বাস তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যতই সে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে, পিছলে পিছলে গিয়েছে এই বিশ্বাসগুলো। ফলে আমাদের 'শায়ক মনোবৃত্তি' ছদ্মবেশ তৈরি করে। কারণ এই বিশ্বাসগুলোতে তিক্ত শর নিক্ষেপ করেই আমরা সাময়িক শান্তি পেতে চাই। যেভাবে প্রমথ দত্ত সাময়িক শান্তি পাচ্ছিল। তার বর্তমান জীবনশৈলী তাকে ছদ্মবেশের পোষাক তৈরি করে দেয়। কিন্তু এই পোষাকের যে মজা সে অনুভব করছিল, ধীরে ধীরে তার ভিতরে থাকা মিথ্যা বড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দেয় তার সামনে। ফলে, পরিবারের প্রত্যাশা কাঁধে নিয়ে, অনেক নারীসঙ্গ লাভ করে কর্মহীন প্রমথ ধুঁকতে থাকে। সে চেষ্টা করে নিজেকে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। সে চেষ্টা করে পরিবারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে। সে চেষ্টা করে সত্যিকারের ভালোবাসায় পড়তে। সে চেষ্টা করে নিজের বিবেকের কাছে সৎ হতে।

কিন্তু তার কোনও চেষ্টাই সেভাবে ফলপ্রসু হয় না। কারণ আমাদের মনে হয়, প্রমথর ইচ্ছাশক্তির

অনেকটা অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। কারণ প্রমথ দত্ত ততদিনে সহজলভ্য শান্তি, সুখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই সহজলভ্যতা ও সাময়িকতা মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে শুষে নিতে পারে। ব্যক্তি মানুষের এই সংকট মানুষকে আরও সংশয়ী করে তোলে। এই সংশয়ী মন নিয়ে তখন সে যেখানেই যায় অভ্যস্ত হওয়া মজার স্বাদ পান্‌সে লাগে। যেমন লাগছিল প্রমথ দত্তের। এই স্বাদ পান্‌সে হওয়া অনিবার্য ছিল। কারণ ভিত্তিমূলেই রয়েছে কৃত্রিমতা, মিথ্যা। আবার যেখানে শুধু জৈবিক চাহিদা মেটানো একমাত্র উদ্দেশ্য, তার মজার স্বাদও পান্‌সে হতে বাধ্য। তাই বর্তমানে সুধার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্কে (ভালোবাসার নয়) উন্মাদনা আর তেমন নেই। কিন্তু দীর্ঘদিনের মেলামেশার অভ্যেস এবং মিথ্যা মজা পাওয়ায় (সহজলভ্য) অভ্যস্ত হওয়া প্রমথের আলস্য তাকে পুরোপুরি সত্যের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে সাহস দেয় না বা পায় না। এজন্য প্রমথ নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয়, ‘‘... সে সুধাকে ভালবাসে। মুশকিল হয় সুধার দিকে তাকালে । বমি আসে। প্রমথ তখন মনে মনে বারেবারে আওড়ায়, সুধাকে ভালবাসি। আমি সুধার লাভার। সুধা একা।’’[৩] ভালোবাসার অন্বেষণে থাকা প্রমথর দৃষ্টি পড়ে অঞ্জুর (সুধার ছোট বোন) দিকে। কিন্তু সেখানেও সে ব্যর্থ হয়। কারণ ভালোবাসতে না পারাটাই এখন প্রমথর কাছে অভ্যেস হয়ে গেছে। জৈবিক চাহিদার কাছে মাথা নত করা অভ্যেস হয়ে গেছে। প্রমথর সহজ স্বীকারোক্তি, ‘‘প্রমথ অঞ্জুকে ভালোবাসে না। এমন কী অঞ্জুকে তার ভালও লাগে না। ... তবু কিছু রহস্য আছে অঞ্জুর। এমন আন্তরিকভাবে ঠোঁট টিপে চোখ মটকায় যে ভীষণ লেপ্‌টে থাকতে ইচ্ছে করে।’’[৪]

অন্যদিকে বাঙালি ঘরের তথাকথিত আইবুড়ো মেয়ে সুধার প্রমথকে আটকে রাখার ঐকান্তিকতায় প্রমথ কষ্ট পায়, হাঁসফাঁস করে। তাই যতটা সম্ভব সে সুধাকে ভালো না বাসাটা ঢেকে রাখতে চায়। ঢেকে রাখতে গিয়েই তাকে চুপ করে থাকতে হয়। কারণ কথা বললে নিজের অজান্তেই যদি নিজের প্রকৃত মনোভাবটা সুধার সামনে ফুটে ওঠে। তাছাড়া বেকার প্রমথের অনেক খুচরো প্রয়োজনে অর্থের জোগান দেয় চাকুরিজীবি সুধা। ফলে ক্রমশ প্রমথর সঙ্গে সুধার এক কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রমথর দিক থেকে এই কৃতজ্ঞতা অর্থের আর সুধার দিক থেকে ভালো বর পাওয়ার প্রত্যাশায়।

এই পরিস্থিতি প্রমথর অস্তিত্বের সংকটকে আরও গভীর করে তোলে। সুধা তার জীবনে প্রথম নারী নয়। নারী অনেক ভাবেই প্রমথর কাছে ধরা দিয়েছে। ফলে এখন যেন সে ছদ্মবেশে ধুঁকতে শুরু করেছে। নিজের তৈরি বানানো ধারণাগুলো যখন নিজেকেই বিদ্রুপ করতে থাকে, সমস্ত প্রচেষ্টার

যোগফল হিসাবে শূন্য একটি প্রশ্নের আকারে নিজের সামনেই ঝুলতে থাকে; তখন প্রতি পদে পদে নিজের মধ্যে অন্য একজনের কাছে হারতে হারতে প্রমথ যেন অপেক্ষায় থাকে নতুন সতেজ, সবুজ শস্যভূমি আবিষ্কারের। কারণ সমাজের প্রাণহীনতা, স্থবিরতা তাকে শুষ্কতায় তলিয়ে নিয়ে যায়। ব্যক্তিসত্তার সংকটের দ্বন্দ্ব কখনও একতরফা হতে পারে না। তাই প্রমথ নিজের সম্পর্কে নিজের উপলব্ধিগুলো বাঁচিয়ে রাখে লড়াই করার জন্য। এটা যেন অনেকটা খ্রিষ্টীয় রীতিতে নিজের কাছে নিজের কনফেশন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দেখেছেন মানুষ সংকটের সময় এভাবেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

সুধা বা অঞ্জু নয়, প্রমথ আরও অনেক মেয়েদের (ইন্দিরা, কনসিডারেট) সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে। এরপরেও ভালোবাসা মরীচিকা হয়েই থেকেছে প্রমথর কাছে। এই সব সম্পর্কের সেতু পেরিয়ে তার উপলব্ধি, ''কাউকে ভালবাসি না। ভালবাসার ক্ষমতা নেই আমার। শুধু চাকরিই প্রতিবন্ধক না। আমি আমার প্রতিবন্ধক। জান্তব ধস্তাধস্তিতে, সাময়িক জড়াজড়িতে আমি স্থির হই— ঘন মুহূর্তের স্বীকৃতিতে আমি প্লুত হই। এমন কী শারীরিক ঘষাঘষিতে পুরুষার্থ অর্থবহ হয়— কিন্তু তবুও আমি নপুংসক।''[৫] এই নপুংসকতার (শারীরিক নয়, মানসিক) জন্ম হয় কৃত্রিমতা থেকে। কৃত্রিম মজা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মহাভারতের অর্জুনের বৃহন্নলার ছদ্মবেশ যেমন অর্জুনের মূল রূপকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছিল, তেমনি আধুনিক যুগের মানুষ প্রমথ দত্তের বৃহন্নলার ছদ্মবেশ তারপ্রকৃত রূপকে আচ্ছাদিত করে দেয়। ভালোবাসাহীন শারীরিক ঘষাঘষি এভাবেই আমাদেরকে নপুংসক করে তুলছে।

প্রমথ দত্ত নিজের চোখে মহিষের কাজল অনুভব করে। খুব অন্ধকার সেই কাজলে আঁসটে গন্ধ। প্রমথর চোখ লাল হয়, ফলে সে যা দেখে তাই লালচে। দেখেই ফুলে ওঠে ঘোঁত ঘোঁত করে এগোয়। কিন্তু কেন? এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের কিছু লাইন পড়া যেতে পারে। সত্যচরণ নিজের সম্পর্কে বলেছে, ''এই তিন বছরে আমার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতি কি মায়া-কাজল লাগাইয়া দিয়াছে আমার চোখে— শহরকে একরকম ভুলিয়া গিয়াছি।''[৬] এখানে বন্যপ্রকৃতি সত্যচরণের মনে এত প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তার মনে হচ্ছে বন্যপ্রকৃতি তার চোখে মায়া রূপ কাজল পরিয়ে দিয়েছে। ফলে তার দৃষ্টি শুধু লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতির ওপর নিবদ্ধ।

আমাদের প্রমথ দত্তের চোখের কাজল আরও গাঢ়। এজন্য হয়তো লেখক মহিষের চোখের কাজল বলেছেন। কারণ মহিষের গায়ের রঙ এমনিতেই কালো। তাহলে চোখের নীচের রঙ কতটা

গাঢ় হলে তাকে কাজল হিসাবে স্বতন্ত্র চিহ্নিত করা যেতে পারে। তৎকালীন কলকাতা নগরের সমাজ-বাস্তবতা তার চোখে এই মায়া রূপ কাজল লাগিয়ে দিয়েছে। এই সমাজ-বাস্তবতার কদর্যতা, লুকানো ক্ষত, হারিয়ে যেতে বসা বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নিজের ভেতরে চলা দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা চোখের কাজলকে আরও অন্ধকার করে তোলে। আবার নিজের জৈবিক চাহিদা মেটানোর নেশায় তার চোখ লাল হয়। এই নেশায় মাতোয়ারা হয়ে যখন সে সমস্ত কিছু দেখে তখন সেগুলো নেশার বস্তুই মনে হয়, তাই সব লালচে। তা পাওয়ার উদগ্র বাসনায় শুয়োরের মত সমস্ত পাঁক ঘেটে সে ঘোঁত ঘোঁত করে এগোয়। থলথলে সমাজের এই স্থবিরতায় প্রমথ সুগন্ধ পায় না বলেই তার কাজলে মাছের আঁসটে গন্ধ। এতকিছুর পরেও প্রমথ দত্তের মনে ক্ষীণ আশা কাজ করে যায়। তাই সে মেয়েদের বুকের কাপড় সরিয়ে একখানি গ্রাম্য শস্যভূমি বা ওই জাতীয় সতেজ, জীবন্ত, নবীন কিছু দেখার আশা করে। সে সাজানো প্রেমে নয়, ভালোবাসায় পড়তে চায়।

বিভিন্ন সম্পর্কের মিথ্যার ক্লেদ গায়ে মাখে বলেই হয়তো সে সর্বক্ষণ বিবেকের দ্বারা দংশিত হয়। লেখক জানাচ্ছেন, ''খুব সাবধানে সে মনের মধ্যে একটা সাপ পোষে। সাপটা অন্য কাউকে কামড়ায় না। নিজেকে অষ্টপ্রহর কামড়াচ্ছে। নীল আরও নীল করে দিচ্ছে।''[৭] এই সাপকে এখানে আমরা যৌনতার প্রতীক হিসাবে ধরতে পারি। প্রমথ নিজের যৌনবাসনায় নিজেই দংশিত হয়। তারপরেও সে আত্মহত্যার কথা ভাবতে পারে না। তার নিজের এক দাদা (তনু) আত্মহত্যা করেছিল। এই ঘটনার প্রভাব প্রমথর ওপর গভীরভাবে পড়েছিল। এই ঘটনা থেকেই সে বুঝতে পারে এই রাস্তা সমাধানের নয়। বেঁচে থাকার সহস্র প্রতিকূলতাই তাকে আরও বেশি করে জীবনমুখী করে তোলে। কারণ সে বুঝতে পারে, এই পৃথিবী থেকে একবার চলে গেলে ফিরে আসার কোনও পথ নেই। সিনেমার মতো কোনও 'রি-টেক' নেবার সুযোগ এই বাস্তব পৃথিবীতে থাকে না। ইচ্ছে করে এখান থেকে চলে যাওয়া যায় কিন্তু ইচ্ছে করলেই ফিরে আসা যায় না। আর প্রথম অনেক দিন বাঁচতে চায়। প্রথম ছদ্মবেশের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রকৃত স্বরূপে বাঁচতে চায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মানুষের ইচ্ছাশক্তির ওপর খুব জোর দেন। এই ইচ্ছাশক্তিই জীবনের বিপুল রহস্যের স্বাদ নিতে উন্মুখ করে তোলে মানুষকে। তখন ক্রমাগত খনন কখনও ক্লান্ত করে ফেলে না মানুষকে।

অক্লান্ত খনন প্রমথ দত্তকে সন্ধান দেয় বন্ধু নীতিশের শ্যালিকা বীথির। নিম্নবিত্ত পরিবারের পিতৃহীন মেয়ে বীথি। জামাইবাবুর সাহায্যে ও দাদার সংসারে সে বড় হয়ে উঠেছে। নিজের পরিবারের সমস্যা ও নিজের সমস্যা মিলে তার ব্যক্তিত্বকে যেন আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে। এজন্য হয়তো সমাজের

পঙ্কিলতার মধ্যে থেকেও নিজের গায়ে কখনও পাঁক লাগতে দেয়নি। এই বীথি প্রথম প্রমথর ছদ্মবেশের সুতোতে টান ধরায় তার আচরণে, স্বভাবে কিংবা ব্যক্তিত্ব দিয়ে। প্রমথ অনুভব করে সে যেন হেরে যাচ্ছে কোথাও। এই হেরে যাওয়াটা আসলে প্রমথ যে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল; সেটার পরাজয়, যে সাপটা সে মনের মধ্যে পোষে, তার পরাজয়। এই পরাজয় প্রমথের মনে একটা জোরালো ধাক্কা হিসাবে কাজ করে। প্রথমকে নিজের ভাবনা-চিন্তার গতানুগতিক প্রমথকে পরিত্যাগ করাতে বাধ্য করে এই পরাজয়। প্রথম কোনও ভালোলাগার নারী (বীথি) সম্পর্কে প্রমথের মনে হয়, সেই নারী (বীথি) নিজের মতো করে নিজের জায়গায় ভালো থাকুক। তাই বীথির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক হয়, সেটা প্রেমের নয়, ভালোবাসার। আর সত্যিকারের ভালোবাসার স্বাদই তাকে ছদ্মবেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসার শক্তি জোগায়। তাই তার বীথির কাছে যাবার ইচ্ছে হয়। প্রমথের অনেক সুপ্ত ইচ্ছাগুলোর মধ্যে শক্তির সঞ্চার ঘটে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, ছদ্মবেশ থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনকে দেখেছেন জীবনের সবকিছু নিয়ে। লৌকিক ভাব সাহিত্যে পরিবেশিত হলে তা রসে পরিণত হয়। এই রস সর্বদা আনন্দদায়ক। অনেকটা এই রকম ভাবে লেখকও মনে করেন জীবনের প্রতিকূলতা, নেতিবাচকতা, সংগ্রাম শেষপর্যন্ত রস-ই উদ্‌গীরণ করে। এই রসাস্বাদনের ইচ্ছাই প্রমথকে জীবনের পথে আবর্তিত করে। উদ্ভিদ যেমন যে মাটিতে বা জায়গায় অঙ্কুরিত হয়, সেই মাটি বা জায়গা থেকেই (যতই শুষ্ক হোক না কেন) খাদ্যরস শুষে নিয়ে বেঁচে থাকে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা সেরকম প্রাপ্ত জীবন, পরিস্থিতি স্বীকার করেই জীবনের স্বাদ চেটেপুটে নিতে চায়। প্রমথর স্বগত উচ্চারণ, ''কোনও নতুন জায়গা বোধ হয় নেই। অন্য কোনো গঙ্গাও নেই। যে পথেই ঘুরি না কেন, কলকাতা ঠিক পেছনে আছে— অন্যদিকে যায় না।''[৮]

লড়াইয়ের প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই হচ্ছিলো। এবার সময় হয়েছে কৃত্রিম পোষাকটার (ছদ্মবেশ) মোহ কাটিয়ে জীবনের উলঙ্গ সত্যের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ানো। জমাট বাঁধা মোহ গলতে সময় লাগে। তবু মানুষের ইচ্ছা অনুসারে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া সব সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রমথ প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণে সফলতা লাভ করে। প্রমথের ইচ্ছা শক্তির জোর আমরা অনুভব করতে পারি। সে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বীথির সামনে (বিয়ের পর) নিজের কামবাসনা, লোভ ইত্যাদি উলঙ্গ করে তুলে ধরে। এভাবে যদি আবার নতুন করে শুরু করা যায়, পাঁক-লাগা শরীরটা, কাজলে মাছের আঁসটে গন্ধটা মুছে ফেলে যদি নতুন মানুষ হওয়া যায়। এক্ষেত্রে বীথিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু লেখক জানেন, মানুষ সামাজিক জীব হয়েও শেষপর্যন্ত সে একা। লড়াইটা প্রমথকে একাই করতে

হবে। কারণ, ''তখন এসব পাতানো সম্পর্কের মধ্যে হিসেব না মিটলে কেউ কারও না। কথাগুলো কী সত্যি— কী দয়ামায়াশূন্য।''[৯] এই লড়াই যেন বীথির সঙ্গেও। নতুন জীবনে নতুন পাতানো সম্পর্কে নতুন করে যেন কোনো ছদ্মবেশ তৈরি না হয় কিংবা বলা যেতে পারে অজ্ঞাতবাস ছেড়ে এসে আবার কোনো যেন অজ্ঞাতবাসে যেতে না হয়।

জীবনে এই চলার পথে যদি মৃত্যু আসে— সেটাও নিছক আসার জন্য আসা। আসাটা নেহাতই অনিবার্য, নাহলে ''মৃত্যুটা প্রায় থিয়েটার টিকিট। ভিড় দেখলে কিংবা সময় না থাকলে বেঁচে দেওয়ার মত নিশ্চিন্ত ব্যাপার।''[১০] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা সব সময় কোনও এক আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। আর মনে হয় এই আবিষ্কারের নেশাই তাদেরকে জীবনের পথে ধরে রাখে। কিসের আবিষ্কার? আমাদের এই ছকে বাঁধা গতানুগতিক জীবন-প্রবাহে বেঁচে থাকার স্বাদ। যে স্বাদের ভাগ ইচ্ছে থাকলেও অন্য কাউকে দেওয়া যায় না। কারণ তা ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধি। এই উপলব্ধ অনুভূতিই মানুষকে শত প্রতিকূলতা, নিশ্চিত পরাজয়কে অস্বীকার করতে শেখায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসে আমরা তাই দেখি।

অনিলের স্বল্প আয়ের নিশ্চয়তা থাকলেও পরিবারে প্রতিকূল পরিস্থিতি তাকে মানসিকভাবে বিপন্ন করে তোলে। তার পরিবারের এই আর্থিক চাহিদা ভোগ-বিলাসের জন্য নয়, অসুস্থতার জন্য। বাবার অসুখ, মায়ের পাথুরি রোগের অস্ত্রোপচার সফল না হওয়া এবং নিজের বউ পুতুলের মাঝে মাঝেই অসুস্থ হওয়া; পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘদিনের এই শারীরিক অসুস্থতা— অনিলের মানসিক দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপন্যাসের সূচনাটাও ইঙ্গিতবহ। অনিলের সবচেয়ে বড় মাসি তরঙ্গিনীর আসন্ন মৃত্যু সম্ভাবনার খবর দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে মৃত্যু, অসুখ, ডাক্তার, ওষুধ নিয়ে লেখকের সৃজিত বাস্তবে আমরা প্রবেশ করি।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অনিল রায়চৌধুরী। তার একদিকে যেমন সামান্য রোজগার, অন্যদিকে তেমন অসুখের ক্রমশ থিতু হওয়া; অনিলের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার উপর আস্তরণ ফেলে দেয়। এই আস্তরণ ভয়ের। অনিল এই আস্তরণ গায়ে ফেলেই যেন প্রাত্যহিক জীবনে চলাফেরা করে। এই ভয় সৃষ্টি হয়েছে অসুখ থেকে, যা ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে মৃত্যুভয়ে গিয়ে ঠেকেছে। তাই পুতুল যখন অনিলের এত ভয় পাবার কারণ জিজ্ঞেস করে তখন অনিলের উত্তর, ''ভয় কি সাধে হয়। সব বুঝিয়ে বলাও যায় না... মোট কথা পৃথিবীটা খুব অনুকূল জায়গা না নিশ্চয়। এখানে পথ, ট্রাম লাইন, শিব মন্দির, বটগাছ তবু বেশিদিন টেকে— কিন্তু অনিল, নরেশ, সেজোর দম ফুরোলেই শেষ— আর সে

দমও গভর্নর দিয়ে লরির স্পিড বেঁধে দেওয়ার মতো— লিমিডেট।”[১১]

ভয়ের ভিতরে সে এমনভাবে সেঁধিয়ে গেছে যে, নিজের মধ্যে কল্পিত রোগের উপস্থিতি অনুভব করে। আসলে অসুখ-জীর্ণ পরিবারে থাকতে থাকতে তার চিন্তা-ভাবনাও অসুখের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। নিজের অসুখ না থাকাটাই অনিলের কাছে অস্বাভাবিক। পুতুলকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসে ভাবে, সেও একদিন না একদিন কোনও একটা রোগে চিরকালের মত তলিয়ে যাবে। ডাক্তারের কাছেও আসতে পারবে না। লেখকও অনিলের বয়স বাড়ার উপমা দেন শারীরিক অসুস্থতার (জ্বর) সঙ্গে তুলনা করে। অফিস ফেরৎ ক্লান্ত অনিল আরাম পায় এভাবে, ‘‘অসুখ বিসুখ, টাটানো ব্যথায় মলম দিয়ে কেমন করে আরাম পেতে হয় এসব নিয়ে কথা বলতে অনিলের আজকাল ভালো লাগে। জ্বর, ব্যথা, পোড়া ঘার জন্য ট্যাবলেট মিকশ্চার ইনজেকশন আছে জেনেই কেমন নিশ্চিন্ত লাগ।”[১২]

বাস্তব বা কল্পিত অসুখের ঘোরে চলা অনিল বহু বছর বাদে কলেজের বন্ধু গুরুপদের সঙ্গে দেখা হলেও, সেই অসুখের ঘোর থেকে বেরোতে পারে না। তাই বন্ধুর সঙ্গে অনিলের কথোপকথনের পুরোটা জুড়ে থাকে অসুখের কথা— কেবল অসুখ। এই ঘোর সম্পর্কে খুব সতর্ক বা সচেতন না থাকলে অসুখের ঘোরই অনিলের মনের চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই অনিলের একসময় মনে হতে থাকে, জীবনে অসুখ ব্যতিত আর কোনও ঘটনাই যেন ঘটছে না। এই ঘটনা-বিরল বোধ অনিলের মধ্যে সৃষ্টি করে স্মৃতি-আকুলতা। স্মৃতি-আকুলতা যেন তাকে সাহায্য করে অসুখের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে। অনিল বারবার ফিরে যেতে চায় তার বাল্য-কৈশোর পর্বে। সেই পর্বের চঞ্চলতার স্মৃতিতে অনেক বেশি আরাম অনুভব করে অনিল। তাই কোনও এক অদৃশ্য শক্তির কাছে তার প্রার্থনা, একবার ছোটবেলার সময়ে ফিরে গেলে যেন ধীর লয়ে সময় প্রবাহিত হয়। যাতে বড় বেলার বর্তমান সময়ে অনেক দেরিতে পৌঁছায় অনিল। বর্তমানের অসহনীয় বাস্তবতা থেকে এভাবেই সাময়িক মুক্তি পেতে চায় অনিল। তবে শুধুমাত্র অসুখ অনিলকে ক্লান্ত করে না। পুতুলের সঙ্গ তার জৈবিক চাহিদা মেটাতে পারে না। সুখী যৌনজীবন মানুষের অনেক সমস্যার চিন্তাকে লঘু করে দেয়। কিন্তু অনিল অনেক চেষ্টা করেও তা পায় না। এর পিছনেও অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে পুতুলের মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়া। ফলে বাস্তব বা কল্পিত অসুখ, ওষুধ, স্মৃতি-আকুলতা, দৈহিক ক্ষুধা, স্বল্প আয় ইত্যাদি অনিলকে ধীরে ধীরে আরও নিঃসঙ্গ করে তোলে।

অনিলের সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, এর মূলে রয়েছে অর্থের অভাব

ও যৌন অতৃপ্তি। স্বল্প বেতনের চাকরি তাকে পরিবারের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেও পরিবার ও নিজের অন্যান্য চাহিদাগুলোকে সীমায়িত করে দিয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব-অনটনই অনিলকে এত ভীতু করে তুলেছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আর্থিক চাহিদার সঙ্গে অর্থ জোগানের এই অসামঞ্জস্যতা অনিলের সমস্যাগুলোর অন্যতম কারণ। এই কারণ কিছুটা লঘু হতে পারত সুখী যৌনজীবনে। এক্ষেত্রে পুতুলের অসুস্থতা, সারাদিন অসুস্থ মানুষদের পরিচর্যা, সংসারের পরিশ্রম পুতুলকেও ক্লান্ত করে তোলে। ফলে পুতুল সেভাবে কোনও দিন সহযোগী হয়ে উঠতে পারে না অনিলের যৌনজীবনে বা তার বিপন্নতায়। অনিলের অর্থচিন্তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো—

ক. ''... কিন্তু মোলায়েম রাখবার জন্যে যে পরিমাণ টাকা থাকা দরকার তা না থাকলে মন খুঁত খুঁত করে। ... কিন্তু আমাদের যে আরও তিরিশ বছর থাকতে হবে। এতদিন থাকবার মতো পয়সা দরকার। পয়সা নেই বলে অর্থচিন্তা, মনঃকষ্ট-দুশ্চিন্তা।'' [অনিলের পুতুল, পৃ. ২০৪]

খ. ''শরীরের যে ফাঁক দিয়ে মৃত্যু ঢুকে পড়তে পারে সেখানে দশটা ডাক্তার আর আট বস্তা রুপোর টাকা ঢাল করে ফেলে রাখলে ঢুকবার আগে অন্তত কিছুদিন আশেপাশে ঘুর ঘুর করবে মৃত্যু, ইতস্তত করবে।'' [অনিলের পুতুল, পৃ. ২৩৫]

কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা হার মানতে শেখেনি। প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়, তারা ভালোভাবেই জানে। আর এই প্রতিরোধ আসে জীবনকে আঁকড়ে ধরার বাসনা থেকেই। প্রতিরোধ-কৌশল বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন রকম হয়। যেমন, অনিলের দাদা নৃপেনের কৌশল হলো যে কোনও ধরনের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরা এবং সেই বিশ্বাসের মধ্যে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়া। এই বিশ্বাস অন্ধ বা চক্ষুষ্মান— যাইহোক্ না কেন, তাতে কোনো যায় আসে না। মোদ্দা কথা হলো, 'আঁকড়ে' ধরা। এই রকম ধর্মের উদাহরণ হিসাবে নৃপেন জানায়, 'টাকা জমাবার ধর্ম', 'পরনিন্দা-পরচর্চার ধর্ম' ইত্যাদি। কিন্তু অনিল জেনে গেছে, আসলে প্রত্যেক বিশ্বাসই অন্ধ। তাই অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভর করে জীবন অতিবাহিত করা মানে জীবনের অনেক দিক সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকা। এজন্য জীবনের অনেক দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নয়, জীবনের অনেক দিকে মুখ করেই অনিল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জীবনের অনন্য স্বাদ চেটেপুটে নেবার জন্য অনিল পুনরায় প্রস্তুতি নেয় লড়াই করবার। আর যাদের রসাস্বাদনের ক্ষমতা রয়েছে, তারা লড়াই থেকেও রস শুষে নিতে পারে। অসুখের ঘোর থেকে বেরোবার জন্য অনিল নিজের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষাকেই হাতিয়ার করে তোলে। এই হাতিয়ারগুলোকে শানিত করে তোলে এই ভাবে, ''সব দেনা যদি শোধ হয়ে যায়— সব অসুখ

লক্ষ্য করে তাহলে বাছাই বাছাই ইঞ্জেকসন, ট্যাবলেট ছুঁড়ে মারবে। তারপর একদম নিরাময় হয়ে গেলে ফলের রস, মিছরির সরবত, মাখন, মাংস, ঘুম, আদ্দির পাঞ্জাবি এবং ডাবের জল। একেবারে পয়লা নম্বরের সজল, সরস শরীর হয়ে যাবে।

তখন অনিল, পুতুল সেজো প্রথম থেকে আরম্ভ করবে!"[১৩] এই রকম ইতিবাচক মানসিকতাই শেষপর্যন্ত অনিলকে পুতুলের গর্ভের সন্তান নষ্ট করতে দেয় না। পুনরায় উদ্যোগ নেয় মায়ের অসুখ নির্মূল করার।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসের কাহিনির প্রধান চরিত্র নির্বাচিত হয়েছে ছাপোষা একান্নবর্তী নিম্নমধ্যবিত্ত ঘর থেকে। লেখকের নিজস্ব পারিবারিক জীবন হয়তো এই বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই এই চরিত্রগুলো যেমন বিশ্বাসযোগ্য, জীবন্ত হতে পেরেছে তেমনি এই চরিত্রগুলোই প্রধান হয়ে উঠেছে লেখকের জীবনদৃষ্টি প্রকাশে। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে কুবের এই রকম একটি চরিত্র। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায়, এক বাড়িতে দীর্ঘকাল চাপাচাপি, গাদাগাদি করে থাকতে থাকতে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল আর একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকবার। কারণ দেবেন্দ্রলাল ঘরে এসে বসতেই তার সব ছেলে একে একে চাকরিতে ঢুকেছে এবং সবাই বিয়ে করেছে। তবে এই প্রয়োজনীয়তা দেবেন্দ্রেলালের সব ছেলের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি অনুভব করে, তিনি হলেন কুবের। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে আর একটু ভালোভাবে থাকবার প্রয়োজনীয়তা কুবেরের কাছে হয়ে ওঠে সাধ-স্বপ্ন।

প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সামর্থ্য । তাই সামান্য কয়েক কাঠা জমি কেনার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় কুবেরকে। অবশ্য পছন্দমত জায়গা কিনতে না পারলেও জমি-জায়গা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয় কুবেরের মগজে ঢুকে যাচ্ছিল। এই জানার পরিধি ও গভীরতা যত বাড়তে থাকে কুবের তত ডুবে যেতে থাকে বিষয়ের পরিধি ও গভীরে। জীবন ও জগতের অন্যান্য বিষয়গুলো ক্রমশ মনোযোগ হারাতে থাকে কুবেরের কাছে। এই বিষয়ে প্রাথমিক সংশয় তার মধ্যেও ছিল। সে যেন একটু খানি হাত-পা ছড়িয়ে ভালো থাকবার জায়গা কিনতে গিয়ে চোরাবালির মত বিষয়-আশয়ে নিমজ্জিত হচ্ছে। এই সংশয়ী মন নিয়েই দল বেঁধে (টাকার জন্য) কুবের প্রথম জমিটা (এক একর চব্বিশ শতক) কেনে। প্রথম কোনও জমির মালিক হবার তৃপ্তিই তার মন থেকে ধীরে ধীরে সংশয় কাটাতে শুরু করে। জমির ওপর দখলদারি ও জমির মালিকানা কুবেরকে ততদিনে মানসিক জিহ্বায় অন্য এক জগতের স্বাদ এনে দিয়েছে।

এই স্বাদ তাকে আরও বেশি করে জমি কেনাবেচার বিষয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এই স্বাদই তাকে বুঝিয়েছে এতে কোনও অন্যায়-অপরাধ হয় না। কারণ আদিকাল থেকে মানুষ এভাবেই ব্যবসা করে আসছে। আর ব্যবসার সারসত্য হলো, কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করা। এই যুক্তি কুবেরকে জমি সম্পর্কিত ব্যবসায় পুরো মনোযোগ ও মস্তিষ্ক খাটাতে সাহায্য করে। ফলে জমি কেনাবেচার হাত ধরে ক্রমশ বাড়তে থাকে কুবেরের স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ও আর্থিক শক্তি (কাঁচা টাকা)। যে প্রয়োজনীয়তা (পরবর্তীতে সাধ-স্বপ্ন) অনুভব করে কুবের জমি কিনতে বেড়িয়েছিল, সেই প্রয়োজন এখন গৌণ। মানুষ চলার পথে এভাবেই অনেক প্রয়োজনের মুখ বুজিয়ে দেয়। আর একটি প্রয়োজনের অনুভবে লুকিয়ে থাকে বহু প্রয়োজনের সম্ভাবনা। তাই প্রয়োজন ক্রমশ তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলে। অনেকটা প্রাচীন বটগাছের মত। গাছের ডাল থেকে নামা ঝুড়িগুলোই ক্রমশ বটগাছে পরিণত হয়ে যায়। এজন্যই হয়তো বিষয়-আশয়ের প্রতি ক্রমবর্ধমান টান কুবের এড়াতে পারে না। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বিষয়ে জীবনদৃষ্টি খুব স্পষ্ট, ''আসলে মানুষ একদিন জানতে পারে— পৃথিবী জায়গাটা খুব নিরাপদ নয়। মা-বাবা চিরকালের নয়। টাকা— খরচার জিনিস। ফুরিয়েও যায় একদিন।

তাই মানুষ বিষয়কে আশ্রয় করে। সেই থেকে— বিষয়-আশয়।''[১৪] উপন্যাসে কুবের ও তার বাবার (দেবেন্দ্রলাল) কথোপকথনে কুবেরের বক্তব্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হতে দেখি, ''... কিন্তু যেদিন আর টাকা আসবে না কুবের— তখন? তখন তুমি কী করবে?'

'সেজন্যেই তো লোকে বিষয়-আশয় করে— খারাপ সময়ে বিষয় থাকলে আশ্রয়ের চিন্তা থাকে না। বিষয় মানুষকে দেখে— আশ্রয় দেয়।''[১৫]

আসলে এক অনিশ্চয়তা মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই সঙ্গী। কালপ্রবাহে শুধু রঙ বদল হয় কিন্তু থেকে যায় অনিশ্চয়তা। তাই কুবেরের প্রয়োজনীয়তার সীমানা বৃদ্ধির পথকে অনিশ্চয়তা থেকে নিশ্চয়তা পাবার চেষ্টার পথ হিসাবে দেখতে পারি। একসময়ের ভ্যাগাবন্ড কুবের এখন ড্রিম মার্চেন্ট। এবেলা ওবেলা মানুষের কাছে বিষয়ের স্বপ্ন বিক্রি করে নিজের বিষয়-আশয় বাড়াতে থাকে। কিন্তু এই কুবেরই এই কাজ করতে করতে উপলব্ধি করে, লোভের জিনিস পাবার ক্ষেত্রে যত প্রতিকূলতা কমতে থাকে কিংবা লোভের দ্রব্য যত সহজলভ্য হতে থাকে সেই জিনিসের প্রতি লোভ তত কমতে থাকে। তারপর হয়তো একদম মরে যায়। তাই কুবের নিজের সন্তানের জিনিস নষ্ট করার প্রসঙ্গে বুলুকে বলে, ''খোকনকে ভালো জিনিস নষ্ট করতে দিয়ে যাও— তাহলে দামি জামা, ভালো খেলনা,

ছবির বইতে আর লোভ থাকবে না—"[১৬] এভাবেই অনেক লোভ কুবেরের মরে গেছে। যে কোনও মানুষের মরে যায়।

তাই হয়তো অন্য একটি লোভ কুবেরকে পুনরায় চাগিয়ে তোলে। এবার ড্রিম মার্চেন্ট কুবের থেকে চকদার কুবের হবার লোভ। ভদ্রেশ্বর এখানে শুধু অনুঘটকের কাজ করে। চকদার হবার লোভে কুবের তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপাবে, এটা প্রায় অনিবার্য ছিল। তাই মেদনমল্লর চরে কুবের প্রায় সব সঞ্চিত অর্থ ঢেলে দেয়। সেও প্রায় পাকাপাকি ঘাটি গেড়ে বসে চরে। তার চোখে তখন একটা লোভই প্রতিনিয়ত দুলতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি মানুষের ভাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সর্বদা চলে না। তাছাড়া সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল, প্রথম দিকে তার কাজের সঙ্গে যে আনন্দ বা বিস্ময় ছিল তা ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। যে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অর্থ উপার্জন শুরু করেছিল, মায়ের মৃত্যু সেখানে বড় ধাক্কা দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ভাইয়েদের কুবেরের তৈরি করা বাড়িতে না আসা, বাবার স্থায়ীভাবে না আসা; সূচনালগ্নের সেই প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যকে সমূলে কুঠারাঘাত করে। কিন্তু কুবেরের বিষয়-আশয়ের প্রতি লোভ তাকে বিষয়-আশয়ে নিমজ্জিত করে রাখে। মেদনমল্লের চরে আভা কুবেরের জীবনে এসে তার উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা পুনরজ্জীবিত করে তোলে। এরপর প্রকৃতি তার লীলায় কুবেরের চকদার হবার লোভকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে যায়। অবশ্য এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটার আগে থেকেই কুবেরের বিষয়-আশয়ের প্রতি লোভের রস শুকিয়ে আসছিল, বিপর্যয় ঘটার পর চকদার হবার লোভে একেবারে ইতি পড়ে যায়।

কুবেরের একক ভাবেই নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটেছিল। উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটলেও পুরাতন বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি কুবের। সেটা পারাও সম্ভব ছিল না দু'টো কারণে। এক, পরিবার থেকে তার একক উত্তরণ ও সেরকম পারিবারিক সহায়তা না পাওয়া এবং দুই, উত্তরণের দ্রুতগতি। এই দু'টো কারণে তার ভেতরে বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠে। কোনটাতেই স্থিত হতে না পেরে সে স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত হয়। মেদনমল্লের চড়ে কুবের নদীর চড়ের মতোই ভয়ঙ্কর একাকীত্বের শিকার হয়। এই মেদনমল্লের চড় তার একাকীত্বের প্রতীক হিসাবে উঠে আসে। বাহ্যিক জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ। কুবের অবশ্য এই নিঃসঙ্গতার জন্য নিজেকেই দায়ি করে। কারণ সে যে পথ বেছে নিয়েছে, সেখানে সিঃসঙ্গ হওয়া সংস্কারের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত কুবেরের কাছে প্রায় অনিবার্য। শেষ বয়সে যে বিষয় তার আশ্রয় হবার কথা ছিল, তাই এখন বড় বোঝা হয়ে উঠেছে। কুবেরের প্রায় সব ইচ্ছা, সাধ, স্বপ্ন প্রকৃতি,

পরিস্থিতি, সময় ইত্যাদির চাপে ধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। এজন্যই হয়তো কুবের কদমপুরে পুনরায় ফিরে এসে পুরানো জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। তবে এই বিচ্ছিন্নতাই কুবেরকে তার অতীতের দিকে প্রবলবেগে টানতে থাকে।

তারপরেও সবকিছু হেরে গিয়ে হার মানে না কুবের। অতীতের পরিবারের বিস্ময়, আনন্দ তাকে জীবনের পথে ধরে রাখে। সেটাও যখন ভুলে যাচ্ছে, তখন আভার দৃষ্টিতে দেখা চাঁদের রহস্য তার অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে। মইয়ের প্রায় শেষ কাঠিতে পা দিয়ে সে চাঁদের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করে ফেলে। আক্ষেপ একটাই, তার এত বড় আবিষ্কার দেখার জন্য কেউ নেই, বলার মত কোনও লোক নেই। সাপের কামড়ে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতেও তার এই আক্ষেপ আমাদেরকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ধান মজুত করার ঠিক মতো ব্যবস্থা না করার আক্ষেপ, নিজের মেয়ে কুসুমকে প্রয়োজনীয় সময় না দিতে পারার আক্ষেপ; জীবনের প্রতি আকণ্ঠ ভালোবাসকেই তুলে ধরে। সময়ের চাকায় সবকিছুই পিষ্ট হয় কিন্তু কিছু কিছু মানুষের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা-অতৃপ্তি- আক্ষেপ সেই রাস্তায় জীবনের শেষ রসটুকু পর্যন্ত নিঙড়ে নিতে থাকে।

''এই অনেকটা জুড়ে জলধারার নাম গঙ্গা। তাতে উল্টো সোজা টানের নাম জোয়ার ভাঁটা। ... আমি এসব লিখতে চাই।''[১৭] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই কথা মনে আসার অনেকদিন (প্রায় তেইশ বছর) পর গঙ্গা নদী ও তার পার্শ্ববর্তী জীবনকে নিয়ে লেখেন উপন্যাস 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' (২০০১)। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হাজরা হালদার। স্ত্রী, সাত মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে তার সংসার। মূলত সে দরিদ্র জেলে। গঙ্গা তার বিচরণ ভূমি। কিন্তু বার্ধক্য ও অর্থাভাব তার জেলে জীবনে বিরতি টেনে দেয়। মাসিক বারোশো টাকায় চাঁদ মহম্মদ মল্লিকের পোষা জীবদের দেখাশোনা করতে হয় হাজরা হালদারকে। জীবনের প্রান্তে এসে তার উপলব্ধি হয়, সে শুধু টিকে আছে। অর্থহীন এই বেঁচে থাকা। কোনও কিছুকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরা চাই। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা স্বপ্নকে সঙ্গী করেই জীবনের পথে চলে। পরিস্থিতির চাপ হাজরা হালদারের সেই স্বপ্নকে ক্রমাগত শুষে নিচ্ছিল। কিন্তু তারপরেও তো মানুষ লড়ে যায়। যেমন হাজরা হালদার নিভু নিভু স্বপ্নকে সযত্নে আগলে রাখে। কী স্বপ্ন তার? পুনরায় জেলে-জীবন ফিরে পাওয়া এবং জেলে হয়ে বড় গাঙে গিয়ে ইলিশ মাছ ধরা। এই স্বপ্নের পিছনে ইন্ধন হিসাবে কাজ করেছে যে বিষয়গুলো, সেই বিষয়গুলো হলো সংসারের আর্থিক অবস্থা ফেরানো কিংবা নিজের মেয়েদের ভালোভাবে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। আর একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, বড় গাঙে ইলিশ মাছ ধরার কৌলীন্য এবং চাঁদ হোসিয়ারি

থেকে মুক্তি পাবার স্বাদও এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

'স্বপ্ন' এই একটি শব্দের সঙ্গে মিশে রয়েছে মানুষের বিভিন্ন রকমের অনুভূতি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ উপন্যাসে স্বপ্নের প্রবল উপস্থিতি লক্ষণীয়। কিন্তু কেন? আমাদের মনে হয় লেখকের দৃষ্টিতে একটা জীবন স্বপ্ন ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাই জীবন, জীবনের লড়াইয়ের কথা বলতে গিয়ে সঙ্গী হয় স্বপ্ন। আর এই সঙ্গীই জীবনের চলার পথে অনুপ্রেরণা, তাদিগ হয়ে ওঠে। এজন্যই হয়তো বয়স থাবা বসানো শরীর নিয়েও হাজরা হালদার প্রস্তুতি নেয় বড় গাঙে গিয়ে ইলিশ মাছ ধরার।

এজন্যই হয়তো হাজরা হালদার যখন দেখে নৌকার খোল ভরে উঠছে ইলিশে তখন স্বপ্নের ঘোরে তলিয়ে যেতে থাকে সে। প্রচুর অর্থ উপার্জন যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হত, তাহলে হয়তো তাড়া থাকত ফিরে গিয়ে মাছ বিক্রি করার। এই তাড়া ছিল তার সঙ্গী মুকুন্দ পালের। কিন্তু ভুটভুটিতে মাছ ধরার অনভিজ্ঞতা হাজরাকে আছড়ে ফেলে বাস্তবের মাটিতে। স্বপ্ন ও বাস্তবের এই দ্বন্দ্ব শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাস্তব পরিস্থিতির চাপে নিজের হাতে ধরা মাছ (ইলিশ) নিজেকেই ফেলতে হয় নদীতে। হাজরা হালদারের স্বপ্নের করুণ পরিণতি এভাবেই ঘটে। হেরে গিয়েও হার না মানা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের চরিত্রগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই মুকুন্দর কাছে নিজের মেয়ের সঙ্গে চাঁদ মহম্মদ মল্লিকের ছেলের সম্পর্কের কথা যখন শোনে তখন আরও একবার সুযোগ পাবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থেকেই যেন হাজরা হালদার চমকে ওঠে না। বরং মুকুন্দ প্রদত্ত তথ্য অব্যবহিত পরেই হাজরা তাদের বাস্তব অবস্থাকে যেন অস্বীকার করে পুনর্বার ইলিশ ধরার স্বপ্নে বা ঘোরে নিমজ্জিত হবার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

কোনও মানুষের কোনও কিছু করার ইচ্ছা, ভোগ করার ইচ্ছা যদি মরে যায়, তাহলে সেই মানুষের যাপনচিত্র কীরকম হবে? বা তার সামাজিক-সাংসারিক সম্পর্কের লেখচিত্রই বা কীরকম হবে? কিংবা সবকিছু অগ্রাহ্য করে শেষপর্যন্ত জীবনের পথেই আবর্তিত হওয়া শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রগুলোর যে প্রধান বৈশিষ্ট্য— তা আমরা উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন চরিত্রের মধ্যেও দেখতে পাব কি না? এই সব প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে আমরা দেখা পাই 'স্বর্গের আগের স্টেশন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র খগেন নস্করের। সাংসারিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে 'নিষ্কর্মা' চরিত্র বলা যেতেই পারে। স্ত্রী বেস্পতি আর দুই ছেলে পৃথক খায়। শুধু ছোট ছেলে ঘটি কখনও বাপের সঙ্গে ঘোরে, খায় কখনও বা মায়ের কাছে এসে পাত পাড়ে। তবে 'সৎলোক' হিসাবে এ অঞ্চলে খগেনের পরিচিতি রয়েছে। তাই পায়ের

পাতা বাঁকা বলে জমির কাজে ডাক না পড়লেও ভদ্দর লোকের বাড়িতে বিভিন্ন কাজে পাহারা দেবার ডাক পড়ে। আর খালের মাছ, গাছের ফল-রস খেয়েই খগেনের দিন চলে যায়। নিষ্কর্মা খগেনের কিছু গুণও রয়েছে। সে গাছ চেনে, গাছের শেকড়-বাকড় চেনে, তন্ত্রসাধনাও কয়েকদিন করেছে— এছাড়া সর্পবিদ্যা তার নখদর্পণে।

গুনিন হয়ে হয়তো অনেক কিছুই করতে পারতো অর্থাৎ অর্থ উপার্জন কিন্তু খগেনের আজকাল আর ইচ্ছা হয় না। এই ইচ্ছার মৃত্যু তাকে ধীরে ধীরে নিষ্কর্মা বানিয়েছে। স্ত্রী-পুত্র থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে। সমাজ তাকে 'সৎ লোকে'র ট্যাগ লাগালেও পরিবার-সংসারের প্রতি তার টান কমে গেছে। এমনকি যুবক বয়সের নিঃসন্তান অল্পবয়সি মাইতি-বেধবার ভালোবাসা গতজন্মের ঘটনা হিসাবে খগেনের স্মৃতিতে স্থান পেয়েছে। তবে সমাজ-সংসারের প্রতি দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলেও প্রকৃতির প্রতি তার দৃষ্টি সাধারণের থেকে হয়েছে আরও তীক্ষ্ণ, অনুভব শক্তি হয়েছে আরও জোরালো। জীবনের এই যাত্রাপথে তার সঙ্গে দেখা হয় শহর থেকে এসে গ্রামে বাড়ি করা বিপিনবাবুর সঙ্গে। হয়তো এই পরিচয়ের ফলেই খগেন সচেতন হয়ে ওঠে তার প্রতি পরিবারের লোকজনের রয়েছে গভীর অশ্রদ্ধা। তাই সমাধানের আশায় সে বিপিনবাবুকে জানায় নিজের অসহায়তার কথা। কীভাবে সে পয়সা উপার্জন করতে পারবে— সেই কৌশল বের করার দায়িত্ব অর্পণ করে বিপিনবাবু কাঁধে। বিপিনবাবুর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই খগেনের মধ্যে জেগে ওঠে নিজের টাকায় সাধ মিটিয়ে হাউস করার ইচ্ছা।

আর খগেনের এই জেগে ওঠা ইচ্ছাকে কাজে লাগায় বিপিনবাবুর মত মানুষেরা যারা শুধু বাঁচার জন্য কাজ বানায়— যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে লোভ, মুনাফা। এরপর আমরা দেখতে পাই, বিপিনবাবুর লোভ, মুনাফার জালে খগেনের ক্রমশ জড়িয়ে পড়ার ঘটনা। প্রথমে গোসাপ তরপর বিষধর সাপ ধরতে থাকে খগেন। এই কাজের মাঝেই দেখা হয় শিবানীর সঙ্গে। মাইতি-বেধবা সুমতির যে ভালোবাসা গতজন্মের ঘটনাতে পরিণত হয়েছিল— তা যেন শিবানীর মধ্য দিয়ে খগেনের কাছে বর্তমান বাস্তবতায় স্থান পায়। এজন্যই হয়তো খগেনের মধ্যে বিপিনবাবু নির্মিত জাল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা দেখতে পাই না। যে কাজে খগেন নেমেছে, তাতে তার নীতি, বিবেকের সঙ্গে আপোশ করতে হয়েছে। কারণ এরফলেই সে বুঝতে পেরেছে অনেকদিনের জমানো ইচ্ছেগুলো আবার ডানা মেলতে শুরু করেছে। যে ইচ্ছা-মৃত্যুর ফলে খগেন রেল লাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করতে যায়, সেই খগেন এখন দু'মাস ধরে ধরার জন্য মাদি কেউটের পেছনে ঘোরে। এখানে অর্থ উপার্জন একেবারেই গৌণ বিষয় খগেনের কাছে, মুখ্য হয়ে উঠেছে জীবনকে আরও একবার চেখে দেখার ইচ্ছা। শ্যামল

গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রগুলো এখানেই স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। লেখক নিজেই এই চরিত্র সম্পর্কে জানায়, ''ইচ্ছে মরে গিয়ে সে কোনও বড় বাণী দেয়নি। শোষণ, অভাব, খিদে, লড়াই তো সম্রাট অশোকেরও আগের আমলের জিনিস। মানুষের ইতিহাসের নিত্যসঙ্গী। তাকে বাদ দিয়ে খগেন চলতে চায়নি। তাকে নিয়েও পড়ে থাকতে চায়নি। বরং জীবন-রহস্যে কে যেন আসেনি— এই কথাটা জানতে পেরে মাদি কেউটেকে ছেড়ে দেয়। শিবানী, সুমতি, মেছুনি— সব একাকার করে ফেলে।''[১৮]

আমাদের আলোচ্য পরবর্তী উপন্যাস 'চন্দনেশ্বর জংশন' -এর প্রধান চরিত্র এই খগেন নস্করের ছেলে বজ্রেশ্বর নস্কর। আগের উপন্যাসে এই বজরার জীবিকার যে পরিচয় পাই, তা এই উপন্যাসেও বর্তমান রয়েছে। বারোখানা ডাকাতির মামলা তার নামে এখনও ঝুলছে আলিপুর আদালতে। আর রেলের ওয়াগন ভাঙতেও তার জুড়ি মেলা ভার। এমনকি অন্যের স্ত্রীকে ভাঙিয়ে আনা অন্যদিকে প্রথম স্ত্রীর জন্য ফলিডল দিয়ে আলুর চপখানা ভিজিয়ে রাখা তারই কাজ। এত গুণের অধিকারী বজ্রেশ্বর ওরফে বজরাকে 'সৎ' করে নিতে চায় তার দাদা হৃদয় নস্কর ওরফে রিদে। তাই বারবার সে বজরাকে সৎ হবার কথা বলে। হৃদয় শুধু এককভাবে নয়, সকলে মিলে বজরাকে সৎ করে নিতে চায়। সৎ হবার বিষয়টি হৃদয়ের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু বজরার মনে হয়, তারা তো কোনও দিনই খারাপ ছিল না। বজরা নিজের জীবনচর্যায় ভালো-খারাপের মানদণ্ড দাদা হৃদয়ের থেকে পৃথক। কারণ বজরার ভাবনা অনুযায়ী, তার দাদা হৃদয় ভালো কিন্তু বোকা এবং নিজে ভালো কিন্তু চালাক।

লেখক এই উপন্যাসে বজরা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এক গ্রাম্য সমাজ-বিরোধী মানুষের ছবি তুলে ধরেছেন। যাকে গ্রামের অন্যান্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মিলে 'সৎ' করে নিতে চায়। যে দলের নেতৃত্বে থাকে হৃদয় নস্কর। এটা শুধু বজরাকে ভয় পেয়ে নয়, আসলে মানুষ সব সময় নিজেদের দল ভারী করতে ভালোবাসে। তাই শুধু একটি গ্রাম নয়, আশে-পাশের আরও গ্রাম থেকে চাঁদা ওঠে বজরার জন্য। এজন্যই হয়তো যার কোনও টাকা দেবার সক্ষমতা নেই, সেও খড় দেবার জন্য রাজি থাকে। যাতে হৃদয় সেই খড় বিক্রি করে সেই টাকা বজরার সৎ হবার কাজে লাগাতে পারে। হৃদয় নস্করের ক্রমাগত এই প্রচেষ্টা বজরার হৃদয়ে কিছুটা হলেও ধাক্কা দেয়। আসলে প্রতিটি মানুষকে জীবনের কোনও না কোনও পর্যায়ে নিজেদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। তাই লেখকও জানান, ''এখানে নাদু, শশী, রাধিকে, হৃদয়, সনেকা, বজ্রেশ্বর, অনন্ত, জগা— সবাই পড়ন্ত অবস্থায় উথলে বাইরে পড়ে যাওয়ার মুখে নিজেকে দেখতে পায়।''[১৯]

আমাদের আলোচ্য প্রধান চরিত্র বজরাই তার জীবিকার কঠিন পর্যায়ে পড়ন্ত অবস্থায় নিজের মুখোমুখি দাঁড়ায়। মজা নদীর ধারে বড় বড় পাথরের সঙ্গে বজরার কথোপকথন তো আসলে নিজের বিবেকের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া। এখানেই সে উপলব্ধি করে যত কঠিন পরিস্থিতিই আসুক না কেন, সময় সবর্দা বয়ে চলে। জীবন যেভাবেই হোক সে প্রস্ফুটিত-বিকশিত হবেই। কারণ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টি হলো, ''জীবনের এক এক জায়গা দিয়ে আবার জীবন শুরু হয়ে যায়। মানে জীবন থেকে একটা জীবন বেরিয়ে আসে।''[২০] বজরা চরিত্রের মধ্যে লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হতে দেখি। তবে আর একটি জীবন হয়ে বেরিয়ে আসা বজরার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এত অপরাধের পঙ্কে সে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলো যে একটা জোর ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। আর সেই ধাক্কাটা এলো তার দাদা হৃদয় নস্করের কাছ থেকেই যখন দাদাকে বজরা ভেবে রেল পুলিশ প্রায় মেরেই ফেলেছিল। হৃদয় ও বজরা— দু'জনেই সেদিন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিল। হৃদয়ের এক পায়ে আসে পঙ্গুত্ব অন্যদিকে বজরার মনে আসে সেই প্রয়োজনীয় জোরালো ধাক্কাটা। এখান থেকেই শুরু হয় বজরার জীবনে প্রকৃত লড়াই। কঠিন পরিস্থিতি থেকে পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানো, জীবনের নগ্ন বাস্তবতাকে স্বীকার করেই আর একটি জীবনকে বের করে আনা জীবনের দিকে মুখ রেখে— শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই জীবনদৃষ্টি তার চরিত্রদের পুষ্ট করেছে। কাহিনির একেবারে শেষে বজরার নিজস্ব অপরাধের স্বীকারোক্তি বজরাকে আর একটি জীবনের পথেই পা বাড়াতে সাহায্য করে।

হয়তো পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সৃজনশীলতা থাকে সুপ্ত অবস্থায়। সময়ের এগিয়ে চলার মধ্য দিয়ে কেউ সেটা উপলব্ধি করতে পারে কেউ বা পারে না। আবার যারা পারে তাদের মধ্যে কেউ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না। কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররা শুধু সৃজনশীলতা উপলব্ধি করতে পেরেছে তাই নয়— তারা সৃজনশীলতা প্রকাশের নানাবিধ ক্ষেত্র বেছে নিয়ে তার নির্যাস 'আনন্দ'-এর রসাস্বাদন করতে পেয়েছে। তাদের এই যাত্রাপথের অন্তিমে পার্থিব জগতের সাফল্য বা ব্যর্থতা গুরুত্বহীন হয়ে গেছে। স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সৃজনশীল মানুষ শেষপর্যন্ত মানবসভ্যতাকেই সমৃদ্ধ করে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসের অনাথবন্ধু বসু এমনই একটি চরিত্র যার মাধ্যমে লেখকের এই বিশিষ্ট জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

মফস্বল জনপদ ঈশ্বরীতলায় নিজস্ব বাড়ি তৈরি করে নানাবিধ পোষ্য নিয়ে ভালোই দিন কাটছিল অনাথবাবুর। ঘন্টাখানেকের কম সময়ে পৌঁছে যেত কলকাতার অফিসে। ঈশ্বরীতলায় বসবাসকালে অনাথবাবুর প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে দেখা ও অনুভব করার দৃষ্টিশক্তি ও মন নির্মিত হয়েছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

ক. ''কোথাও কোনো নাগরিক জিনিসের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেল না অনাথ। আজ পূর্ণিমা হতে পারে। চন্দনেশ্বর মৌজা পেরিয়ে দূরের ধোঁয়াটে জায়গার ওপরকার আকাশে এরই ভেতর চাঁদের একটা আউটলাইন ফুটে উঠল ।ভালো জ্যোৎস্না পেলে ঈশ্বরীতলার এদিকটা একদম বুনোপরী হয়ে যায়।" [ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, পৃ. ২০]

খ. ''এখানে সে বাতাসের ভেতর আলো দেখতে পায়। রোজ ভোরবেলা উঠে পরিষ্কার বুঝতে পারে— এখন তার খরচের জন্য সামনে টাটকা, আনকোরা একটা পুরা দিন পড়ে আছে। রোজকার ভোরবেলার সূর্যের আলো তার নতুন লাগে। এইভাবে কত কোটি বছর ধরে দিন আসে সকালবেলা। তার মাঝখানে এই সংসার করা আসলে একটা নিরর্থক খেলা।" [ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, পৃ. ৩৩]

নিজের বিভিন্ন রকম পোষ্যদের সঙ্গে অনাথবন্ধু বসুর বার্তালাপ চলে। মনুষ্যতর প্রাণীরা তার সঙ্গে মানুষের ভাষায় কথা বলে আর অনাথবন্ধু তাদের সঙ্গে মনুষ্যতর প্রাণীর ভাষায় কথা বলে। যেমন— ''অনাথ দেখল, এখন সারা পৃথিবী ঘুমোচ্ছে। সে অনায়াসে চেঁচিয়ে বলল, কঁ কঁ কঁ।

মুরগিরা শুনল, দিন কোথায়! যাও শুয়ে পড়গে তোমরা। শুনেই ওরা ঘুমোতে চলে গেল ভেতরে।"[২১]

এই বিষয়টিকে আমরা দেখতে পারি সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সমব্যথী দৃষ্টিকোণ থেকে। আসলে অনাথবন্ধু নিজের স্বতন্ত্র মনুষ্যসত্তাকে অস্বীকার করেছে এখানে। প্রকৃতিকে দেখার জন্য যেমন সে নতুন চোখ আবিষ্কার করেছে তেমনি স্বতন্ত্র শ্রেণিসত্তাকে একীভূত করে ফেলেছে মনুষ্যতর প্রাণীদের সঙ্গে। তাই সহজেই অনাথবন্ধু নিজেকে তার বাড়ির সবচেয়ে 'বড় জন্তু' হিসাবে দেখে। যদিও বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে অনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির মিল নেই। কারণ এই বিষয়টি মানুষের ভেতর তখনই জন্ম নিতে পারে যখন তীব্র সহমর্মিতা-সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। আর এই সৃষ্টির পেছনে থাকে এই জগৎ-সংসারকে দেখার বিশেষ দৃষ্টিকোণ— যা অনাথবন্ধু লাভ করেছিল ঈশ্বরীতলায় বসবাস করে। একেই হয়তো বলে প্রকৃতির সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে লীন হয়ে থাকা।

এভাবে ভালোই দিন কাটছিল তার। কিন্তু আর এক ধরনের আনন্দের সন্ধান দেন মহম্মদ বাজিকর। নিজের মতো করে কিছু তৈরি করার আনন্দ। শুধু আনন্দ পাবার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিছু তৈরি করার কাজে নিজেকে জড়ানো যায়, তাহলে তার স্বাদ বেঁচে থাকার আনন্দে কয়েকগুণ

বাড়িয়ে দেয়। বাজিকরের দেখানো পথ অনুসরণ করে শুরু হয়ে যায় অনাথের বিশাল কর্মযজ্ঞ। বর্ষায় চাষের পর জলের অভাবে কোম্পানি বাঁধ লাগোয়া বিভিন্ন মানুষের প্রায় তিনশো বিঘার মত জমি পতিত থাকে। নিজস্ব কিছু তৈরি করার আনন্দ পেতে সমবায়িক প্রথায় শুরু হয় ধান চাষ। ঈশ্বরীতলার সমাজের মাথারা ভেবে কুল পায় না এতে অনাথবাবুর লাভ কোথায়? ঐহিক সমাজের লাভ ক্ষতির অঙ্কে ডুবে থাকা মানুষদের পক্ষে অনাথবাবুর এই কর্মদ্যোগ, উৎসাহের তল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ এই জগৎ-সংসারকে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছেন অনাথবন্ধু— সেটার নিরিখেই আনন্দ রসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব—

''তাই তো অবাক হচ্ছি। তুমি করছ কেন? কোনো লাভ নেই যখন? শুধুই বেগার খাটুনি? ধানচারা রোজ বড় হচ্ছে। তার শব্দ শুনতে পাই। যারা হাল দিল, রুয়ে দিল— তাদের ঘামে-ভেজা মুখের হাসিতে আমি মেঘ, বাতাস, জ্যোৎস্নার জলছাপ দেখতে পাই।''[২২]

কিন্তু পৃথিবীর অন্তরের কথা মনে হয় বিনিময়। বিনিময় প্রথার নিয়মেই এত বড় জগৎ-সংসার তার অস্তিত্ব রক্ষা করে আছে। কিছু পাওয়ার মধ্যে যেমন অনেক না-পাওয়ার গল্প থাকে, তেমনি না-পাওয়ার মধ্যেও অনেক কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা লুকিয়ে থকে। কোনও কিছুই একতরফাভাবে দীর্ঘদিন চলতে পারে না। অনাথবন্ধু বসু এই কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে লীন হয়ে যতটুকু রসাস্বাদন করেছেন— এবার সময় এসেছে কিছু দেবার। তা নেবার জন্যই প্রকৃতির প্রতিনিধি হিসাবে হাজির হয় মাজরা পোকা। তবে শুধু মাজরা পোকা নয় চাষের শেষের দিকে আরও নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন— পাম্প দিয়ে জল না আসা, বাড়ি-জমি ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রেখে আরও টাকা জোগাড় করে চার ইঞ্চির ডায়ামিটারের পাইপ বসিয়েও পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না ওঠা এবং শেষপর্যন্ত আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামা। ধান হলো বটে, তবে তাকে শুধু ভবিষ্যতের খড় বলা যেতে পারে। জলের তোড়ে ভেসে যায় অরুণ, বরুণ রাজহাঁস দু'টো। এই বিনিময় প্রথা বুঝতে পেরেই হয়তো অনাথ তার স্ত্রী শান্তাকে জানায়, ''কোনও জিনিস বিনে পয়সায় পাওয়া যায় না শান্তা! পাতালের ভেতর থেকে শেকড় রস টেনে আনে। সেই শেকড়ের ভেতরকার খবর কতটুকু রাখি? এখন বুঝি, আমি তো এতদিন কিছুই জানতাম না। আমার চারদিকে এখন রসস্থ জগৎ। সব দরজা খুলেছে শান্তা।''[২৩] আর অনাথ জানে, এই রসস্থ জগৎ দেখার জন্য বিনিময় প্রথাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই দেখার চোখ পাওয়া যাবে। এই জীবনদৃষ্টি নিয়ে শ্যামলের জগৎ গড়ে উঠেছে। তাঁর প্রধান চরিত্রদের আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির ফসল বলতেই পারি। তাই তারা পার্থিব লোকসান

হবে জেনেও কাজ থামিয়ে দিতে পারে না। কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির লাভ-ক্ষতি শেষপর্যন্ত তাদের কাছে গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই হার নিশ্চিত জেনেও নিজের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার জন্য লড়ে যায়। লেখকের এই বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি প্রতিফলতি হয় অনাথের বক্তব্যে, ''হেরে গেলাম তাতে কি? আমি কত জিনিস দেখলাম। দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। এখন আমি ভূগোল বইয়ের ঋতুকে প্রহর ধরে ধরে চিনি।

আসলে শেষ অব্দি থাকে কি? থাকে তো এই মানুষটা। এই আমি। আমার দেখা। আমার তেষ্টা। আমার কষ্ট। আমার সুখ।''[২৪]

শ্যামলের চরিত্ররা তাই আত্মহত্যা করে না— তারা সর্বস্ব খুইয়েও জীবনের পথেই আবর্তিত হয়।

'অদ্য শেষ রজনী' উপন্যাসে এক পৃথিবী স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করে গ্রুপ থিয়েটারের একটি দল, যার নাম 'পঞ্চমুখ'। বিষয়বৈচিত্র্যে, অভিনব উপস্থাপনা কৌশলে, ভালো অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করা, তাদের স্মৃতিতে নিজের ও দলের আসন স্থায়ী করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সাধারণত লিটিল ম্যাগের মত গ্রুপ থিয়েটারও তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অর্থনৈতিক প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করে। যদিও এই সব বিষয় জ্ঞাত থাকার পরেও বিভিন্ন বয়সী মানুষ সৃজনশীল উন্মাদনায় গ্রুপ তৈরি করে স্বাধীনভাবে স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ভালো নাটক করার জন্য। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে অমিয়র নাটক করার পিছনে মানসিক-অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়ে সর্বদা পাশে দাঁড়িয়েছে তার স্ত্রী লীলা। অমিয়র জীবনে ও সংসারে লীলার এই অবদান অবশ্য কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করে অমিয়। তাই অমিয় মনে করে, লীলার মত স্ত্রী পাওয়া তার কাছে ভাগ্যের ব্যাপার। যে স্ত্রী (লীলা) তার গায়ের শেষ সোনাটুকু দিয়ে দিয়েছে অমিয়কে নাটক নামানোর খরচা তোলার জন্য। এরপরেও লীলার মনোভাব 'আরও থাকলে আরও দিতাম।' এভাবেই নিজের সামর্থ্যের শেষ রসটুকু নিঙড়ে দিয়েছে লীলা। কিন্তু অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' নাটকটি কাঙ্ক্ষিত দর্শক-গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছিল না। অবশ্য এই নাটক করার মাঝখানেই অমিয় নতুন একটি নাটক রচনায় হাত দেয়। এক্ষেত্রে প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিলো নারীচরিত্র কেন্দ্রিক নাটক সুজাতার চরিত্রে অভিনয় করার মত উপযোগী অভিনেত্রী খুঁজে বের করা ও দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ছিল তথাকথিত সেই অর্থ। 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' সেভাবে মঞ্চসফল না হওয়ার দরুণ দেনার ভারে নতুন নাটক নামানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কিছু মানুষ থাকে যারা নিজেদের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার জন্য শেষপর্যন্ত লড়াই করে

যায়। অমিয় দিনের পর দিন প্রায় দর্শক শূন্য বা অল্প দর্শকের উপস্থিতিতেও নাটক চালিয়ে গেছে। মাথায় দেনার বোঝা নিয়ে 'সুজাতা'-র মত ভিন্নধর্মী নাটক লিখে গেছে। আর স্বপ্ন দেখেছে একের পর এক হাউসফুল নাইটে 'সুজাতা'র মত নাটক মঞ্চস্থ করতে। অমিয় স্বপ্ন দেখে 'সুজাতা' নাটকের উপার্জন থেকে হলঘরে এয়ারকুলার বসাতে পারবে। প্রতিদিন দর্শকের জন্য একস্ট্রা চেয়ার দেবার 'ঝামেলা' পোহানোর স্বপ্ন দেখে অমিয়।অবশ্য স্বল্প-পরিচিতিপ্রাপ্ত গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসাবে এই রকম স্বপ্ন দেখা সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। তবে কিছু সিদ্ধান্ত সাধারণ গতানুগতিক ধারা থেকে কিছু মানুষকে আলাদা করে। ইতিহাস জুড়ে এর উদাহরণ ছড়িয়ে। সাধারণের চোখে এসব দুঃসাহসিক, পাগলামি কিংবা 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়' প্রবাদ বাক্যের মত। এই ধরনের সিদ্ধান্তই অমিয় চরিত্রকে বিশিষ্ট করে তুলেছে— লেখকের নিজস্ব জীবনদৃষ্টিতে স্নাত করেছে। উপন্যাসের কাহিনিতে এরকম একটি প্রথম সিদ্ধান্ত হলো, 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' নাটকের প্রথম হাউসফুল নাইটেই সেই নাটকের লাস্ট নাইট হিসেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এর ইঙ্গিত লেখক আমাদের দেন যখন ভরা হলঘরে নাটক করতে গিয়েও অমিয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। আসলে অমিয় তখন মনের ভেতরেই প্রথম চ্যালেঞ্জের সমাধান করে ফেলেছিল। কিন্তু এই সমাধানটা ছিল তার তরফের— পুরোপুরি সমাধানের জন্য প্রয়োজন ছিল অন্যপক্ষের সম্মতি। এজন্যই হয়তো পুরো মন দিয়ে অভিনয় করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সে ফোকাসের বাইরে চলে যাচ্ছিল। আরও একবার ঝুঁকি নিয়ে দুর্গালালের গদি থেকে টাকা ও শ্রীরাম ট্রাস্টের হলঘর ভাড়া নিয়ে সুজাতার চরিত্রে রজনীকে রাজি করিয়ে অমিয় প্রবল আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে এক অনিয়শ্চয়তার পথে পা বাড়ায়। রজনীও সাহায্য করে বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋন নিতে।

প্রত্যেক শিল্পীর মধ্যেই একটি অতৃপ্তি কাজ করে। আর এই অতৃপ্তি তাকে আরও ভালো কাজ করতে প্রেরণা জোগায়। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও এই অতৃপ্তি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। তার জন্যই সে বারবার নাটক নিয়ে পরীক্ষায় মেতে উঠেছে। একুশ রজনীর পরেও 'সুজাতা' নাটক সেভাবে জমে না ওঠায় অমিয় প্রচার-কৌশল বদলায়— বিজ্ঞাপনের ভাষাও বদলে ফেলে। আর তাতেই ধীরে ধীরে হাউসফুল হতে শুরু করে 'সুজাতা' নাটক। থিয়েটার-দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে যায় এই নাটক নিয়ে। সমস্ত দেনা শোধ হয়ে গিয়ে 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারকে 'সুজাতা' নাটকের সাফল্য শক্তিশালী আর্থিক ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। এখন শুধু হলঘরে নয়, গ্রামে-গঞ্জের বিভিন্ন কল-শোয়ে অর্থ উপার্জন করতে শুরু করে 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটার। কোনও কোনও কাজ করে শিল্পীর মনে হয় এটা

তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। ফলে এক ধরনের তৃপ্তি বাসা বাঁধে অমিয়র মনে। তাছাড়া গ্রুপ তৈরি হবার পর এই প্রথম কোনও নাটক তাদের এত বৃহৎ সংখ্যায় দর্শক-ভালোবাসায় আপ্লুত হয়েছে। এরফলে অমিয়র মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দ্বিধা, ''অমিয় পরিষ্কার জানে— সে এখন একটি প্রতিষ্ঠান। নতুন করে ভাবতে গেলে সব ভেঙে পড়বে। নতুন নাটকের ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি হবে না। সবাই চায় নিরাপদে থাকি। বাড়ি ভাড়া রেশন হাউসফুল একস্ট্রা চেয়ার নিয়মিত পাবলিসিটি কলশো। কেউ চায় না, এই একই অভিয়ের একঘেয়েমি ভেঙে ফেলে দিয়ে আরও কঠিন কিছুর জন্যে প্রাণপাত করি।''[২৫] যদিও 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারে ভাঙনের সূত্রপাত অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিলো। যখন অমিয় হাউসফুল হলের টিকিট সেলের নতুন আরামে ডুবে যাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যাশায় শারীরিক অবস্থা উপেক্ষা করে গ্রামে-গঞ্জে নিয়মিত কলশো করে যাওয়া। এছাড়াও আমরা আর একটি কারণ খুঁজে পাই, আসলে অমিয় রজনীর সঙ্গে যথাক্রমে জীবন-সুজাতা চরিত্রে অভিনয় করার তৃপ্তিতে ডুবে ছিল। কারণ অমিয় অনুভব করেছে, তার ভেতরকার অভিনয়কে জাগিয়ে তুলতে পেরেছে একমাত্র রজনী। যার ফলে রজনীর অভিনয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অমিয়র অভিনয় আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। আর যে কোনও অভিনেতার কাছে এটা পরম গৌরবের বিষয়। তাই অমিয় তার স্ত্রী লীলার কাছে কৃতজ্ঞ থাকলেও রজনীর সঙ্গে অভিনয় করার, সঙ্গে থাকার সুযোগ লীলার অভিমান সত্ত্বেও হারাতে নারাজ।

অমিয় ক্রমশ বুঝতে পারছিল, সে শুধু এখন টাকা আয় করার যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ জীবন, মানুষ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। শিল্পীজনিত অতৃপ্তি এখন তার মধ্যে সেভাবে সক্রিয় নয়। অর্থ গ্রুপ থিয়েটারের পরিবেশ, মানসিকতা, আচরণ সব পাল্টে দিয়েছে। অমিয় ও তার গ্রুপ এমন একটি রাস্তায় হাঁটছে, যে পথের অর্থ উপার্জন ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু অমিয়র ভেতরের শিল্পীসত্তা বর্তমান অমিয়কে বাস্তবতা আঙুল তুলে দেখায়—

''—তা হয় না অমিয়। জীবনযাপনের পদ্ধতিই মানুষের শিল্পে উঠে আসে। শিল্পের জন্য জীবনে শরীরের এক ইঞ্চি পোড়ালে তার ছাইটুকু শিল্পে উঠে আসে। এখানে সুদূর বোধি—কিংবা রিমোট সেন্সের কোনো দাম নেই অমিয়।''

—'তুমি কে?'

আয়নার অমিয় বলল, 'আমি তোমার আগেকার আমি।'

—'তাহলে আমি কে?'

—'তুমি হলে গিয়ে এখনকার আমি। তুমি পথভ্রান্ত পথিক।"[২৬]

নিজের শিল্পীসত্তা থেকে এভাবে দূরে সরে যেতে দেখে, অমিয় আরও একবার প্রস্তুত হয় অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে। কিন্তু 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' নাটক থেকে যত সহজে সে 'সুজাতা' নাটকে নামতে পেরেছিল— ততটাই কঠিন ছিল দর্শকধন্য বা মঞ্চজয়ী 'সুজাতা' নাটক গোটানো। আর তাছাড়া সাফল্যের সঙ্গে 'শত্রুতা' নামক এক সঙ্গী এসে জোটে। 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রেও সেটা ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে 'পঞ্চমুখ'-এর অতি সম্প্রসারণের সময়ে কিংবা সাফল্যের গর্ভে যে পতন বা ভাঙনের বীজ রোপিত হয়েছিল— অর্থ-সান্নিধ্য যে ঘটনাগুলোকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছিলো; তাই ধীরে ধীরে বড় হয়ে সামনে আসতে শুরু করল। থিয়েটার ও রজনী-সান্নিধ্যে অমিয় এতটা সময় ব্যয় করছিল যে নিজের সন্তান-স্ত্রীর ভাগে দেওয়ার মত কোনও অবিশিষ্ট সময় ছিল না অমিয়র। বারবার কিছুটা সময়, নজর চেয়েও দীর্ঘদিন না পেতে পেতে এবং রজনীর সঙ্গে অমিয়র ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি, লীলার মত স্ত্রী-কেও অমিয়র থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অমিয় ভাবছে, ''লীলা যদি একটু বুঝত। কিংবা বেশি বোঝে বলেই হয়তো এত শক্ত হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। চালু নাটক থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে এই যে, আরেক নাটক শুরু হয়ে গেলো পঞ্চমুখের জীবনে— যার প্রথম দৃশ্য শংকরের প্রস্থান, দ্বিতীয় দৃশ্য শোনা যায় শশাঙ্কর উদয়, তৃতীয় দৃশ্য সম্ভবত এই ট্যাক্সিযাত্রা দিয়েই শুরু। চতুর্থ দৃশ্য— ঝড়ের আভাস— লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাক মুখে।"[২৭]

নিজস্ব পারিবারিক বিপর্যয়, পঞ্চমুখের ভাঙা হাট, রজনীর নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে যাত্রা, গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সেই উদ্দীপনা-উৎসাহ না থাকা, 'সিকিউরিটি' নামক চর্মরোগে গ্রুপের আক্রান্ত হওয়া, 'সুজাতা'-র মত মঞ্চসফল নাটকের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাওয়া— এরপরেও অমিয় 'সম্রাট' নাটক নামানোর প্রস্তুতি শুরু করে। জাগিয়ে তোলে তার সেই পুরানো অতৃপ্তিবোধ, একেবারে ভিন্নধর্মী ('সুজাতা'র সাপেক্ষে) ঐতিহাসিক পিরিয়ডধর্মী নাটক 'সম্রাট' নিয়ে পুনরায় পরীক্ষায় মেতে ওঠা কতিপয় মানুষদের ক্ষেত্রেই সম্ভব। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রগুলোকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। নিশ্চিত জীবন নয়— বরাবর অনিশ্চিত জীবনেই আনন্দ পেয়েছে, জীবনকে দেখতে-শিখতে- বুঝতে চেষ্টা করেছে, জীবনকে নিঙড়ে রসাস্বাদন করেছে। এই অনিশ্চয়তাই অমিয়কে পুনরায় জীবনের পথে আবর্তিত হতে সাহায্য করে। সে নিজের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা পূরণে পুনরায় নতুন বিষয়ে ঝাঁপ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবেই কিছু মানুষ সাধারণের মধ্যে থেকেও সাধারণত্ব অতিক্রম করে। লেখকের এই বিশিষ্ট জীবন-দর্শন অমিয় চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখি।

কোনও সৃজনশীল মানুষ যখন মধ্যবয়সে এসে উপলব্ধি করে, তাকে আর্থিক সচ্ছলতা দিয়ে, কাজে ফাঁকি দেবার সুযোগ দিয়ে, নিরাপদ-নিশ্চিন্ত একটা জীবনের টোপ সামনে রেখে— আসলে কর্মক্ষেত্রে তাকে জড়ভরত কিংবা 'যো হুজুর' বানানোর প্রক্রিয়ায় ক্রীয়াশীল অনেকটা যেন সোনার খাঁচায় বন্দী পাখির মত স্বাধীনতা দিয়ে শান্ত রাখাই প্রধান উদ্দেশ্য— সেই ব্যক্তি তার জীবনে কী ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে? শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্মিত চরিত্ররা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈশিষ্ট্যেই স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণই নয়, গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ— অনিশ্চয়তা, পরাজয়, মৃত্যু কোনও কিছুকেই পরোয়া না করে লক্ষ্যে অবিচল থাকা, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রাম; সেই সব মানুষকে একশো জনের ভিড়েও আলাদা করে চেনা যায়। লেখক জীবনকে দেখেছেন অফুরন্ত বিস্ময় ও অপরিসীম কৌতূহলের চোখে। এই পৃথিবীতে নিজের মত করে কিছু জিনিস বানাবার আনন্দই বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। কুবের বা অনাথ বানাতে চেয়েছিল মফস্বল, গ্রাম বা দ্বীপের মধ্যে। 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসে দিলীপ বসু তার জীবনের প্রথম পর্বে শহরে বসবাস করে এই বানাবার আনন্দে মশগুল হয়ে উঠতে চেয়েছেন। এই আনন্দ যারা অনুভব করতে পারে, তারা বারবার ভেঙে পড়েও বারবার উঠে দাঁড়ায় শুধু নিজের মত করে কিছু বানাবার আনন্দ পেতে। এক্ষেত্রে ভেঙে পড়াটাই যেন ইন্ধন জোগায় শরীর ও বুদ্ধিকে সচল করতে।

'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসের দিলীপ বসু তার কর্মজীবনের প্রথম পর্বে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছিল। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি বেসরকারি কয়লা খননকারী কোম্পানীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা ও ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ কোম্পানিতে পরিণত করা। দিলীপ বসু আরও কিছু তৎকালীন সময়ের প্রাণোচ্ছল যুবকদের সঙ্গে নিয়ে অনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কিছু বানানোর আনন্দে মশগুল হয়ে রাত-দিন কাজ করেছে। ন্যাশনালাইজেশন হবার পর কোম্পানির কর্মসংস্কৃতিতে বিপুল পরিবর্তন আসে। অনাথ চক্রবর্তী তো একরকম প্রায় বসে থেকেই বেতনসহ কোম্পানির সর্বোত্তম সুবিধা গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু যে মানুষের সৃজনশীলতায়, নতুন করে কিছু বানানোর উদ্দীপনায় শরীরের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসাড়তা ও ক্ষয়রোগ বাসা বাঁধে না, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয় কাজের ক্ষেত্রে বসিয়ে দেবার। কারণ একদা যারা প্রকৃত পরিশ্রম করে উপরে উঠে এসেছে— তাদের মধ্যে অনেকের কিছু বানানোর আনন্দের পরিবর্তে ক্ষমতা ভোগ করার আনন্দ সময়কালে অনেক বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে। বিনিময়ে তাদের সৃজনশীলতায় অসাড়তা ও মরচে ধরে। আর এই স্বাদের বিভাজন যত কম ভোগের আনন্দ তত বেশি। ফলে এই ধরনের মানুষদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা বোধ ও ভীতি

কাজ করে তাদের প্রতি যারা এখনো বানানোর আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতে চায়; কি জানি কখন তাদের পাশে আর একটি চেয়ার যুক্ত হয়ে না যায়! এজন্যেই জীবনের মধ্য বয়সে এসে দিলীপ বসু উপলব্ধি করে, ''খারাপ লাগে এজন্যে যে, সামনে আর কোন বিস্ময় নেই। একই নিয়মে তাকে চাকরি করে যেতে হবে। এই পৃথিবীর পিঠের ওপর আমরা সবাই কেমন করে বেঁচে আছি— একথা ভাবলেই দিলীপের আরও খারাপ লাগে।''[২৮] ফাঁকি দাও আপত্তি নেই, কাজে অবহেলা করো তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু বেড়ে ওঠার সব রাস্তা বন্ধ। উদ্দীপনা-উদ্যমের সঙ্গে নতুন কিছু করা বারণ। তাহলেই পছন্দমত হয়ে থাকা যাবে, মোটা বেতনের চাকরির নিশ্চয়তার সুখনিদ্রায় বাকিটা জীবন যাবে কাটান।

কিন্তু দিলীপ বসু 'ফর গ্র্যান্টেড' হয়ে সারাজীবন বসে থাকবার মত পাত্র নয়। জীবনে যখন বিস্ময় কমে আসছে তখনও সে একটা সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসেছিল। আর সেই সুযোগ আসল যখন ভৌমিক ট্রাস্টের হয়ে খাদান খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দিলীপ বসু নিজেই সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়— সেটা হলো প্রাইভেটলি শেয়ার বিক্রি করা অর্থাৎ সোজা কথায় খাদানের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা। আর তৎকালীন সময়ে একটা আনকোরা বেসরকারি অতি ক্ষুদ্র কোম্পানির জন্য যেটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু প্রায় এক বছরের মধ্যে দিলীপ অচল একটি ক্ষুদ্র খাদানকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। পুঁজির অভাব তো হয়নি বরং এই পুঁজির দৌলতেই কয়লা উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গোকুলদার নজরে তাই দিলীপ বসু 'মিরাক্যাল ম্যান'। কিন্তু ঋষি, অনন্ত, গোকুল কেউই এই খাদানের সম্প্রসারণ চায় না। প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বার্থ এখানে কাজ করে। তবে খাদানের সম্প্রসারণের পক্ষে দিলীপ বসুরও নিজের স্বার্থ আছে। সে স্বাতীকে বলে, ''রাগ নয়। একটা অন্ধ কবন্ধ জিনিসকে আমি নাড়া দিতে চেয়েছিলাম। ওরা আমাকে 'ফর গ্র্যান্টেড' ধরে নিয়েছিল। ভেবেছিল— দিলীপ বসুকে একটা টেবিল দিয়ে ডাম্প করে ফেলে রাখলেই চলবে। কিন্তু তা হয়নি। শুধু পাণ্ডবেশ্বর এরিয়াতেই ওদের বিজনেস ফল করেছে বিশ লাখ টাকার। ভালো করে এগোলে ওই অঙ্ক বিশ কোটি টাকায় দাঁড় করানো যেত। তখন টনক নড়তো। কিন্তু বাধা যে আমাদের নিজেদের ভেতরেই।''[২৯] দিলীপের এই স্বার্থকে আমরা দিনের পর দিন বিপুল সৃজনশীল কর্মক্ষমতার অপচয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। দিলীপের ভুল হয়েছিল এটাই যে, সে সহজ বিশ্বাসে কয়েকজনকে সঙ্গে করে এই প্রতিবাদ সংগঠিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই রকম কর্মক্ষম মানুষকে দেখে সাধারণত্বের সীমা অতিক্রম করতে না পারা মানুষদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধের সৃষ্টি হয়। ভয় হয় দিলীপের সঙ্গে থাকলে যে ঝুঁকি, অনিশ্চয়তায় পা বাড়াতে

হবে— তাতে না তাদের এতোদিন ধরে সাজানো নিশ্চিত জীবনে ছেদ পড়ে। আসলে যে কৌতূহল, বিস্ময়, সৃজনশীলতা থাকলে জীবনকে নিবিড়ভাবে অনুভব করা যায়— তা তাদের মধ্যে নেই। কারণ কংক্রীটের জঙ্গলে থাকতে থাকতে মধ্যবিত্ত ভীরুতায় এক ছকে-বাঁধা জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ছকের বাইরে তারা মাঝে মধ্যে ট্যুর করতে রাজি কিন্তু প্রতি পদে পদে জীবনকে পরীক্ষায় ফেলে বাঁচার যে আনন্দ— তা করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। ফলে নিজের দলের মধ্যেই বাধা পেয়ে দিলীপের মধ্যে তীব্র বিরক্তি ও হতাশার সৃষ্টি হয়। এমন একজন মানুষ যে বন্ধ্যা কাজের কমিশন পেয়ে কখনও খুশি থাকতে পারে না। কারণ দিলীপ বসু মানেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটে চলা, কাজের আনন্দে কাজ নিয়ে মেতে থাকা, বড় করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে সমস্ত মনোযোগ সেই কাজে একত্রিত করা। তাই দেখা যায় কোল ইণ্ডিয়ার মত ভৌমিক খাদানও তার অপ্রতিরোধ্য গতিকে রুদ্ধ করতে চায়। দ্বিতীয়বার ভেঙে পড়তে দেখা যায় দিলীপ বসুকে।

বহমান গতিশীল নদী যেমন তার পথ বানিয়ে নেয়, দিলীপ বসুও তেমনি আরও একটি নতুন ক্ষেত্রে জড়িয়ে যায় এবং সেখানেও নতুন কিছু বানাবার আনন্দে মশগুল হয়ে ওঠে। লেখক জানায়, ''দিলীপ অনেকদিন পরে বানাবার জিনিস, বাড়াবার জিনিস— গ্রোথের ব্যাপার হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়ে মল্লিকবাজারের হর্ণের আওয়াজ, চেঁচামেচির ভেতর স্বপ্ন দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।''[৩০] পুরানো গাড়ি কিনে নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে নানান জিনিস অ্যাসেম্বল করে একটি নতুন রূপ দিয়ে কিছুদিন চালিয়ে সেটা বিক্রি করা। এই কাজ করতে গিয়ে সে কালু ঘোষের লাল অস্টিনট্যুরার গাড়িটা কেনে। তারপর কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে। দিলপী যে কোনও দিন গাড়ি চালায়নি— স্টিয়ারিং ধরামাত্র গাড়ি মসৃণভাবে চলতে থাকে। গাড়ির জ্বালানী পর্যন্ত খরচ হয় না। গাড়ির পেছনের সিটে মৃত কালু ঘোষের অদৃশ্য উপস্থিতি। অশরীরি কালু ঘোষের সঙ্গে শরীরি দিলীপ বসুর ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরি হওয়া। তার সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া, ঘুরে বেড়ানো, গল্প করা ইত্যাদি চলে। এই ক্ষেত্রটিতে আমাদের বাস্তব-অবাস্তবের ধারণা কিছুটা গুলিয়ে যায়। তবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তার অনেক উপন্যাসেই এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যেখানে বাস্তব ঘটনাবলীর সাহায্যে বক্তব্য প্রকাশের অসুবিধায় সম্মুখীন হয়েছেন বা বক্তব্যের তীব্রতা প্রকাশে তৃপ্ত হতে পারেননি। অশরীরি কালু ঘোষকে নিয়ে দিলীপ বসুর সম্পর্ক দিলীপের নিঃসঙ্গতা, সমমানসিকতার বন্ধু পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করে। আসলে জীবনের অনেকটা সময় ধরে দিলীপ যাদের বন্ধু ভেবে এসেছে— সেই ভাবনা শেষে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। এটা সে আরও বেশি করে বুঝতে পারে তখন যখন একসঙ্গে মিলে ভৌমিক ট্রাস্টের খাদান করতে

নামে। শেয়ার সংগ্রহের কমিশন হাতে ধরিয়ে প্রথমেই তাকে কিছুটা দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। ফলে খাদানের নানান সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে ঋষি, অনন্ত, গোকুলদের হাতে। তারপর কোল ইণ্ডিয়ার গুড বয় হিসাবে থাকার জন্য ঋষির অসহযোগিতা— যে বিশ্বাস নিয়ে দিলীপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করছিল কোল ইণ্ডিয়াকে একটা লেসন দেবার জন্য, সেই বিশ্বাসেই ছুরিকাঘাত করা হয়, ''দিলীপ দেখলো অনেক কিছুই জানতে চাওয়া যায়। কিন্তু যেটাই চাইবে— সেটাই খানিক খানিক করে বিশ্বাসের পলেস্তারা তুলে দেবে। সে কথা উচ্চারণের পর কেউ কারো মুখে তাকাতে পারবো না। সে যে আরো কষ্টের। কেন যে খাদান করতে এসেছিলাম। কোন দরকার ছিলো না আমার। দিব্যি আমরা, বন্ধুরা ছিলাম। আসলে আমাদের এমন শক্তি নেই— যার জোরে এসব পার হয়েও আমরা বন্ধু থাকতে পারি।''[৩১] এভাবেই দিলীপ আরও নিঃসঙ্গ হতে থাকে। ঋষি, অনন্তর সঙ্গে আগের ধারণামতো বন্ধু হয়ে থাকার আকাঙ্ক্ষা দিলীপের মধ্যে সক্রিয় থাকে। কিন্তু বাস্তব ঘটনাবলীতে তা সম্ভব নয়। তাই বন্ধুত্ব পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই দিলীপের অবচেতন মন নির্মাণ করে অশরীরি কালু ঘোষকে। ভালোবাসা, মেশামেশি, বন্ধুত্ব নিয়ে কালু ঘোষের বয়ানে আসলে নিজের ভাবনাকেই তুলে ধরে দিলীপ। এতোদিন ধরে যাদের সে বন্ধু ভেবে এসেছে তারা দিলীপের এই ভাবনাগুলোর শরিক হতে পারে না। ফলে বন্ধুত্ব না পাবার যন্ত্রণা— আর সেই যন্ত্রণা থেকেই সমমনোভাবাপন্ন অশরীরি কালু ঘোষের আবির্ভূত হওয়া। তবে প্রশ্ন হলো কালু ঘোষই কেন? উপন্যাসে কালু ঘোষের যা ইতিহাস পাই, তাতে গ্রামের একটি সাধারণ ছেলে তার পরিশ্রম, মাথার ঘিলু, দূরদৃষ্টির সাহায্যে কলকাতায় নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। যে মানুষ বানাবার আনন্দ অনুভব করতে পারে না, তার পক্ষে শুধু পরিশ্রম ও ভাগ্যের সাহায্যে এত দূর ওঠা সম্ভব নয়। ফলে কালু ঘোষের মানসিকতার সঙ্গে দিলীপ বসু অনেক বেশি একাত্ম হতে পেরেছে। কোল ইণ্ডিয়া অ্যাকাউন্টসে কাজ করতে গিয়ে এই ধরনের অনেক মানুষের সঙ্গেই ওঠাবসা করতে হয়েছে, তখনই হয়তো জীবিত কালু ঘোষের মানসিকতার প্রতি একটি সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি হয়েছিল যা কালক্রমে মনের অবচেতন অংশে স্থান পেয়েছিল। নিঃসঙ্গ-হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন দিলীপের মধ্যে বন্ধু পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে তখন তার মনের অবচেতন অংশের উক্ত ধারণার দ্বারা আবির্ভূত হয় কালু ঘোষ। মজার ব্যাপার হলো, এই দু'জন মানুষেরই মৃত্যু হয় নকশাল বিপ্লবী রবির হাতে।

ইতোমধ্যে সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় অনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে ঝামেলা, চাকরি থেকে সাসপেন্ড হওয়া, ঘটনাচক্রে হত্যার অপরাধে জড়িয়ে যাওয়া— পালানো-আত্মসমর্পণ-মামলা-

শেষে ডাক্তারের রিপোর্টের সাহায্যে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া। অবশ্য ততোদিনে দিলীপ বসু চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে। কিন্তু এই সব ঘটনাপ্রবাহ খুব বেশি আঘাত দিতে পারেনি দিলীপ বসুকে। দাম্পত্য একঘেয়েমি সত্ত্বেও সে তার পূর্বতন স্ত্রী রাণীর (বর্তমানে প্রবোধের স্ত্রী) কাছে ছুটে আসে একটু আশ্রয় পেতে। কিন্তু রাণীর গর্ভে প্রবোধের সন্তান, ফিরে আসার প্রস্তাবে রাণীর প্রত্যাখান ইত্যাদি দিলীপ বসুকে আর একবার ভেঙে পড়তে সাহায্য করে। এই ভাঙা মন নিয়েই অবশেষে সে হাজির হয় কালু ঘোষের জন্মভূমি গ্রামে। সঙ্গে রবির ছেলে খোকন। তিরিশ বছর সময়ের ব্যবধানে গ্রামের লোকেরা দিলীপ বসুকেই কালু ঘোষ বলে ধরে নেয়। কালু ঘোষের গ্রামের পরিবেশ, কালুর ভাঙা বসতবাড়ি , মজা পুকুর, আমবাগান, গ্রামের পতিত জমি ইত্যাদি দেখে দিলীপের মধ্যে আরও একবার জেগে ওঠে নিজের মত নতুন করে বানানোর তীব্র ইচ্ছা। বানানোর এই ইচ্ছাশক্তিই দিলীপ বসুকে পুনর্বার দাঁড় করাতে সাহায্য করে। এই পর্বে দিলীপ বসু হয়ে যায় একেবারে 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসের অনাথবন্ধু বসু। কৃষিকাজে একেবারে জড়িয়ে পড়ে একদা এক নম্বর শহুরে দিলীপ বসু। যারা বানানোর আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতে চায়, তাদের কাছে বিষয় বা ক্ষেত্র গৌণ। দিলীপ বসুই সেটার জ্বলন্ত উদাহরণ। ঘটনাপ্রবাহে দিলীপের নকশাল-বিপ্লবী ছেলে রবি হাজির হয় কালু ঘোষের গ্রামে। রবির মতে তার বাবাও একজন শ্রেণিশত্রু। আর শ্রেণিশত্রুদের খতম করাই তাদের (নকশাল- বিপ্লবীদের) কাজ। পিতা-পুত্রের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তা-ভাবনা নিয়ে বাদানুবাদ হয়। শেষপর্যন্ত রবির হাতে খুন হয় তার বাবা দিলীপ বসু। লেখক বিশ্বাস করেন, মানুষকে খুন করা যেতে পারে। কিন্তু মানুষের স্মৃতিকে কখনও খুন করা বা নিশ্চিহ্ন করা যায় না। স্মৃতিতে থেকে যায় মানুষের নানান চিন্তা-ভাবনা, সৃজনশীল খেয়াল ইত্যাদি। তাই এই মৃত্যু দিলীপের পরাজয় হিসাবে আসে না বরং সে যে বারবার ভেঙে পড়েও বারবার উঠে দাঁড়িয়েছে— নিজের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার জন্য জীবনকেই বেছে নিয়েছেন, মানুষকে খতম করার পদ্ধতি গ্রহণ করেনি— এখানেই মানবসভ্যতার চাকায় যেন দিলীপ বসু নিজের অস্তিত্ব জাহির করেছে। সৃজনী কল্পনাশক্তির সাহায্যেই মানবসভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে অনাদিকাল থেকে। আর যেখানে ভূমিকা থাকে দিলীপ বসুর মত কিছু মানুষদের।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনকে দেখেছেন নানাভাবে। এই দেখতে চাওয়ার ইচ্ছেগুলোই ধরা দিয়েছে সাহিত্যে নানারূপে। আসলে জীবনকে ভেঙেচুরে দেখার নামই সাহিত্য। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও এরকম জীবনকে দেখি যেখানে কিছু কিছু চরিত্র জটিলতার মধ্যেও জীবনকে চালনা করেছে

শেষপর্যন্ত নিজের ইচ্ছার অদম্য সাহসে। যেখানে টিকে থাকার জন্য বেছে নিতে হয় অপ্রিয় কঠিন কিছু সিদ্ধান্ত। এমনই একটি চরিত্র 'শেষ বিকেলের আলো' উপন্যাসের নায়িকা রূপা। স্বামী সুশান্তের সঙ্গে সচ্ছলভাবে ছিল রূপা। তারপর ধীরে ধীরে সুশান্তর শারীরিক অবস্থার অবনতি এবং অকাল প্রয়াণ রূপাকে সম্মুখীন করালো অন্য এক বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে। বর্তমানে সে একজন যুবতী বিধবা ও এক সন্তানের মা। তাই বর্তমান অবস্থার চেয়েও 'কত বড় জীবন সামনে পড়ে আছে' এই নিয়েই এখন রূপা মা হিসাবে বেশি চিন্তিত। আসলে যেখানে নিজেদের অবস্থাই টালমাটাল সেখানে সহানুভূতির চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ব পায় ভবিষ্যৎ-চিন্তা। রূপার জীবনে শুরু হয় অন্য এক লড়াই যা তার নিজের সঙ্গে, নিজেকে টিকিয়ে রাখতে। অসহায় অবস্থায় নিজের বাপের বাড়িতে ফিরে আসার পর তাকে তারই দাদার মুখে শুনতে হয় ''তোর হুট করে আসাটাই অন্যায় হয়েছে। কোম্পানি কলোনিতে থাকলে ওদের সেলসেই তোর একটা চাকরি হয়ে যেত।''[৩২] দাদার এ সুর তো যত্নের নয়, বরং দায়িত্ব এড়ানোর কিংবা অন্যের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপানোর। তাই দেবর সনৎ-এর সামনে রূপার নিজেকে 'ভীষণ অপরিষ্কার লাগে'। কীভাবে দাদা নিমাইচাঁদ যুবতী বিধবা বোনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সনতের কোয়ার্টার-এ তাকে থাকার জন্য বলতে থাকে? কিন্তু এরপরও সামলে ওঠার নামই জীবন। সনতের রূপার প্রতি ভালোবাসা রূপাকে আরও অসহায় করে তোলে। তাই মনকে আরও শক্ত করে সে উপলব্ধি করলো, এই লড়াই তার একার। তাই নিজেকে নিজেরই উৎসাহ, প্রেরণা, সাহস ইত্যাদি জোগাতে হবে। এভাবেই আত্ম-অনুপ্রাণিত হবার কৌশল জীবনের প্রতিকূলতা গ্রহণে রূপার মনকে প্রস্তুত করে। এই জীবনে উঠে দাঁড়ানো যে কত কঠিন তা রূপা বুঝেছিল। কিন্তু মনের তীব্র সাহসে সে এগিয়ে চলে সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে। রূপা বেঁচে উঠতে চায় সমস্ত বন্ধনকে উপেক্ষা করে। তাই শেষপর্যন্ত সে বেছে নেয় ছেলেকে। জীবনে স্বামী না থাকলে কোনও মেয়ে যে অসহায় হয়ে যায় না, একথা সে বুঝিয়ে দেয় সনৎকে। বেঁচে থাকা মানে অবলম্বন নয়, টিকে থাকা নিজের স্বাধীনসত্তা নিয়ে। তাই সবার সমস্ত উপদেশ কিংবা আদেশকে উপেক্ষা করে রূপা বাঁচে, নিজে, নিজের মতো করে। সেখানে তার সন্তানের মা সে একা।

খ. উপন্যাসের গৌণ চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি:

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের জগতে প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি অপ্রধান বা গৌণ চরিত্রদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আমরা এখানে গৌণ চরিত্র বলতে পাঠগত আধিপত্য বা

উপস্থিতির সাপেক্ষে মূল্যায়ন করেছি। মূল কাহিনিতে একটি চরিত্রের উপস্থিতি বা কার্যকলাপ অংশের নিরূপণ করে নায়ক বা নায়িকা চরিত্র ব্যতিত অন্যান্য চরিত্রগুলোকে গৌণ চরিত্রের শ্রেণিগত বিভাগে রেখেছি। যেহেতু লেখকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোতে আত্মজৈবনিক উপাদানের ছড়াছড়ি, আর নায়ক-নায়িকা চরিত্রের মধ্যে লেখকের 'অল্টার ইগো'-র প্রকাশ লক্ষ্য করি; তাই প্রধান চরিত্র হিসাবে যেমন আমরা উপন্যাসের একমাত্র নায়ক বা নায়িকা চরিত্রে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি আলোচনা করেছি তেমনি এখানে গৌণ চরিত্র হিসাবে নায়ক চরিত্র ব্যতিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করব যারা হয়তো উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক আলোচনায় প্রধান চরিত্র হিসাবে গণ্য হতেই পারে। এই সব চরিত্ররা কখনও নায়ক চরিত্রে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টিকে পরিপুষ্টি দান করেছেন কখনও বা স্বতন্ত্র জীবনদর্শনের আভাস আমাদের দিয়েছেন।

মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক লড়াই করে। 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে অবিনাশ চৌধুরীকেও লড়াই করতে হয়েছে। জীবনের প্রথমদিকে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা ছিল তার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রায় সবদিক থেকে প্রতিষ্ঠা পাওয়া অবিনাশ জীবনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এসে অনুভব করছে, ''আগে ভাবতাম জীবনে দাঁড়াতে পারব কী। হয়ত এখন পেরেছি। যশ, কিছু অর্থ, আকর্ষণীয় চেহেরা, ভদ্রস্থ কথাবার্তা সবই আয়ত্বে এসেছে। কিন্তু তারপর? এই জীবনের আকর্ষণ কোথায়? এখন সত্যি আমাকে গয়না বাঁধা দিতে যেতে হয় না। বি এ পড়তে ট্যুইশানি করেছি।''[৩৩] এই ধরনের মানুষেরা জীবনের মধ্যর্বতী পর্যায়ে এসে বেঁচে থাকার সেই আগেকার উদ্দীপনা, উৎসাহ, আকর্ষণ হারিয়ে বসে। আসলে জীবনের প্রথম পর্বে যে অপার বিস্ময়, কৌতূহল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল— তা ক্রমশ বয়স, অর্থ, প্রতিপত্তি, যশ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে এক ধরনের উদ্দেশ্যহীনতা, কিছু ভালো না লাগার অনুভূতি ক্রীয়াশীল হয়। নায়ক চরিত্রের মত এরাও নিঃসঙ্গতায় ভোগে। কিন্তু নায়ক চরিত্ররা পুনরায় লড়াই করার বিষয় খুঁজে নেয় বা নতুন কিছু বানানোর আনন্দে মশগুল হয়ে ওঠে। বারবার ভেঙে পড়েও বারবার উঠে দাঁড়ায়। আর অবিনাশের মত মানুষেরা অনেক কিছু করার কথা ভাবলেও পুনরায় অনিশ্চয়তায় ঝাঁপ দিতে ভয় পায়। তাদের ভয় হয় এত দিনের অর্জিত সব কিছু হারাবার। তাই ওদের কাছে স্থবিরতা প্রার্থনীয়। অস্থিরতা, দোলাচলতা থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে। অবশ্য আত্মহত্যার ভাবনা মনে আসলেও তাকে বাস্তবে কার্যকর করতে যে সাহসের দরকার হয়, তাও তাদের মধ্যে থাকে না। আসলে এই জগতের প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে বেঁচে থাকার যে আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে, অবিনাশ চৌধুরী তার ব্যতিক্রম নয়।

তাই কারেন্ট বন্ধ হবার ফলে যখন সে লিফ্‌টে আটকে যায় তখন তার মধ্যে মৃত্যুভয় জাগ্রত হয়, ''কিন্তু এ কোথায় এল? দুই তলার মাঝখানে। বিশাল অফিস-বাড়ির মেঝে কংক্রিটের গাঁথুনি। চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ শুনতে পাবে না। 'আমি অবিনাশ চৌধুরী এখানে মরে যাচ্ছি— আমায় তুলে বের কর তোমরা। আমি তোমাদের কনফিডেনসিয়াল লিখি।' এ কথা বললেও কেউ আসবে না। জানবেই না।''[৩৪] তার আগের দিন রাতের বেলায় সোনেরিলের ফাইল নিয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবে অবিনাশ। কিন্তু আমরা তো জানি—

''তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়— অনুমেয় উষ্ণ
অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের
স্রোত ভালোবাসে।''[৩৫]

স্থবিরতা প্রার্থনীয় হলেও, মৃত্যু-ভাবনা মনে এলেও বেঁচে থাকার প্রতি মানুষের যে আদিমতম অমোঘ অনিবার্য টান তা খুব কম মানুষ অস্বীকার করতে পারে। জীবনের এই সনাতন টানের কথাই অবিনাশ চরিত্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হতে দেখি। অবিনাশ প্রেম করে লিলির সঙ্গে বিয়ে করেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লিলির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় অবিনাশের। কারণ দাম্পত্য সম্পর্কে বিস্ময়, কৌতূহল কমে যাওয়া। বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে জোরালো করে রাখতেই, সে যেন নীলিমার প্রতি জোর করে আকৃষ্ট হতে চায়। প্রমথ ও তার বন্ধুদের সঙ্গে মিশে নিজের মনের শূন্যতাকে কিছুটা ভরাট করতে চায়। আর নস্টালজিয়ায় ভোগা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রদের তো একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনের প্রতি বিস্ময়, টান কমে যাওয়া মানুষদের মধ্যেও যখন মৃত্যু-সম্ভাবনার ক্ষীণ-সূত্র জাগ্রত হয়— সেই মুহূর্তগুলো কেটে যাওয়ার পর চির পুরাতন এই পৃথিবীটাই ভালো লাগে। তাই অবিনাশের এতদিনের চেনা-পরিচিত নিত্য যাতায়াতে অভ্যস্ত অফিস পাড়াকেও সুন্দর লাগে। নিজের বেঁচে থাকার অস্তিত্বে আনন্দ অনুভব করে। আসলে লেখক যেন বলতে চেয়েছেন যে, মানুষের মধ্যে জীবনের প্রতি বিস্ময়, টান, কৌতূহল

কখনও একেবারে শেষ হয়ে যায় না। তাই মানুষ যে কোনও পরিস্থিতিই হোক্ না কেন সে শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকতে চায়। তাই কিছু হবে না জেনেও, কিছু ভালো লাগে না বল্লেও, এই পৃথিবীতে কেউ নিজের অস্তিত্ব কখনোই একেবারে শেষ করতে চায় না। এটাই যেন মানুষের অমোঘ নিয়তি, এটাই যেন পৃথিবীতে প্রাণের দাবি প্রতিষ্ঠা করা, এটাই যেন অনন্ত রহস্যের খনি পৃথিবী, প্রকৃতি, জীবন ও সময়ের মধ্যে ডুবে থেকে রসাস্বাদন করতে চাওয়া, জীবনকে বোঝার চেষ্টা করা। লেখকের এই জীবনদৃষ্টি প্রতিফিলিত হতে দেখি অবিনাশের মত চরিত্রের মধ্যে।

কতিপয় মানুষ আবার কিছু বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। যার মধ্যে তারা এই পৃথিবী থেকে একদিন সবকিছু ফেলে চলে যেতে হবে— এই অনিবার্য নিয়তির মধ্যে যে যন্ত্রণা, ভয়, হাহাকার, নিঃসীম শূন্যতা রয়েছে; তার মধ্যেও আশার আলো বপন করে। অনেকটা জীবন-মৃত্যুর ঘূর্ণায়মান সম্পর্কে ভিত্তিভূমি দেবার চেষ্টা। যেমন 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসে নেপেনদা অনিলকে বলেছে, ''খুব একটা অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিম্নশ্রেণীর ধর্ম চাই আমাদের। যার মধ্যে ঢুকলে আর বেরোতে পারব না। কি বলিস তুই? তখন আর কোনও ভয়ই ঢুকবার পথ পাবে না, এই যেমন ধর টাকা জমাবার ধর্ম, পরনিন্দার ধর্ম, কিংবা যে-কোনও একটা অন্ধ বিশ্বাস, সে তুই যা-ইচ্ছে নাম দে—''[৩৬] এখানে নেপেন তার নিজস্ব ভাবনার কথাই তুলে ধরছে। যে কোনও ভাবে বেঁচে থাকার উদ্দীপনা, উৎসাহ জিইয়ে রাখার কৌশল হলো নেপেনের এই বিশ্বাস। নিজের মায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে নেপেন একদিন বিকেলে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ খুলে বসে। বিবেকানন্দের বই নেপেনের অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসে নেপের কাহিনি দেখলে বোঝা যায় একসময় অনেক কিছু করে (পৃথিবী-বিখ্যাত বিভিন্ন হোটেলে কাজ করেছে) শেষ বয়সে জীবনের প্রতি সেই টান অনুভব করছিল না। অনেকটা অবিনাশের মত। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল কিছু করার— এক্ষেত্রে নেপেন একটি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে যা তাকে জীবনের পথে আবর্তিত হতে সাহায্য করেছে। আসলে মানুষ তার স্বভাব-চরিত্র-মানসিকতা অনুযায়ী শেষপর্যন্ত কিন্তু সেই জীবনের পথেই আবর্তিত হয়; এই জীবনদর্শনের স্পষ্ট প্রতিফলিত রূপ নেপেন।

'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসের ব্রজ ফকির চরিত্র আমাদের এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে সহজেই আলোচনা করা যেতে পারত। কিন্তু সেই অংশে আমরা শুধুমাত্র নায়ক চরিত্রের ওপর আলোকপাত করেছি জন্য এই অংশে ব্রজ ফকিরের ওপর প্রতিফলিত জীবন-দর্শন আলোচনা করব। এই উপন্যাসে ব্রজ ফকির নায়ক চরিত্র কুবেরের ওপর প্রতিফলিত জীবন-দর্শনকেই পুষ্টি দান করেছে,

তবে ভিন্ন পথে গিয়ে। আর সেটা স্বাভাবিক, কারণ দু'জন স্বতন্ত্র মানুষ। ব্রজ ফকিরের পুরো নাম ব্রজ দত্ত। কাহিনির শুরু থেকেই আমরা তাকে অনিশ্চিত জীবন-যাপন কাটাতে দেখি। কুবেরের মুখে শুনি, ব্রজ দত্ত জায়গাজমি ছেড়ে এসে এই ধরনের ফকিরি জীবন বেছে নিয়েছে। তিনটে বিয়ে এবং পেটের ভাত জোগাড়ের জন্য নানান ধরনের ছোট-খাটো কাজ অনবরত করেছে। অবশ্য এই সব কাজের ভিত্তিভূমিতে রয়েছে ছল-চাতুরির কৌশল। বারবার বিয়েতে বসলেও নারীর প্রতি বিশেষ কোনও টান ব্রজ দত্তের মধ্যে দেখি না। এমনকি সন্তান-সংসার করার প্রতি বিশেষ কোনও আগ্রহ তার মধ্যে অনুভব করি না। বরং কুবেরের মত বারবার জীবনকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলতে ব্রজ দত্তের যেন জুড়ি নেই। এভাবেই যেন সে জীবনের রসাস্বাদন করতে পারছিল। ব্রজ ফকির কুবেরকে জানায়, ''তুই একজন কনটেমপোরারি আর্টিস্ট। সত্যি কী না বল? তুই এ-যুগে বাস করছিস— যুগের সঙ্গে জড়িয়ে আছিস— তোর এভরি রাইট আছে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দেবার। ক'জন তোর আমার মাতো সাফার করছে বল? ক'জন তোর আমার মতো টাইমকে নিঙড়ে নিয়ে সেকেন্ড, মিনিট একটুও ফাঁকি না দিয়ে সব সময় ফিল করছে?''[৩৭] হ্যাঁ, সময় ও জীবন এভাবেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যারা সময়কে নিঙড়ে অনুভব করতে পারে, তারাই জীবনের প্রকৃত রসাস্বাদন করতে পারে। আর কুবের ও ব্রজ ফকির অনিশ্চিত সময়ের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে জীবনকে মুহূর্ত ধরে উপলব্ধি করেছে। তবে অনেক সময় আভার মত আমাদেরও মনে হয় ব্রজ দত্ত নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না। কিন্তু এই বিষয়টি আর একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখব, এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ শেষপর্যন্ত নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। ফলে ব্রজ ফকিরের এই স্বার্থপরতাও কিন্তু জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকে জীবনের পথে আবর্তনকেই ইঙ্গিত করে। অবশ্য ব্রজ দত্ত তার জীবনের শেষ পর্বে একটি নিশ্চিত জীবনযাত্রাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। এখানেই কিছুটা পার্থক্যের সূচনা হয় কুবের ও ব্রজের জীবনযাত্রায়। একটি পাথরকে রেলেশ্বর শিব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে, তাকে কেন্দ্র করে মন্দির তৈরি করতে চেয়ে এবং নিজেই সেই মন্দিরের স্থায়ী সেবাইত হিসাবে একটা স্থির জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা আমরা ব্রজ দত্তের মধ্যে দেখতে পাই। এই পন্থা ব্রজ দত্তের পূর্বের গৃহীত জীবন-কৌশল থেকে পৃথক। হয়তো ব্রজ ফকির জীবনের শেষ পর্বে এসে জীবনের অনিশ্চিত যাত্রা থেকে সাময়িক বা স্থায়ী বিরতি চেয়েছিল। তবে এই পর্বেও নানান বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। যেমন, সাহেব মিত্তিরের সঙ্গে বিরোধীতা, রেলেশ্বর শিব নামক পাথরটির হারিয়ে যাওয়া, আভার নিরুদ্দেশ হওয়া ইত্যাদি। তবু ব্রজ দত্ত ভেঙে পড়েনি। বরং একটি স্থায়ী নিশ্চিত জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষায় রেলেশ্বর

শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হবেই, এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছিল। তবে ব্রজ ফকির তার জীবনে যা কিছু করেছে তা একটি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে না রাখতে পারলে, তার মস্তিষ্ক বিকারের সম্ভাবনা প্রবল ছিলো। আর এই রকম কোনও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরাই আমাদের জীবনের পথে আবর্তিত হতে সাহায্য করে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, যারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, তারাও তো এক ধরনের বিশ্বাসের ফলেই সেই পথ বেছে নেয়। এখানে কিন্তু আমরা 'আঁকড়ে ধরা' এই দু'টো শব্দের ওপর জোর দিচ্ছি। কারণ মনে হয় যারা আত্মহত্যাপ্রবণ হয় তারা কোনও রকম বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না। বা যখন তারা আত্মহত্যা করে, তখন আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছার উদ্‌ভাস তাদের মধ্যে ঘটে যা স্থায়ী আসন পাবার আগেই আত্মহত্যা সংঘটিত হয়। জীবনের প্রতি বিস্ময়, কৌতূহল কমে গেলে কখনও কখনও এই উদ্‌ভাস ঘটে। যেমন 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে অবিনাশের ক্ষেত্রে হয়েছিল। কিন্তু কিছুটা সময় অতিক্রান্ত করলে, কোনও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে পারলে আত্মহত্যার ইচ্ছার উদ্‌ভাস বিলীন হয়ে যেতে পারে। এই পৃথিবী অনন্ত রহস্যে, বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাই এই ধরনের কিছু মানুষও পৃথিবীতে বর্তমান। তাদের কোনও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে না রাখতে পারার বিষয়টি লেখককে ভাবায়। তাই শ্যামলের ওপরের ভাই যখন কুড়ি বছর বয়সে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে— এই ঘটনা লেখককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফলে লেখকের অনেক উপন্যাসেই এই ঘটনা রূপ বদলে হাজির হয়। শ্যামলের সৃষ্ট জগতে জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বৈচিত্র্যই প্রতিফলিত হয়। কারণ লেখকের জীবনদৃষ্টি জীবন-বৈচিত্র্যকেই প্রতিফলিত করে।

ব্রজ দত্তর মত 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে অনিল দত্ত একজন আত্মসুখপরায়ণ চরিত্র। আবার 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের অবিনাশ চৌধুরী একদা কাজ-পাগল মানুষ ছিলেন। অবশ্য অনিল, অবিনাশ-এর মত চরিত্র যারা অনেক ক্ষেত্রেই নায়ক চরিত্র যার মধ্যে লেখকের 'অল্টার ইগো'র প্রতিফলন দেখতে পাই, সেই নায়ক চরিত্রের তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পালন করেছে। যেমন, 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে অনিল দত্ত। কর্মজীবনের শেষের দিকে এসে তাদের মধ্যে যেন জড়তা বাসা বাঁধে। তারা জড়তাকে যুক্তিযুক্ত করতে চায় কোনও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেই, ''জানো নিবারণ, জীবনটা একটা সার্কেল। যেখানে যা করবে— যেখানে যেটুকু পাপ হবে— তার রিটার্ন ঠিক সার্কেলের এক জায়গায় তোমার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকবে।''[৩৮] এই ধরনের বিশ্বাসকে আমরা অন্ধবিশ্বাস বা যে কোনও ধরনের বিশ্বাস বলি না কেন, তা আমাদের জীবনের কর্মময়তাকেই ভিত্তিভূমি প্রদান করে। অনিল দত্ত কর্মজীবনের

বেশিরভাগ সময়টা কাজ নিয়েই ডুবে ছিল। একটি ডুবন্ত কোম্পানিকে প্রায় নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই কাজের মধ্যে ডুবে থাকার ফলেই হয়তো দাম্পত্য সম্পর্কের উষ্ণতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। তাই কোম্পানি যখন একটি সচ্ছল আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেছে তখন অনিল দত্তের কর্মজীবনের উদ্দীপনা কমে আসতে থাকে। এরা সৃজনশীলতার নতুন কোনও ক্ষেত্র বেছে নিতে পারে না। কোনও কিছু নতুন তৈরি করার ভাবনার শূন্যস্থান ভরাট করে নস্টালজিয়া। আর আমরা তো জানি কিছু বেদনা, গ্লানি মানুষ আজীবন বয়ে বেড়ায়। স্মৃতিচারণে ফুটে ওঠে সেই সব পুরানো বেদনা, গ্লানি। অনিল দত্তের জীবনেও আমরা সেটা খুঁজে পাই, ''... জানো নিবারণ আমি খাঁটি মফস্বলের ছেলে। একবার ফাইভ সিক্সে সরস্বতী পুজোর ভোরে ফুল চুরি করতে গিয়েছিলাম। এস ডি ও-র বাংলোয়। শেষরাতে থোকা থোকা গাদা ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি কোঁচড়ে ফেলছি— এমন সময় সপাং করে পিঠে চাবুক পড়ল। ভোর রাতে ফিরে তাকিয়ে দেখি এস-ডি-ও-র বেণী বাগানো মেয়ে— হাতে চাবুক। সে যে কি দীনতা— সে যে কি অপমান—''[৩৯] এরপর অনিল দত্তের স্বীকারোক্তি, সে কোনও দিনও আর প্রেম পাইনি। প্রেমের জন্য তৃষ্ণার্ত মন নিয়ে এদিক-ওদিক ছোটা-ছুটি করলেও একটা বড় শূন্য ছাড়া কিছু পায়নি। এই বিষয়টি অবিনাশের জীবনে বড় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। এই গ্লানি সারাজীবন বয়ে বেড়ালেও কর্মজীবনের শেষের দিকে অনিল দত্ত আরও বেশি করে অনুভব করেছে। তবে এই নস্টালজিয়াও জীবনের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি করে। জীবনের প্রতি মায়া থেকেই জীবনে প্রাপ্ত গ্লানি, বেদনা স্মৃতির দুয়ার ধরে তিরতির করে কাঁপে। মনে পড়ে কবির সেই বিখ্যাত লাইন,

''... কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদোনাকো ধান সিড়ি নদীটির পাশে।''[৩০]

কর্মজীবনের শেষের দিকে অনিল দত্তের কাছে মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে ভালোবাসার অন্বেষণ। আর এই অন্বেষণকেই আমরা বলতে পারি জীবনের পথে আবর্তিত হওয়া। নিবারণের মত অনিলও উপলব্ধি করে, জীবনকে আস্বাদ্যময় করতে ভালোবাসা ছাড়া আর কোনও কিছুর গুরুত্ব নেই। লতার প্রতি অনিলের আকর্ষণ তো তাই বেঁচে থাকার উদ্দীপনা বজায় রাখা। এভাবেই মানুষ তার স্বভাব-চরিত্র-মানসিকতা অনুযায়ী জীবনের পথে আবর্তিত হয়।

একটি মানুষ ভালো আঁকতে পারত, গান লিখতে পারত; কিন্তু সে পথে আর এগোল না। বাঁধা বেতনের চাকরিতে ঢুকল, কিন্তু সেখানেও নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে, চাকরি ছাড়ল। তখন স্ত্রী রজনীকে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়তে হলো অভিনয় জগতের সঙ্গে। কারণ ছোট ছোট সন্তানসহ সংসার চালানোর ক্ষেত্রে পরিবারের সেটাই এক ও একমাত্র আয়ের রাস্তা। নিজের অভিনেত্রী স্ত্রী রজনীকে নিয়ে নতুন দল তৈরি করে নাটক মঞ্চস্থ করল। টাকা-পয়সার হিসাব দেখার দায়িত্বে স্বয়ং সেই মানুষটি। উদ্দেশ্য সংসারের আয়কে আরও সচ্ছল করে তোলা। দিনের পর দিন হাউসফুল সেই নাটক সফলতার নতুন অধ্যায় সূচনা করল, কিন্তু টাকার হিসাবে দেনার ক্রমবর্ধমান রূপ সামনে আসতে থাকল। আমরা 'সেই মানুষটি' বলতে 'অদ্য শেষ রজনী' উপন্যাসের শশাঙ্ক দত্তের কথা বলছি। এক্ষেত্রে একজন মানুষের অর্থাৎ শশাঙ্ক দত্তের বেঁচে থাকার উদ্দীপনা-উৎসাহ কী হতে পারে? শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা বৈচিত্র্যময় জীবনের এক বৈচিত্র্যময় উদাহরণ হলো এই শশাঙ্ক দত্ত। যে বেঁচে থাকার জন্য কাজে লাগায় নিজের স্ত্রীর প্রতি ক্ষোভ, ঘৃণা, হিংসা ইত্যাদি অনুভূতিগুলোকে। অবশ্য এই অনুভূতিগুলোর পেছনে লুকিয়ে থাকে এক প্রকার হীনমন্যতাবোধ ও আত্মগ্লানি। মানুষ যে শুধু সৃজনশীলতার আনন্দ পায়, তা নয়; প্রতিশোধস্পৃহাও মানুষকে আনন্দ দেয়। আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাচক মানসিকতাকে অবলম্বন করেও জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। তবে এই অগ্রসরতা কি মানসিক স্বস্তি এনে দিতে পারে? তা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও এক ধরনের আনন্দ মানুষ অনুভব করতে পারে।

শিল্পী শশাঙ্ক দত্তের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হয় তৎকালীন প্রখ্যাত অভিনেত্রী নীহারের মেয়ে রজনীর সঙ্গে যে নিজেও ছোটবেলা থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কালক্রমে শশাঙ্ক তার নিজের শিল্পীসত্তার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। বিশ্বাস হারানো মন প্রসব করে একরাশ বিরক্তি, অসন্তুষ্টি। ফলে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না বাঁধা-ধরা চাকরির নিয়মে। অন্যদিকে সংসার চালানোর অতিরিক্ত দায়িত্ব একার কাঁধে নিয়ে রজনীকে আরও জড়িয়ে যেতে হয় থিয়েটারের সঙ্গে। রজনীর এই সক্রিয়তাই যেন শশাঙ্কের নিষ্ক্রিয়তার যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তোলে। সবদিক থেকে ব্যর্থ শশাঙ্কের তখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় নিজের স্ত্রী রজনীকে অপদস্ত, অপমানিত করার প্রচেষ্টা। যে অর্থ রোজগারের জন্য সংসারকে সেভাবে সময় দিতে পারত না রজনী— সেই অর্থ হাতিয়ে নেবার নানান ষড়যন্ত্র। এভাবেই যেন শশাঙ্ক নিজের অকর্মণ্যতার যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়।

এক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্য শশাঙ্ককে আরও উৎসাহিত করে তোলে। এতদিনে যেন সে জীবনের

উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে। রজনীকে ঠকানোর ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস জন্ম নেয়। আমরা আগেই বলেছি, বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য ছাড়া বেঁচে থাকার আনন্দ উপলব্ধি করা যায় না। জড়তা এসে আমাদের বেঁচে থাকার সমস্ত অনুভূতিকে বিস্বাদ করতে থাকে। তাই রজনীর বিরুদ্ধে বা রজনী সংশ্লিষ্ট 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারের বিরুদ্ধে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ তথাকথিত নেতিবাচক হলেও এক ধরনের 'Pleasure' সৃষ্টি করে শশাঙ্কের মনে যা তাকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়, জীবনের পথে আবর্তিত হতে সাহায্য করে। শশাঙ্ক জানে, লড়াই করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। সৎভাবে অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা না থাকতে পারে কিন্তু রজনীকে নানান ভাবে ঠকিয়ে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে ফেলে। যদিও এই অর্থ সংগ্রহের পেছনে শশাঙ্ক উদ্দেশ্য হিসাবে জানায় সন্তানের জন্য ভবিষ্যতকে নিরাপদ সুরক্ষিত করা। যদিও এই উদ্দেশ্য আমাদের কাছে দুর্বল লাগে কারণ ছেলে সন্তুকে খাতা-কলমের ব্যবসার জন্য জমানো লক্ষাধিক টাকা থেকে মাত্র তিনশো টাকা দিতে রাজি হয় না শশাঙ্ক। আর তাছাড়া রজনীও সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সচেতন ও সতর্ক ছিল। যে অর্থ অবলম্বন করে শশাঙ্ক লড়াইয়ে নেমেছে যখন ছেলে সন্তুর নজর সেই অর্থে পড়ে, দু'জনই মুহূর্তে চলে যায় আদিম পৃথিবীতে। যে পৃথিবীতে মানুষের অনুভূতিগুলো (রাগ, ভালোবাসা, হিংসা ইত্যাদি) ছিল অনেক বেশি প্রকট ও প্রকাশ্য। সেখানে লড়াই ও মৃত্যু হাত ধরাধরি করে চলত। দু'জনের (শশাঙ্ক ও সন্তু) কাছেই এই লড়াই দু'জনের দিক থেকেই নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। যেমন শশাঙ্ক জানত এই অর্থের কথা যদি রজনী জানতে পারে বা সন্তু হাতিয়ে নেয়, তাহলে তার লড়াইয়ের প্রচেষ্টা মাঝমাঠেই মৃত্যু বরণ করবে। তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাই এই আদিমতা, হিংস্রতা। কাহিনির শেষে শশাঙ্ক হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকে, তখন লেখক জানায়, ''শশাঙ্ক তখন চোখ বুজে নিজের বুকের ভেতরে নেমে পড়ে অন্ধকারে একটা লড়াই লড়ছিল। একা একা। স্থির হয়েও আসছিল একটু একটু করে।''[৪১] এই লড়াইটাই তাকে জীবনের পথে ধরে রাখতে সাহায্য করেছিল।

একজন দরবেশ মানুষ যিনি সংসার জীবনে প্রবেশ করেনি, প্রায় যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত, সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে সেভাবে কোনোদিন সম্পর্কই সাধিত হয়নি, জঙ্গলে একঘরে একটি পরিবারে জন্ম— বড় হয়ে ওঠা, মা-বাবার অকাল মৃত্যু, তারপর নানান গুপ্ত সাধন প্রক্রিয়ায় নিজেকে জড়ানো; এরকম একজন মানুষের জীবনে লড়াই কী রকম হতে পারে? তার জীবনে ভালোবাসার স্বরূপই বা কি? বেঁচে থাকার স্বাদ তিনি কোথা থেকে পান? কিংবা উৎসাহ-উদ্দীপনা-বিস্ময়-কৌতূহল যা আমাদের জীবনকে পুষ্টি জোগায়, একজন দরবেশের জীবনে তার উৎস কোথায়? এই সব প্রশ্নের

উত্তরের খোঁজে আমাদের দারস্থ হতে হয় 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসের মহম্মদ বাজিকর চরিত্রের কাছে। সে তন্ত্রসাধনায় জড়িয়ে গেলেও পরবর্তীকালে আর সেভাবে চর্চা করেনি। তবে জঙ্গলে বড় হয়ে ওঠার ফলে জঙ্গলের গাছ, পাতা, শেকড় ইত্যাদি তার গুণাগুণসহ জানে। সাপ ধরার ক্ষেত্রেও ওস্তাদ তিনি। বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা ছাড়া সেভাবে কোনও পার্থিব প্রয়োজন কোনও দিন অনুভব করেনি মহম্মদ বাজিকর। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা আমরা দেখি বাজিকরের মধ্যে। এজন্যই গাছপালার ঔষধি জ্ঞান অর্জন করা বা তার ওপর নজর রাখা সাপকে ক্ষেত থেকে ধরে এনে খাঁচায় পোরা। জগেন পাগলা প্রসঙ্গে বাজিকর অনাথকে বলে, ''দেখুন বসুমশায়, স্মৃতি হারিয়ে মানুষ পাগল হয়, হাবা হয়, বোবা হয়। কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর ইচ্ছে হারায় না। সে ইচ্ছে সর্ব অবস্থায় জেগে থাকে।''[৪২] এটাই তো প্রাণের আদি বৈশিষ্ট্য। তাই যাযাবর দরবেশের জীবন যাপনেও বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রবাহমান। আর যেখানে ইচ্ছার উপস্থিতি সেখানে লড়াইও বর্তমান। কারণ বেঁচে থাকার ইচ্ছা বিরুদ্ধ-পরিবেশ ছাড়া অগ্রসর হতে পারে না। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম।

মহম্মদ বাজিকর বাওড়ের জলে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করে ওষ্ঠকে। নিরাশ্রয় সর্বস্ব হারানো জগেন পাগলাকে আশ্রয় দেয়। অন্যের জীবনের কদর জীবনের প্রতি ভালোবাসাকেই চিহ্নিত করে। আবার এই বাজিকরমশাই অনাথের মাথায় নিজস্ব কিছু তৈরি করার আইডিয়া দেয়, ''আপনি আমার চেয়ে অনেক পরে দুনিয়ায় এসেছেন। এখনও আপনার সময় আছে। আপনার নিজের কোনো জিনিস তৈরি করতে ইচ্ছে করে না? আমার তো সে বয়স আর নেই।''[৪৩] অর্থাৎ তৈরি করার আনন্দের মধ্য দিয়ে জীবনকে যে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়— এই জ্ঞান বাজিকরের ছিল। আর অনাথকে মাধ্যম করে হয়তো নিজের বহুদিনের অতৃপ্ত সাধের পরোক্ষ আস্বাদ পেতে চেয়েছে বাজিকর। জীবনের প্রতি বিস্ময়-কৌতূহল থেকেই এটা সম্ভব। আমরা এখানে 'জীবন' বলতে পারলৌকিক নয়, ঐহ্যিক জীবনের কথা বলছি। ঈশ্বরীতলার মায়ায় পড়ে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে শেষপর্যন্ত এখানেই থিতু হয় মহম্মদ বাজিকর। স্মৃতিবিভ্রম হবার পর জগেন যাত্রাকে আশ্রয় দিয়ে তাকে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান তো আসলে নিজের মত করে তৈরি করা যা হয়তো তাকে নিজস্ব কিছু তৈরি করার আনন্দ দেয়। ঈশ্বরীতলার মায়ার মধ্যে জগেন যাত্রাও একটি অন্যতম বিষয়। বেঁচে থাকার এই স্বাদ বাজিকরকে ঈশ্বরীতলায় থিতু হতে সাহায্য করে। একটি জীবন তৈরির মধ্য দিয়ে জীবনের পথে আবর্তিত হতে সাহায্য করে।

একজন মানুষের যদি ইচ্ছে মরে যায়, জীবনে অবাক হবার মত যদি কিছু না পায়, পৃথিবীটা যদি হয়ে যায় বাসি রুটি; তাহলে তার জীবন কেমন হতে পারে? সেই জীবন যেন বাজে-পোড়া মরা

সুপুরি গাছ। ঝড়ের সময় বিনা বাধায় ঝরে পড়ে। খগেনের কথায় এভাবেই 'স্বর্গের আগের স্টেশন' উপন্যাসের বিজন বসু মুখ থুবড়ে পড়ে। বিজন খগেনকে দেখাতে চেয়েছিল সত্যি তার কোনও ইচ্ছা নেই। বিজনের ঈশ্বরীতলায় আসার কারণ দুটো চিঠি। একটি বৌদি সিদ্ধেশ্বরীর, আর একটি স্ত্রী শিবানীর চিঠি। বৌদির চিঠিতে খগেন ও শিবানীকে নিয়ে আশঙ্কার কথা অন্যটিতে খগেন সম্পর্কে মুগ্ধতার কথা। তাহলে সত্যিই কি বিজনের সব ইচ্ছার মৃত্যু ঘটেছে? খগেন বলে, ''... সবাই আজকাল বলে ইচ্ছে নেই! আসলে ষোল আনা ইচ্ছে আছে সবার। মনোমতো সময়মতো সুযোগ আসে না তো— তাই।"[৪৪] যেমন একটা সময় এই খগেনই বিপিনবাবুকে বলেছিল ইচ্ছে না থাকার কথা। কিন্তু বিপিনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হবার পরেই তার সাধপূরণের কথা মাথায় আসে— জেগে ওঠে নানান সুপ্ত ইচ্ছা। আসলে লেখক যেন এখানে কোনও মানুষের আংশিক ইচ্ছার মৃত্যু ঘটতে পারে, সেটাই বিজনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এতে বেঁচে থাকার সামগ্রিক ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু কখনোই একেবারে নিঃশেষ করতে পারে না। না হলে কেনই বা দু'টো চিঠির আশঙ্কা ও প্রশংসার কথা শুনে বিজন শহর থেকে ছুটে আসবে ঈশ্বরীতলা গ্রামে। যেন এক অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে সে গ্রামে এসে দাদার বাড়িতে প্রবেশ না করেই ছুটে যায় খগেনকে দেখতে। খগেনের কাছে বারবার জানতে চায়, সে ঠিকভাবে পড়তে পেরেছে কিনা। বিজন রাতে খাওয়া প্রচুর বিলিতি মদ রোজ সকালে বুকডন দিয়ে ঘামের মাধ্যমে ঝরিয়ে ফেলে।

আসলে বিজন এখানে দিক-হারানো ছেলে। সময়ের স্রোতে কিছু ইচ্ছার মৃত্যু ঘটেছে নিশ্চয় এবং নতুন করে ইচ্ছা জাগাতে পারেনি বা ইচ্ছার মধ্যে তেমন শক্তির সঞ্চার করতে পারেনি কিন্তু প্রাণের আদিমতম বৈশিষ্ট্য বেঁচে থাকার ইচ্ছার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। খগেন বিজনকে বলে, ''... তোমার মতো একটি সাপ আছে এখানে। তিনি আজি দু'মাস ধরে আমায় লেজে খেলাচ্ছে। গাছের, ঘাসের, আলোর, পোড়ো ইটের রঙে গায়ের রঙ মিলিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। দেখা দেয়— আবার ডুবে যায়। কিছুতেই ধরা যায় না।"[৪৫] বিজন যেন এই সাপের মত ধরা দিতে না চাওয়া মানুষ যে ভিড়ের ভেতর ভিড় হয়ে মিশে যেতে চায়, আলাদা করে চিহ্নিত হতে চায় না। এটাও তো এক ধরনের লড়াই— ব্যক্তি জীবনকে অসংখ্য জীবনের মাঝে মিশিয়ে দেবার লড়াই। তবে নারীকে দখলে রাখার ইচ্ছা (শিবানীর প্রতি) সেভাবে আর নেই। তবে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেলে পুনরায় তা জাগবে না, তা বলা যায় না। কারণ খগেনকে দেখে জেলাস হওয়া, শিবানীকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে চাওয়া, সেটা তারই ইঙ্গিত বহন করে। তবে এই ইচ্ছাগুলো শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, বিজনের আচমকাই নাক

ডাকার মধ্য দিয়ে তা বোঝা যায়। তবে কিছু ইচ্ছা আছে হয়তো যার জন্য সে প্রতিবাদী আচরণ করে দাদা বিপিন বসুর বিরোধিতা করে। সেরকম একটি ইচ্ছা মাদা মেছো কেউটেকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া। এই বিষয়ে দাদার সঙ্গে তর্ক, দাদার বাড়িতে রাত পার হলেই চলে যাবার সিদ্ধান্ত এবং শেষপর্যন্ত চলে যাবার সময় মাদা কেউটেকে খাঁচা থেকে মুক্তি দেওয়া। বিজনের হয়তো ইচ্ছে মাদা কেউটেকে ধরে না রেখে মাদী কেউটে ধরার ক্ষমতা গুণিন খগেনের আছে কিনা তা দেখার বা মাদী কেউটেটা যাতে ধরা না পড়ে তার জন্য মাদাকে ছেড়ে দেওয়া কিংবা মাদীর সঙ্গে মিলিত হবার প্রবল ইচ্ছায় গজরানো মাদার ইচ্ছাপূরণ করা। এখানে আরও একটি গূঢ়ার্থ থাকতে পারে। খগেন প্রথমদিকে বিজনকে ধরা না পড়া মাদি কেউটের সঙ্গে তুলনা করেছিল। মাদাকে আটকে রাখা হয়েছিল মাদীকে সহজে ধরার জন্য। বিজন যেন নিজের সুপ্ত ইচ্ছাগুলো ধরা পড়ে যাক— এটা সে চায় না। তাই যেন তার তাড়াতাড়ি ঈশ্বরীতলা ছেড়ে চলে যাওয়া। কারণ এখানে এসেই সে প্রথম জেলাস হচ্ছে, শিবানীকে নগ্ন দেখতে চাইছে— কে বলতে পারে ঈশ্বরীতলায় খগেনের সঙ্গে, দাদার সঙ্গে থাকতে থাকতে ইচ্ছা জাগরণের ব্যক্তিস্বরূপটা সকলের সামনে যাতে ধরা না পড়ে যায়। আসলে বেশির ভাগ লোক তো প্রয়োজনাতিরিক্ত আগ্রহে ভোগে না বা কিছু একটা বানিয়ে তোলার বিস্ময়ে ভোগে না। বিজন তো এই সাধারণের ভিড়েই মিশে যেতে চায়। আর মাদী কেউটেটা যেন তারই প্রতিনিধি। তাই মাদাকে ছেড়ে দেয় যাতে মাদী ধরা না পড়ে। যাইহোক, মাদার বাইরে বেরোনোর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের স্বাধীন থাকার ইচ্ছাকেই যেন সে জাহির করে। স্বাধীন থাকার ইচ্ছেও মানুষকে জীবনের পথে আবর্তিত করে। ভিড়ে মিশে থাকার ইচ্ছা আসলে অসংখ্য জীবনের মাঝে নিজের জীবনকে মিলিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা। সময় ও সুযোগ সেই ভিড় থেকে ব্যক্তি মানুষকে পৃথক করে। সময় ও সুযোগ কারও ইচ্ছায় শক্তি সঞ্চার করে, কারও ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে বা জন্ম দেয়। তাই বিজন বসু উপন্যাসে সাময়িক দিক-হারানো মানুষ কিন্তু জীবনের পথে আবর্তিত হওয়া।

'চন্দনেশ্বর জংশন' উপন্যাসে অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম থেকেই দেখি টাকার জন্য অন্যের কাছে সর্বদা হাত পাততে। বিশেষ করে ঐ অঞ্চলের ধনী মানুষ নাদু শা-র কাছে। আসলে তীব্র আর্থিক অনটনের জন্য জোত-জমি-বাড়ি-পুকুর সব বন্ধক দেওয়া হয়ে গেছে। এমনকি বাড়ির উঠোনে গজানো দামি ঘাসও বিক্রি করা হয়ে গেছে। ভাগচাষি হিসাবে ভাগের ধানও দিতে পারেনি নাদুকে। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা অনন্ত তারপরেও নিজেকে সংযত রাখতে পারে না ঘোড়ার রেসে টাকা লাগানো থেকে। যেখান থেকে যতটুকু টাকা সংগ্রহ করতে পারে তখন খাবারের পরিবর্তে রেসের কথা মাথায়

আসে। মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, টাকা-পয়সা, গর্ব-ঔদ্ধত্য-অহংকার সবই সময়ের প্রভাবে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। শুধু থেকে গিয়েছে একটি সর্বনাশা শখ যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মরীচিকাবৎ আশা। যতদিন পর্যন্ত নাদু তাকে তার বিধবা মেয়ের পাত্র খোঁজার দায়িত্ব দেয়নি ততদিন পর্যন্ত কিন্তু অনন্ত বারবার এই আশা নিয়ে রেসের মাঠে ছুটে গিয়েছে যে সেখানে টাকা জিতলে তার অবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে। অনেকে বলতে পারে জুয়া খেলা একটি অভ্যেস যেখানে আশার চেয়ে লোভের গুরুত্ব বেশি। কিন্তু আমরা যদি অনন্ত বাড়ুয্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব তার এই বার্ধক্য অবস্থায় সাংসারিক তীব্র অনটন ঘোচাতে বা এক সময়ের সচ্ছল স্বাচ্ছন্দে বড় হয়ে ওঠার পরিবেশ কিছুটা ফিরিয়ে আনতে জুয়া ভিন্ন আর কোনও পথ নেই অনন্তের কাছে। দু'জনের সংসারে চাহিদা সামান্য থাকলে অনন্তর চালানো অসুবিধা ছিল না কিন্তু সচ্ছল সময়ে পাওয়া শখ পরবর্তীকালে অভ্যেসে পরিণত হয়ে যায়। আর অবস্থার চরম দূর্বিপাকে পড়ে অবস্থা ফেরাতে লোভ ও আশার সংমিশ্রিত রূপ ধারণ করে ঘোড়ার রেস। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, অনন্তকে তার অবস্থা ও শখের জন্যে বারবার হেনস্থা বা অপমানিত হতে হয়, কিন্তু তারপরেও সে চেষ্টা ছাড়ে না। জীবন তাকে আর কতটা খারাপ অবস্থায় ফেলতে পারে— সেটা দেখার জন্যই যেন সে এই সব অসম্মান-অপমান গায়ে মাখে না। এ যেন জীবনের পথে থেকেই জীবনের বিরুদ্ধে জেহাদ। ভাগ্যের চাকা নিজের দিকে ঘোরাবার নিরন্তর চেষ্টা জীবনের সায়াহ্নে পদার্পণ করেও।

এই উদ্দীপনা উৎসাহই তো আমাদের জীবনের মূল চালিকাশক্তি। তাই অনন্ত বাড়ুয্যে যখন বুদ্ধি করে নাদু শীর কাছে তার মেয়ের পাত্র খোঁজার দায়িত্ব নেয় অর্থের বিনিময়ে তখন উদ্দীপনা-উৎসাহই পাত্রের খোঁজে মাঠের পর মাঠ, রাস্তার পর রাস্তা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে সাহায্য করে। এই উদাহরণই প্রমাণ করে যে, অনন্তর রেসে টাকা লাগানোর পেছনে শুধুমাত্র লোভ ও অভ্যেস উদ্দীপক হিসাবে কাজ করেনি। লেখক বলেন, ''তবু অনন্ত জ্ঞানোবাবুর গল্পটি শুনতে লাগল। আর শুনতে শুনতে লক্ষ্য করল, সে আসলে কিছুই শুনছে না। চোখের সামনে তার একখানাই ছবি শুধু। সে ছবি হল— নাদু নিজে দাঁড়িয়ে অনন্তকে তার জমি জায়গা ঘরবাড়ির বন্ধকি দলিলখানা দিয়ে দিচ্ছে।''[৪৬] এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আসলে অনন্ত বাড়ুয্যে এই বয়সেও রেসের পেছনে ছোটে, নাদু শীর মেয়ের জন্য পাত্র জোগাড়ের জন্য ছোটে। যদিও অনন্ত তার স্ত্রীকে নাদু শীর মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজার কাজকে অর্থ লোলুপতার বদলে এই বলে যুক্তিযুক্ত করতে চায় যে, এক কম বয়সী মেয়ের জীবন বিধবা থাকার জন্য যাতে নষ্ট হয়ে না যায়— সেই জন্যে অশক্ত শরীরেও তার এই

তৎপরতা। নিজের এই অবস্থার দুর্বিপাকেও অনন্তর এই ভাবনা জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার পরিচয় বহন করে। তাই অনন্তর পরিশ্রমে এই ভাবনাও উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে যে, মানুষ শেষপর্যন্ত লড়াই করে তার স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার জন্য। জীবনের নানা বাধা-বিপত্তি, সময়ের হেরফের জীবনের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে কখনোই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করতে পারে না। যদি করত তাহলে এতোদিন অনন্ত বাড়ুয্যে একজন জড়াগ্রস্ত মানুষে পরিণত হতো। ভাগ্য বা সময়ের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও একজন মানুষ তার জীবনের প্রতি অধিকারের দাবি রাখে, তার জন্য লড়াই করে— অসহায় আত্মসমর্পণ প্রাণের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়। অনন্ত এখানে হৃদয় নস্করে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টিকেই পুষ্টি দান করেছে।

'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসের স্বাতীর প্রায় একই রকম অবস্থা ছিল অনন্তর মতো। দিলীপ বলেছে, ''... তোমরা তখন সবে গরীব হতে শুরু করেছো। তোমার দাদারা ওড়াতে শিখেছে। বাবা সবে মারা গেছেন। তোমাদের বাড়ি কলকাতায় একখানায় এসে ঠেকেছে। সে বাড়িরও আষ্টেপৃষ্ঠে ভাড়াটে। সকাল সন্ধ্যে উনুনের আঁচে অন্ধকার হয়ে যায় সিঁড়িঘর—''[৪৭] স্বাতীর আর্থিক অবস্থা এরপরে আরও খারাপ হয়। সন্তানসহ এই বিশাল পৃথিবীতে তাকে একক লড়াইয়ে নামতে হয়। কিন্তু তারপরেও হতাশা স্বাতীর জীবনে কখনও চিরস্থায়ী বাসা বাঁধতে পারে না। নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাহায্যে ক্রমশ জীবনের পথে অগ্রসর হয় সে। লেখকের সৃষ্ট জগতে মানবের এই লড়াইকেই জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ বিবিধ হতে পারে কিন্তু মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শেষপর্যন্ত লড়াই করে। 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসে স্বাতীর ঘটনাপ্রবাহ লেখকের এই জীবনদৃষ্টিকেই প্রতিফলিত করে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসগুলোতে নায়ক বা নায়িকা চরিত্র (Protagonist) ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রেও জীবনের এই মৌলিক অধিকার, দাবি, লড়াইয়ের কথাই বলেছেন। বলেছেন মানুষের অপরাজেয় মানসিকতার কথা। আমরা এই অধ্যায়ের দুটি অংশে নির্বাচিত উপন্যাসের নির্বাচিত চরিত্রের মাধ্যমে এই বক্তব্য প্রমাণিত করেছি।

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ২০৫।

২. তদেব, পৃ. ২২৭

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৩২।

৪. তদেব, পৃ. ৫৪

৫. তদেব, পৃ. ৫৪

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'আরণ্যক', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০৩

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৬৪।

৮. তদেব, পৃ. ১৪৬

৯. তদেব, পৃ. ১৮১

১০. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অনিলের পুতুল', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ২১৮।

১১. তদেব, পৃ. ২৫১

১২. তদেব, পৃ. ২১৩

১৩. তদেব, পৃ. ২৩৫

১৪. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'একটি উপন্যাসের আয়ু', রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৫৩২।

১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৩৫৩।

১৬. তদেব, পৃ. ৩৩৯

১৭. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'কি লিখতে চাই', রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৪৯১।

১৮. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'স্বর্গের আগের স্টেশন', রচনাসমগ্র-৫, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১৭।

১৯. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'চন্দনেশ্বর জংশন', রচনাসমগ্র-৫, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১২৯

২০. তদেব, পৃ. ১৬২

২১. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', রচনাসমগ্র-৪, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, তদেব, পৃ. ১৪

২২. তদেব, পৃ. ৯৭

২৩. তদেব, পৃ. ১১২

২৪. তদেব, পৃ. ১১৪

২৫. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অদ্য শেষ রজনী', রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১২, পৃ. ২৯০

২৬. তদেব, পৃ. ২৮৩

২৭. তদেব, পৃ. ৩৪১

২৮. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'হাওয়াগাড়ি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ. ৭

২৯. তদেব, পৃ. ৮৪

৩০. তদেব, পৃ. ১০৮

৫১. তদেব, পৃ. ১৫৪

৩২. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'শেষ বিকেলের আলো', করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা-১৯৯৯, পৃ. ৮৮

৩৩. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ১০১।

৩৪. তদেব, পৃ. ১০২

৩৫. দাশ, জীবনানন্দ, 'আট বছর আগের একদিন', জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩, প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৫৪, পৃ. ৭৪

৩৬. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অনিলের পুতুল', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ২৫০।

৩৭. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৩৪৮।

৩৮. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'নির্বান্ধব', রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৪৭।

৩৯. তদেব, পৃ. ৫২

৪০. দাশ, জীবনানন্দ, 'হায় চিল', জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩, প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৫৪, পৃ. ৬৩

৪১. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অদ্য শেষ রজনী', রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১২, পৃ. ৩৯০

৪২. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', রচনাসমগ্র-৪, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৪২

৪৩. তদেব, পৃ. ৮৩

৪৪. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'স্বর্গের আগের স্টেশন', রচনাসমগ্র-৫, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১০৩

৪৫. তদেব, পৃ. ১০৪

৪৬. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'চন্দনেশ্বর জংশন', রচনাসমগ্র-৫, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৬৬-১৬৭

৪৭. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'হাওয়াগাড়ি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ. ৪৭।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সময়, সমাজ ও ঐতিহ্য

''সময়ের দূরত্বে সাধারণ কথাই রূপকথা হয়ে যায়। জীবনে কেউ তো আর বিশিষ্ট হবার জন্য গুছিয়ে ঘটনা ঘটায় না। বহতা নদীর মতোই জীবনটা নাচতে নাচতে ঢেউ তুলে কালের তীর ধরে কথা-কাহিনী ছড়াতে ছড়াতে বয়ে যায়। তারপর একদিন সবজীবনই মৃত্যুর মতো এক অনন্ত নিদ্রা বা মহাসাগরে গিয়ে পড়ে। সেই নিদ্রাসাগরই আমাদের জীবনের মোহনা। কিংবা এই মোহনা থেকেই অনন্ত জন্মের মহাজীবন।''[১] আমরা এই অধ্যায়ে 'সময়'কে চিহ্নিত করব দু'টো দিক থেকে। এক, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবৎকালে বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতা, ঘটনা-প্রসঙ্গ উপন্যাসে কতটা ফুটে উঠেছে অর্থাৎ যে সময়ে বর্তমান থেকে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। দুই, উপন্যাসে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে। ঠিক একই রকম ভাবে লেখকের বাস্তব সমাজব্যবস্থা বা চিত্র এবং উপন্যাসে কাহিনির সমাজব্যবস্থা বা চিত্রের একটা তুলনামূলক আলোচনা এখানে উপস্থাপিত করা হবে। আর ঐতিহ্য বলতে কোনও বিষয়ের, কোনও অঞ্চলের সময়ের প্রবহমান ধারায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রবাহিত হয়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে তা কীভাবে ফুটে উঠেছে— সেটাও এই অধ্যায়ের আলোচনার অন্বিষ্ট। আমরা আমাদের নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস অবলম্বনে উপরিউক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরব।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশ যখন সমাজব্যবস্থায় লাগা অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলাতে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা সামাল দিতে মেয়েরা ক্রমশ বাইরে বেরোতে থাকে চাকরি সূত্রে। অবশ্য এই প্রবণতা উদ্বাস্তু হয়ে আসা শহুরে পরিবারের মধ্যে বেশি লক্ষ্য করা যায়। সমাজের এই পরিবর্তন উঠে এসেছে 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের সুধা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সুধার বড়দি রেখাও চাকরি করে। সুধার ছোট বোন অঞ্জু এখনও পড়াশোনারত। বাঙালি সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আইবুড়ো মেয়েদের সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিক্ষিত যুবকদের একটা বড় অংশের চাকরি না পাবার তীব্র হতাশাবোধ যা আমরা প্রমথ চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই। এমনকি প্রমথ পরবর্তীকালে যাকে বিয়ে করে সেই বীথিও (বিবাহ পূর্ববর্তী সময়ে) একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য হয়ে টিউশনি করানোর স্বল্প টাকা থেকে সংসারকে সাহায্য করত ও নিজের বিয়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখত। বীথিকেও আমরা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের

চরিত্র বলতে পারি। ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সমস্যা সমাজে সৃষ্টি করে প্রেমহীনতা। আর প্রমথ প্রেমহীনতার যেন মূর্ত প্রতীক। সে অনেক মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে জড়ায় কিন্তু কারও সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ভালোবাসার পরিবর্তে পড়ে থাকে কৃতজ্ঞতা যেমন সুধার সঙ্গে প্রমথর সম্পর্ক। কিন্তু সুধা আঁকড়ে ধরতে চায় বারবার প্রমথকে। কেননা তার বিশ্বাস প্রমথর যা রেজাল্ট (এই সম্পর্কে প্রমথর মিথ্যা ভাষণ) তাতে আজ না হয় কাল সে একটা ভালো চাকরি পাবেই। তৎকালীন সমাজ-নির্ধারিত বিবাহ বয়স পার করা ন্যূনতম বাহ্যিক সৌন্দর্য নিয়ে প্রমথর মত যুবকের স্ত্রী হওয়া সেই সময়ের সুধার মত মেয়েদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। তাই সুধার মত মেয়েরা নাছোড়বান্দা।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকের বাংলার অস্থির রাজনৈতিক সময়ের ছবি আমরা এখানে দেখতে পাই। প্রমথ-সুধা-বীথি-অবিনাশ প্রমুখের কাহিনির মাঝে মাঝে বিভিন্ন জনের কথাবার্তায় সেই অস্থিরতার ছবি ভেসে উঠেছে। অনেকটা যেন কোনও চরমপন্থী আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব চলছে তখন, তারই কিছু টুকরো ছবি—

ক) ''কলকাতা এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। এত বড় একটা প্রোসেশন গেল। মনে মনে একটা ঘেন্নার ঢেউ অনেকেই পুষছে। অন্নপূর্ণার সামনের পিচের রাস্তায় দিন দুই লাল লাল দাগ ছিল।''[অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, পৃ. ১৪৪]

খ. ''প্রোসেশনটার পর সবাই ঝিমিয়ে গেছে। কিংবা গুম্ মেরে বসে আছে। কোনো জিনিস কেউ আলোচনা করে না। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে খবর বেরোয়, কারা যেন শহিদ বেদী বানাচ্ছে, কারা যেন তা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টায় আছে।''[অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, পৃ. ১৪৪]

এই রকম অস্থির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সময়ের দ্বারা বিদ্ধ প্রমথ— তাই তাকে পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের শুরুর আধুনিক যুব সমাজের প্রতিনিধি-স্থানীয় চরিত্র বলা যায়। প্রেমহীন, দ্বিধাগ্রস্ত, কোনও কিছুতে একাগ্র হতে না পারা, সময়-নির্মিত ছদ্মবেশে ধুঁকতে থাকা যুব সমাজের মুখ হয়ে ওঠে প্রমথ। তবুও তার মধ্যে যৌথ পরিবারের প্রতি টান লক্ষ্য করা যায়। সে সময় এই যৌথ পরিবারের ভিত্তিই বেকারত্বের হতাশায় কিছুটা মলম লাগাতে সাহায্য করত। প্রমথের পরিবারেও সেই ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। তৎকালীন শহুর জীবনের এস্টাব্লিশমেন্টের রূপ তুলে ধরেছেন লেখক এই উপন্যাসে। ফলে তৎকালীন সময় ও সমাজের একটি বিষণ্ণ নগ্ন চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আত্মজৈবনিক উপাদানের ব্যবহার খুব সহজাত প্রবণতা হিসাবে দেখা দিয়েছে। তাই লেখক প্রমথের প্রেম, চাকরি পাবার চেষ্টা, যৌথ পরিবারের ছবি ইত্যাদির মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের প্রভাব রয়েছে। লেখকের অনেক উপন্যাসেই প্রধান চরিত্রের এক দাদার অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা জানতে পারি। যেমন এই উপন্যাসে প্রমথর সেজদা তনুর মৃত্যু প্রসঙ্গ আসলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেজদা পূর্ণেন্দুবিকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যার ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৪৭ খ্রি: দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসে এই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হতে হয় গোটা পরিবারকে। লেখকের মনে এই ঘটনা এতটা গভীর প্রভাব ফেলে যে, অনেক উপন্যাসেই সেজদার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা-প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন চরিত্রের স্বপ্নের মধ্যেও সেজদার উপস্থিতি দেখা যায়। তবে হয়তো লেখকের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য আছে উপন্যাসে প্রমথ ও বীথির বিয়ের ঘটনার সঙ্গে। সালকিয়ায় ইতি গঙ্গোপাধ্যায়ের (শ্যামলের স্ত্রী) অনেক ভাই বোন নিয়ে নিম্নবিত্ত পরিবার, এক বোন নীতির সঙ্গে লেখক মতি নন্দীর বিয়ে, মতি নন্দীর সঙ্গে শ্যামলের ইতিকে দেখতে আসা, শ্যামলের বাড়ি থেকে পণের দাবি— সেই দাবি না মানতে পারার ফলে বিয়েতে শ্যামলের পরিবারের অসম্মতি, শ্যামলের ইতিকেই বিয়ে করার জেদ, শ্যামলের বাড়ি যাতে বিয়েতে কোনও সমস্যা করতে না পারে— সেজন্য সামাজিকভাবে বিয়ের আগেই শ্যামলের রেজিস্ট্রি করা, ইতির টিউশনি করে টাকা জমানো ইত্যাদি সব ঘটনাই আমরা উপন্যাসের প্রমথ-বীথির সম্পর্কে দেখতে পাই। ইতি গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ''যে সময়টার কথা বলছি, ১৯৫৯-৬০ সাল, কিছুদিন মাত্র হয়েছে, আমার আরেক বোন নীতির সঙ্গে বিয়ে হল মতি নন্দীর।''[২] লেখক মতি নন্দীর ছায়া দেখতে পাই প্রমথর বন্ধু নীতিশের মধ্যে। কারণ নীতিশের শ্যালিকা বীথি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিয়ের পরেই তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখায় হাত দেন। ফলে বিবাহ-স্মৃতি যুবক লেখকের মনে তখনও টাটকা যা প্রমথর নপুংসকতার কাহিনির সঙ্গে সহজাতভাবে জোড়া লেগে যায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় শুধু কোনও একটি সময়ে বসে সময়কে তুলে ধরেননি, নিজের শরীর ও মনে লাগা সময়-প্রভাব সযত্নে শৈল্পিক পদ্ধতিতে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তাই এত জীবন্ত, বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে সময়ের কথা, সমাজের কথা। লেখক জানাচ্ছেন, ''এক সময় ডেলিপ্যাসেঞ্জারির জীবন, চাকরি খোঁজার জীবন গল্পে চলে আসতে লাগল। চাকুরে মেয়ের গল্প দু'একটা লিখে ফেললাম। সন্ধ্যার মুখে মুখে আগাছা ঢাকা প্রাঙ্গনে সাপখোপ দেখা দিলে আমরা সিওর হওয়ার জন্যে থ্যাঁতা

করে বাঁশের বাড়ি মারি। তাতে নিষ্ঠুরতা এবং নিশ্চয়তা থাকে।”[৩] সময়-সমাজের নিষ্ঠুরতা দেখাতে লেখক কখনও কার্পণ্য করেননি। তাই শ্যামলের উপন্যাসে সময়-সমাজের বিশ্বাসযোগ্য ছবি দেখার নিশ্চয়তা আমরা পাই।

কোনও প্রিয়জনকে দীর্ঘ হাসপাতালে থাকতে দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন লেখক। সেখানেই সে দেখে ‘‘বড় ডাক্তার অপারেশন করতে করতে বাইরে এসে ফোন করছে। গবেষণার জন্য মানুষ আলু-পটলের মত কাটা পড়ছে শল্যচিকিৎসকের ছুরিতে। মৃত্যুর শত্রু একটি সাদা বাড়িতে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে। বই লিখে ফেললাম।”[৪] ডাক্তার, ঔষধ-পত্রের ব্যবসা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের নামে সাধারণ গরীব মানুষদের গিনিপিগে পরিণত করা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলতে গিয়ে এখনকার সময়কেও যেন লেখক ছুঁয়ে ফেলেন। কারণ আজকের সময়েও এই বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ডাক্তার, ওষুধ, রোগীর বিষয়গুলো যে পরিবারকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে—সেটা হলো লেখকের দাদামশাই অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় ও তার দশ কন্যা ও দুই পুত্রের মাধ্যমে। মা কিরণকুমারী গঙ্গোপাধ্যায় ও তার অন্যান্য বোন ও ভাইয়েরা এবং দাদামশাই অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি এই উপন্যাসের শিরদাঁড়া। ‘অনিলের পুতুল’ উপন্যাসে এই দাদামশাইয়ের প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে। বিশেষ করে দম্ভ, বড়লোক হবার উচ্চাশা, লোভ, ব্যবসায় বুদ্ধি, অতিরিক্ত কাম, অতিরিক্ত গরিমা প্রকাশ, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, ফোর্থ ক্লাস অসুখ, বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সমাহার ইত্যাদি বিষয়ে দাদামশাইয়ের কথা লেখক বারবার এনেছেন। কাহিনিতে দাদামশাইয়ের সশরীরি উপস্থিতি না থাকলেও তার প্রসঙ্গ বারবার এনে দাদামশাইয়ের সময় ও সমাজকে আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘‘বাল্যবিবাহ নিবারণী সমিতির এই দুঁদে সভাপতি নিজের মেয়েদের বিয়ে দিতে লাগলেন আট-ন’বছর বয়সে। গৌরীদানের পুণ্য অর্জন। প্রত্যন্ত গাঁ থেকে দোজবরে ধরে ধরে। যাতে কিনা একশো টাকার ভেতর বিয়ে কমপ্লিট হয়। টাকা জমাচ্ছিলেন তখন। এই প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আর আর পরের বছরগুলোয়।”[৫] এই দাদামশাই অবশ্য পণ্ডিত ও সুপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। সেতার বাজানোর শখ ছিল। প্রায় প্রতি বছরের মাথায় বাবা হতেন। কোম্পানির কাগজ কেনা থেকে সুদে টাকা খাটানো সবই করতেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যবিবাহ আন্দোলনের সময় অসংখ্য বাল্যবিবাহ নিবারণী সমিতি গড়ে ওঠে। যার মাথায় বসত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়ের মত শিক্ষিত মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু তাদের এই বৈষম্যমূলক ভণ্ড আচরণ উনিশ ও বিশ শতকের দীর্ঘ সময়

ধরে সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত রাখতে সাহায্য করেছিল। লেখকের মা কিরণকুমারী গঙ্গোপাধ্যায়েরও বাল্যবিবাহ হয়েছিল।

''যশোর নগর ধাম প্রতাপআদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।।
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।।''[৬]

ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দরে'র সূচনায় প্রাচীন যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের এভাবেই পরিচয় দিয়েছেন। প্রতাপাদিত্য ছিলেন আদিশূরের সময়ে আগত পঞ্চকায়স্থের মধ্যে একজন, বিরাট গুহের বংশধর। বঙ্গদেশের বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম শক্তিশালী সামন্ত রাজা ছিলেন তিনি। তৎকালীন মোঘল রাজত্বের অধীন এক সামন্ত থেকে সর্বপ্রথম স্বাধীন রাজ্যের মহারাজা হিসেবে প্রতাপাদিত্য নিজেকে ঘোষণা করেন। তাঁর রাজত্ব বিস্তার লাভ করেছিল বৃহত্তর চব্বিশ পরগণা, খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশালকে কেন্দ্র করে। ১৫৯৯ খ্রি. নাগাদ থেকে তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরি করা, একের পর এক দুর্গ প্রতিষ্ঠা, অসংখ্য রণতরী ও জাহাজ নির্মাণ তাকে মোঘল অধীন এক সামন্ত রাজা থেকে বঙ্গের এক বড় অংশের স্বাধীন শক্তিশালী মহারাজায় পরিণত করে। আর এই কাজে যার অন্যতম ভূমিকা ছিল তিনি হলেন ঢালী সৈন্যের সেনাপতি মদনমল্লের। যার অদম্য সাহস, বৃহৎ কিছু তৈরির পরিকল্পনা-ইচ্ছা, স্বল্পে সন্তুষ্ট না হওয়া এবং ক্রমশ অগ্রসর হবার জেদ প্রতাপাদিত্যকে তৎকালীন মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে এই বৃহৎ হিন্দুস্থানের এক সামান্য অংশের অধিপতি হয়েও রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। সেনাপতি মদনমল্লের প্রচণ্ড কর্মস্পৃহা মদনমল্লকে অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে স্থির থাকতে দেয়নি— একের পর এক অঞ্চল সে অধিকার করেছে— সামন্ত রাজার সৈন্যশক্তিকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে মহারাজের উপযোগী সৈন্য শক্তিতে পরিণত করেছে। কোনও কাজে নিজের সবকিছু উজার করে দেবার প্রবণতা, অদম্য কর্মস্পৃহা ইত্যাদি স্বভাব-বৈশিষ্ট্য আমরা 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসের কুবেরের মধ্যেও

লক্ষ্য করতে পারি। ফলে ষোড়শ শতকের শেষে ও সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকের মদনমল্ল আর বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ড্রিম মার্চেন্ট থেকে চকদার হবার স্বপ্নে বিভোর কুবের হয়ে ওঠে যেন আত্মার আত্মীয়। কারণ কুবেরের বিজয়াভিযান শুরু হয়েছিল মাত্র কয়েক কাঠা জমির মালিকানা পাবার পর থেকে, যেমন মদনমল্লের অভিযানও সামান্য পরাধীন এক সামন্ত রাজার অল্পসংখ্যক সেনার সেনাপতি হিসাবে। ফলে উভয়ের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান মুছে গিয়ে মদনমল্ল ও কুবের যেন এক হয়ে যায়। মানসভ্যতার ইতিহাসে এই গোত্রের কতিপয় মানুষ আমাদের প্রথাগত জীবনধারায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। যারা নিশ্চিত পরাজয় জেনেও জীবনের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে না। যেমন করেনি মদনমল্ল মোঘল সেনাপতি মানসিংহের বিপুল সেনাবাহিনীর সামনে, যেমন করেনি কুবের মেদনমল্লর চড়ে সর্বস্ব খুইয়ে। এই গোত্রের মানুষেরা যে কালেই যে স্থানেই জন্ম নিক্ না কেন তারা সকলেই তো একগোত্র বা একই বংশের নিকটাত্মীয়। তাই এদের কাছে সময় নেহাতই পুরানো দিনের স্মৃতিমাত্র— সময়ের ধারণা এভাবেই পাল্টে দেন লেখক 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে।

কুবের যে সময় দু'চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে জীবনের পথে চলতে শুরু করে— পৃথিবীটা যেন ধীরে ধীরে সেই সময় থেকেই কঠিন হতে শুরু করেছে। বিয়ের পর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। সন্ধিক্ষণের দোলাচলতা কুবেরের মনে সর্বদা বিরাজ করে। তাই যেখানেই সুযোগ মিলেছে অতীত ও বর্তমান সময়ের তুলনা কুবের করেছে। কুবেরের মতে, ''... উনিশ শো ঊনচল্লিশ পর্যন্ত দীর্ঘ এক শো দেড় শো বছর চাকুরেদের সোনার সময় গেছে। খাবার-দাবার, বাড়িভাড়া কাপড়চোপড় সবই সস্তা।''[৭] হাওড়ার লোহার কারখানায় সামান্য চাকরি করে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কোনও দিনই আসবে না, কুবের সেটা বুঝতে পারে। অন্যদিকে কুবেরের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকা তীব্র কর্মস্পৃহা গুমরে গুমরে মরে। ছোট থেকে বড় করার, নতুন কিছু বানাবার উন্মাদনাই কিছু মানুষকে অন্য অনেক মানুষ থেকে স্বতন্ত্র করে। যে কোনও কালেই এরা নিজেদের জাত চেনাতে পারে। শুধু একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকবার জমি কিনতে গিয়ে অবচেতন মনে কুবের সেটাই অনুভব করেছে। ফলে কুবের ডুবে যেতে থাকে বিষয়ের মধ্যে। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে 'ড্রিম মার্চেন্ট' কুবের। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দ্রুত গতিতে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে—এছাড়াও বাংলায় ক্রমশ উদ্বাস্তু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যাইহোক এই বিষয়ে মাওলা ব্রাদার্স (ঢাকা, বাংলাদেশ) থেকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত আবু জাফর অনূদিত জয়া চ্যাটার্জীর

'দেশভাগের অর্জন' (বাঙলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এছাড়াও সুভাষ বিশ্বাসের সোম পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত 'দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা' (২০১৯) পাঠযোগ্য একটি গ্রন্থ। এরফলে জমি কেনাবেঁচা সেই সময় সমাজে একটা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হয়ে ওঠে। সময়ের এই নাড়ি-স্পন্দন নিখুঁত শিল্পী হিসাবে ধরতে পেরেছিল কুবের। যেমন ধরতে পেরেছিল কুবেরের পাঁচ পুরুষ আগের বংশের সবচেয়ে কৃতী মানুষ বাবু হরিরাম সাধুখাঁ। যারা ধরতে পারে না তাদের অপেক্ষা করতে হয় কলেরায় কত বড়লোক মানুষ ফৌত হবে— তারপর ক্রস বিক্রির কমিশন বাবদ কিছু টাকা হাতে আসবে। এরা (যেমন, কুবেরের বন্ধু সনৎ) এই সময় বেঁচে থাকার জন্য নতুন পথ তো খোঁজে কিন্তু বন্ধ্যাযুক্ত পথ। বেঁচে থাকার তাড়নায় মানবিক বোধগুলো যখন ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে— সময় কঠিন হওয়া শুরু তো সেই সময় থেকেই। তাই সনতের কাছে হিউম্যানিটি অপেক্ষা যে কোনও উপায়ে অর্থ উপার্জন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই অর্থ উপার্জনের জন্যে অনেক বড়লোক মানুষের মৃত্যু কামনাও সনতের কাছে খুবই স্বাভাবিক বিষয়। একদা ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের এই অবস্থা সেই সময়ের সমাজের নগ্ন সত্যকে প্রকাশ করে। ব্রজ ফকির সেসময়ের বেকার কুবেরকে একজন 'কনটেমপোরারি আর্টিস্ট' হিসাবে চিহ্নিত করে। এই অভিধা ব্রজ ফকিরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ যারা সময়কে নিঙড়ে নিয়ে মুহূর্ত ধরে অনুভব করে নিজের বেঁচে থাকার অস্তিত্বকে, যাদের কাছে বেঁচে থাকাটা লড়াইয়ের নামান্তর— তারা তো আসলে প্রত্যেকে শিল্পী। তাই ব্রজ ফকিরকেও এই সময়ের আর্টিস্ট বলা যায়। কারণ রেলেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা-পরিকল্পনা উদ্ভাবনী সৃজনশীল ক্ষমতার পরিচয় দেয়। উপন্যাসের কাহিনিতে তৎকালীন সমাজে জমি ও মন্দির কেন্দ্রিক ব্যবসার অন্যতম সফল দুই কারিগর হলো এই কুবের ও ব্রজ ফকির।

মেদনমল্লের চড়ে এসে কুবের যেমন অনুভব করে মানবসভ্যতার ইতিহাসে বয়ে চলা প্রচণ্ড কর্মস্পৃহা তেমনি ''এই নিশুতি রাতে অচেনা দ্বীপের বুকে দাঁড়িয়ে কুবের বারবার বুঝতে পারছে— এই নদী, এই মাটি— বাতাসের দাপাদাপি, ভগবানের পোকামাকড়— সবকিছুর হাতে সে শুধুই একটা পুতুল। তার শুধু কাজ করে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কোন রাস্তা নেই।''[৮] আসলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জগতে মানুষের কাজ করে যাওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা থাকে না। এতেই গতানুগতিক অর্থহীন জীবন বৈচিত্র্যময় অর্থবহ হয়ে ওঠে। কোনও না কোনও ক্ষেত্রে বা সময়ে তোমার পরাজয় নিশ্চিত, তারপরেও তোমাকে কাজ করে যেতে হবে— এটাই অনিবার্য পরিণতি— যাকে আমরা কর্মস্পৃহা-কর্মউন্মাদনার ঐতিহ্য বলতে পারি। কারণ এই কালপ্রবাহে

একজন মানুষের আয়ু নিমেষমাত্র— তাই বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থানে কতিপয় মানুষের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যেন উত্তরাধিকার সূত্রে সঞ্চারিত হয়ে মানবসভ্যতার ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এই ঐতিহ্যের কথাই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আরও বিভিন্ন উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই।

কুবের-স্রষ্টা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কেও এই ঐতিহ্য বহন করতে দেখি। ইতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ''যে জীবন সে নিজে যাপন করেনি, যার মধ্যে নিজের উন্মোচন নেই, যে জিনিস তার করতলধৃত আমলকী নয়, সেসব নিয়ে সে লিখবে কেন? তার যে চাই একেবারে জ্যান্ত, টাটকা নিজের অভিজ্ঞতা।''[৯] এই ভাবনার সার্থক প্রতিফলন শ্যামলের উপন্যাসগুলোতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে কুবের বারবার ছোটবেলায় ঘটা যে স্যাড এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলে— যে ঘটনা সর্বদা কুবেরকে একটা প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার চাদর পড়িয়ে রাখে— সেটা আসলে শ্যামলের কৈশোরের খুলনা জেলা স্কুলের ঘটনা। ঘটনার দিন শ্যামলের সহযোগী যে বন্ধু ছিল সেই শরৎ পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এক বড় কর্তার স্টেনো কাম কনফিডেনসিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছিল। সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লেখক জানায়, ''... সেই দুপুরে মনোদিদির হাত হয়তো খালি ছিল একদম। আমাদের কিলিয়ে খদ্দের পাকিয়ে নিতে হয়েছিল তাকে। নয়তো শুধুই কিশোর-বিলাসের অভিরুচি হয়েছিল তার। কিন্তু রতিবিলাসের পক্ষে আমরা তো তখন নেহাতই কচি।''[১০]

দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসে লেখক ১৯৫২ খ্রি: 'এসিস্ট্যান্ট মেলটার' হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে বেলুড়ের 'ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড স্টিল' কোম্পানিতে। কোম্পানির এই কাজে আটকে থাকার মত মানুষ তিনি ছিলেন না। ১৯৫৪-৫৫ খ্রি. নাগাদ জমি সংক্রান্ত বিষয় শ্যামলের নজরে চলে আসে। কোম্পানির কাজে ইস্তফা দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সুপারিশে প্রুফ রিডার পদে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগদান করেন। কিন্তু কাজ ভালো না লাগায় কিছুদিন পর আবার ইস্তফা। এরপর নানান কাজে যুক্ত হয়েও থিতু হতে না পেরে সন্তোষকুমার ঘোষের আহ্বানে স্থায়ী কর্মী হিসাবে সাব-এডিটর পদে ১৯৬০ খ্রি: পুনরায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। ওই বছরেই ইতি সান্যালের সঙ্গে বিবাহ। বিয়ের এক বছর পরেই প্রথম সন্তান মলির আগমন এবং তার চার বছর পরে দ্বিতীয় সন্তান ললির আগমন। আনোয়ার শাহ রোডের বাড়িতে লেখক পুরো পরিবার নিয়ে গাদাগাদি করে বসবাস করেছেন। তারই মধ্যে প্রথম উপন্যাস 'বৃহন্নলা' লেখার কাজ সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয় উপন্যাস 'অনিলের পুতুল' লেখেন বউবাজারে ব্যোমকেশ বাবুর প্রেসে।

১৯৬৪ খ্রি. প্রথম চম্পাহাটিতে আসেন জমি দেখার সূত্রে। সেই সময় শ্যামলের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ইতি গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ''ক্ষুধার্তের মতো শ্যামল লেখার জায়গা খুঁজছিল একটা। তার সঙ্গে খুঁজছিল লেখার নতুন বিষয়ও। কারণ, এই সময় থেকেই তো ওর মধ্যে একটু একটু করে চাড়িয়ে উঠছিল জমির নেশা। ... লেখার জন্যে স্থানাভাব, সন্তানদের নিয়ে একটু গুছিয়ে থাকা আর জমির নেশায় ১৯৬৫ সালে লক্ষ্মীপুজোর পরদিন আমাদের চম্পাহাটির দিকে রওনা দেওয়া।''[১১] স্থানাভাবের ফলে একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকবার জন্য উপন্যাসে কুবেরও জমি দেখতে শুরু করেছিল। এরপর ধীরে ধীরে লেখক শ্যামলকে জমি-কৃষি-গ্রাম-গ্রামের মানুষের নেশা পেয়ে বসে। যদিও লেখক চম্পাহাটিতে টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে সপরিবারে আসার প্রায় দেড় বছর পর ১৯৬৭ খ্রি. দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চম্পাহাটির নিজস্ব বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানসহ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মাঝের সময়টিতে এই অঞ্চলেরই দু'টি ভাড়া বাড়িতে তাদের থাকতে হয়েছিল। নিজস্ব বাড়িতে মা কিরণকুমারীকে আনতে পারেননি শ্যামল, ঠিক যেমন উপন্যাসে পারেনি কুবের। লেখকের অনেকটা জায়গা জুড়ে মা কিরণকুমারী ছিলেন— মা'র চলে যাওয়াটা কুবেরের মত শ্যামলের জীবনে বড় একটা বিষাদ-ক্ষত দিয়ে যায়। কিন্তু সময় তো থেমে থাকে না, ততোদিনে শ্যামলের জীবনে সূত্রপাত ঘটে গেছে চম্পাহাটি পর্বের। কো-অপারেটিভ সিস্টেমে জমি কেনা, বাড়ি তৈরি করা ইত্যাদি উপায় বের হতে থাকে শ্যামলের মস্তিষ্ক থেকে। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে কয়েকটি কালজয়ী উপন্যাস রচনার কাঁচা রসদের খাদানে পরিণত হয় 'চম্পাহাটি' অঞ্চল। সেই সময়ের কথা লেখক নিজেই জানান, ''জমির অনন্ত রহস্য। তার সঙ্গে কোর্টকাছারি। দলিল দস্তাবেজ। উকিল মুহুরি। লোভ। শরিকানি। অন্তহীন।

আসলে পৃথিবীটা যেমন আছে তেমন থাকে। যুগে যুগে মানুষ এসে দখল দাবি করে। কখনো অর্থবলে— কখনো লোকবলে।

এই ব্যাপারগুলো লেখায় আসতে লাগল।''[১২]

আর 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে মেদনমল্লের দ্বীপ প্রসঙ্গে লেখক জানান, 'পাগলা নদী দিয়ে জলপথে গিয়ে একদিন পরিত্যক্ত সুন্দরবনের দ্বীপে মেদনমল্লের দুর্গ দেখলাম দূর থেকে। ছাদ নেই। শ্যাওলামাখা দেওয়াল। বিশাল দিঘি দামে ঢাকা। বাঙালি নৌ-সেনাপতির নৌ-ঘাঁটি। কী করে যেন 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে এসব কথা এসে গেল। ফসলেরও একটা নেশা আছে। সে নেশা আসলে দখলের। আরও কত আমার করায়ত্ত করা যায়।''[১৩] লেখকের 'অল্টার ইগো'

(Alter Ego) হিসাবে উপন্যাসে যেন উপস্থিত হয় কুবের। এই কুবেরকেই লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নাম পাল্টে পাল্টে বিভিন্ন উপন্যাসে হাজির করান। এভাবেই একই ঘটনা-প্রসঙ্গ, বিভিন্ন অপ্রধান চরিত্রও লেখকের বিভিন্ন উপন্যাসে বারবার ঘুরে ফিরে আসে।

আমরা জানি, চম্পাহাটি পর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি আরও তিনটি উপন্যাস লিখেছেন, যথা— 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'চন্দনেশ্বর জংশন' ও 'স্বর্গের আগের স্টেশন'। 'কুবেরের বিষয় আশয়'সহ চারটি উপন্যাসকেই আমরা একটি উপন্যাসের চারটি খণ্ড বা পর্ব সহজেই বলতে পারি। মেদনমল্ল দ্বীপে কুবেরের যে ধান চাষ করার অধ্যায় ছিল সেটাই 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু। তবে এই উপন্যাসে কোনও পরিত্যক্ত দ্বীপের কথা নয়; ঈশ্বরীতলা, মৌজা চন্দনেশ্বর, মৌজা খাড়ুপাতাল, মৌজা দ্বারিকপোতার কৃষকদের জমির যে অংশ জলের অভাবে বছরের একটা দীর্ঘ সময় পরিত্যক্ত হয়ে থাকে সেই সমস্ত জমি ও চাষবাস নিয়ে কথা। সমবায়িক প্রথায় ঐ অঞ্চলের কৃষকদের নিয়ে নায়ক ধানের চাষ শুরু করে। যার নেতৃত্বে অবশ্যই তথাকথিত বেগার শ্রমিক অনাথবন্ধু বসু ওরফে যেন কুবের। ঐ অঞ্চলে দেখেন 'ধানবাড়ি' ও 'আটাবাড়ি' নামক এক ধরনের সুদের প্রথা প্রচলিত আছে। লেখক বলেছেন, ''ধান নিয়ে গাঁয়ের পর গাঁয়ে এক অদ্ভুত সুদের কারবার চলছে। অভাবের দিনে চাষী এক বস্তা ধান ধার নিলে ধান উঠলে দেড় মণ ফেরত দিতে হয়। ঈশ্বরীতলার ভাষায় এ কারবারের নাম ধানবাড়ি। তেমনি মুদিখানাগুলোয় চালু আছে আটাবাড়ি।''[১৪] তৎকালীন সময়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামের যে চেহেরা ফুটে উঠেছে, তা হলো গ্রামের পুকুরগুলো সংস্কার করার কথা তাদের মাথায় সেভাবে কোনও দিন আসে না। এই অঞ্চলে পুকুরে মাছ চাষ তেমন জনপ্রিয় নয়। স্নানের জন্যও যে সেভাবে খুব বেশি ব্যবহৃত হয়, তেমন নয়। তাই জলের রঙ সবুজ, জলে পচা গন্ধযুক্ত শ্যাওলা জমে থাকে। কাঁচা বাড়ির ছাউনি হিসাবে গোলপাতা বেশি ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চলে গাই গরুর একটি সাধারণ রোগ 'এসো'। সংসারের বাতিল বুড়ো বুড়ির জায়গা হয় সাধারণত বাড়ির ঢেঁকিঘরে। ঢেঁকির ব্যবহার এই অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। আবার বিশ্বাস করার মতো মানুষ পেলে তারা যে খুব সহজেই অল্প সময়ে মধ্যে সবকিছু দিয়ে বিশ্বাস করতে পারে— তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো বহিরাগত অল্প-পরিচিত বা প্রায় অপরিচিত অনাথবন্ধুর মত মানুষ। চার মৌজার কৃষকদের থেকে জমি সংগ্রহ করা— ব্যাংকের লোনের শর্ত পূরণ করার জন্য চাষের আগেই চাষীদের গোলা থেকে এক বস্তা করে ধান পাওয়া— গতর ও মন দিয়ে কৃষকদের সোৎসাহে কাজে নামা ইত্যাদি সেই বিশ্বাসেরই

পরিচয় বহন করে।

এই অঞ্চলের রাজনীতির অন্যতম মুখ রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট জনতার প্রার্থী দক্ষিণা চক্কোত্তি। ভোটের কাজ, জমিতে নয়া পত্তন দিয়ে প্রজা বসানো ইত্যাদি কাজের জন্যে দক্ষিণা এই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ ডাকাত সন্তোষ টাকিকে পোষে। বলপূর্বক পুরানো প্রজাদের উঠিয়ে বেশি দামে নতুন প্রজাপত্তন বাংলায় ষাটের দশকেও প্রচলিত ছিল। এছাড়া তখনও ভূমিসংস্কার, বর্গাদার আইন ইত্যাদি সেভাবে গ্রাম বাংলায় কার্যকর না হবার ফলে জমিদার, জোতদার প্রমুখের প্রভাব সেভাবে কমেনি। ভারতবর্ষে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন আসে ১৯৬৩ খ্রি:। এরপর আসে পশ্চিমবঙ্গে West Bengal Land Reforms Act, 1955. তারপর West Bengal Land-Revenue and Cess (Apportionment) Act, 1963. কিন্তু বাংলায় ষাট-সত্তরের দশক পর্যন্ত গ্রামবাংলার জমিদার ও জোতদারদের (ভূমিস্বত্ব কাগজে কলমে না থাকলেও) প্রভাব সেভাবে কমেনি। কারণ আইন যেমন ছিল, তেমনি আইনের ফাঁকও বর্তমান ছিল। জোতদাররা সেই আইনের ফাঁক দিয়েই বারবার গলে যেতেন। এর ফলেই হয়তো কৃষকদের দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জিত ক্ষোভ নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই বিষয়ে শরদিন্দু সান্যাল সম্পাদিত 'ধনধান্যে' (প্রথম বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯, নিউ দিল্লী-১) পত্রিকায় হরেকৃষ্ণ কোঙার, ডি.বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী সেন, এস.কে.দে, এম.এল. দাণ্ডওয়ালা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দক্ষিণা চক্কোত্তির মধ্য দিয়ে তৎকালীন গ্রামের মধ্যে ভোটকেন্দ্রিক সাংবিধানিক রাজনীতির স্বল্প পরিচয় লাভ করি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মত না হলেও এখানে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে ব্যাবসাভিত্তিক অর্থনীতির কিংবা জমিনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে নগদ পুঁজিনির্ভর অর্থনীতির প্রচ্ছন্ন পরোক্ষ একটা লড়াই যেন অনুভব করি। এখানে অনাথবন্ধু বসু জমিদার না হয়েও যেন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। তাই তার আপাতদৃষ্টিতে হেরে যাওয়া যেন অমোঘ নিয়তির মত অনিবার্য। সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজের এই সনাতন ঐতিহ্যই যেন লেখক রক্ষা করেন প্রকৃতির বাণ, ধানের যম মাজরা পোকাকে পাঠিয়ে দিয়ে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে যেন বংশী কাপালি। যার জয় পুঁজিবাদী সময়ের গতিপ্রবাহে নিয়তির মত নিশ্চিত। আর সেই জয়কে ত্বরান্বিত করার জন্য ভাগ্যক্রমে বংশী কাপালি পায় তামাকের বস্তায় তামাকের পরিবর্তে বস্তাভর্তি টাকা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসের অনেক চরিত্রের মত আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সেই চরিত্রের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সম্বোধনও যে ধীরে ধীরে পাল্টে যায়, তা

আমরা এখানেও দেখতে পাই, ''বছর দেড়েক আগেও স্টেশনবাজারে ছোকরার নাম ছিল— বংশী তেলেভাজা। তারপর কিছুদিন বাদে ওকে সবাই বলতে লাগল— হোলসেলার বংশী। এখন টোবাকো মারচেন্ট বি.সি.কাপালি। নামের মাঝে চন্দ্রটা যে এতকাল কি করে লুকিয়েছিল ! ঈশ্বরীতলায় যাত্রা, থিয়েটার, ফুটবল-সবকিছুতেই প্রধান পৃষ্ঠপোষক এখন বি.সি.কাপালি।''[১৫] সবকিছু বিক্রি করে অনাথবন্ধু বসুর ঈশ্বরীতলা ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়ে ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় এবং বংশী কাপালির অনাথবন্ধুর সাধের বাড়িসহ সব সম্পত্তি কিনে দখল নেওয়ার মধ্যে যেন লেখক সময়ের বৃত্তটিকে সম্পন্ন করেন। পরিবর্তিত সময়-সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহ্যকে এভাবেই তুলে ধরেছেন লেখক 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসে। এক প্রকার প্রচ্ছন্ন দীর্ঘনিশ্বাস বরাদ্দ থাকত তারাশঙ্করের উপন্যাসে সময়ের কাছে হেরে যাওয়া প্রতিনিধিদের জন্য। এখানেও ঈশ্বরীতলার মানুষদের অনাথবন্ধু বসুর জন্য এক প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ দেখি। অনাথের সপরিবারে কলকাতায় চলে যাওয়াটা তাদের কাছে কিছুটা দুঃখের বিষয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় গিয়ে শ্যামল যে জমিটি কেনেন, তার আয়তন ছিল ৩১ কাঠা। অবশ্য তার মধ্যে পুকুর খনন করা হয়েছিল ১৬ কাঠা জমি নিয়ে। আর মূল বাড়িটি ৯ কাঠা জমিতে তৈরি করা হয়েছিল। এই বাড়ি তৈরি প্রসঙ্গে লেখক জানান, ''একবার একটা ইঁটখোলা করেছিলাম। লক্ষণ, পঞ্চানন হাজরা, শরৎ ইঁট কাটতে আসত শেষরাতে। লাথগঞ্জের ইঁট। ... তাই দিয়ে বাড়ি গেঁথে তুললাম। দেখলাম ইঁটখোলার কিছুই ফেলা যায় না। ঝামা ভেঙে খোয়া। ছাই হল গাঁথুনির মশলা। পৃথিবীর খানিকটা কেটে নিয়ে তাই দিয়ে পৃথিবীর গায়ে বাড়ি।''[১৬] তিনি শুধু বাড়িই তৈরি করেই ক্ষান্ত হননি। খালের পাশ দিয়ে নিজের বাড়ি অব্দি ছিল একটি কাঁচা রাস্তা। নিজের তৈরি ইঁট দিয়ে সে রাস্তা পাকা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, রাস্তার দু'ধারে বারুইপুর থেকে কিনে আনা গাছের চারা লাগিয়েছিলেন লেখক। এখনো সেই অঞ্চলে এই রাস্তা 'শ্যামল বাঙালের রাস্তা' নামে পরিচিত। এই রাস্তাই উঠে এসেছিল লেখকের 'গত জন্মের রাস্তা' ছোটগল্পে। চম্পাহাটির বাড়িতেই বাছুর সমেত হরিয়ানা গাই, হাঁস, মুরগি, ছাগলসহ শ্যামল বাঙালের চিড়িয়াখানা তৈরি হয়। তাঁর পোষা গরুকে আমরা আবার দেখতে পাই 'সরমা ও নীলকান্ত' উপন্যাসেও। গরু পুষতে গিয়ে লেখক নানা প্রকার গোবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেন। গ্রাম বাংলায় গরুর হাড়ের চিকিৎসকদের বলে 'হাড়ো খাঁ'। উপন্যাসে দেখি 'উমা'কে কৃত্রিম প্রজননের জন্য বিরজা ডাক্তার আমেরিকার ওহিও ষাঁড়ের বীর্য ব্যবহার করে। আসলে তৎকালীন সময়ে ভারত সরকার সুস্থ বাচ্চা, সুস্থ মা

পাবার জন্য এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে আইস বক্সে ওহিও ষাঁড়ের বীর্য আমদানি করত আমেরিকা থেকে। কৃত্রিম প্রজননের জন্য সেটা সরকার গ্রামে গ্রামে পাঠাত। এসব তথ্য গোবদ্যি সূত্রেই লাভ করেন লেখক। লেখক নির্মিত চিড়িয়াখানায় ছিল লেখকের প্রথম পোষা অ্যালসেশিয়ান কুকুর বাঘা যে আরও অনেক রচনাতেই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। বাঘার হারিয়ে যাওয়া, ফিরে পাওয়া, ডাকাতদের দেওয়া বিষে মৃত্যু— সবই প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনেই উপন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে।

চম্পাহাটির এই বাড়িতে বসেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের খেজুরের রস দিয়ে তৈরি তাড়ির নেশার সূত্রপাত হয়। সঙ্গে চাট হিসাবে থাকত হাতে গরম চিতি কাঁকড়া ভাজা। জমির নেশা শ্যামলকে টেনে এনেছিল চম্পাহাটিতে— কিন্তু এরপরেই তাড়ির নেশার সঙ্গে সঙ্গে জমি সংক্রান্ত আর একটি বড় নেশা পেয়ে বসে তাকে, ''জমির সঙ্গে সঙ্গে আমার অজান্তেই আমি ফসলে চলে গিয়েছিলাম। একটি ধানচারা। তাকে বড় করে তার থেকে ধান তোলা। তার স্বভাব। সেই ধানের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের কোন্ অতীত থেকে নাড়ির যোগ— সবই আমাকে ভাবাতে লাগল।''[১৭] কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ফসল বিশেষত ধান চাষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। আমন ও বোরো ধান ছাড়াও একপ্রকার হাইব্রিড ধানের চাষ চম্পাহাটিতে শুরু করেন লেখক। গ্রাম সাপেক্ষে একেবারে নতুন পদ্ধতিতে নিজের বাড়ির ছাদে সেলোফেন পেতে কাঠের গুড়ো ছড়িয়ে সফলভাবে তৈরি করেছিলেন ধানের বীজতলা। এজন্যই তাকে এই সময় দায়িত্ব দেওয়া হয় আনন্দবাজার পত্রিকার কৃষি বিষয়ক সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র 'ভূমিলক্ষ্মী' সম্পাদনার, যেখানে তিনি 'বলরাম' ছদ্মনাম দিয়ে লেখালেখি করতেন । আরও বেশি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পত্রিকার পক্ষ থেকে শ্যামলকে পাঠানো হয় সবুজ বিপ্লবের অন্যতম পীঠস্থান পাঞ্জাবে যেখানে তিনি কৃষি-শিক্ষা বিষয়ক পঞ্চাশ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় রয়েছে ঘুটিয়ারি শরিফের মাজার। প্রতি বছর এই মাজারকে কেন্দ্র করে (বর্তমানে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত) মেলা বসে। এই মেলা বসার দিনই ১৯৭২ খ্রি: শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সপরিবারে চম্পাইহাটি ত্যাগ করেন। চম্পাহাটি ত্যাগ করার পরেও শ্যামল গঙ্গোপায়ের কৃষিকাজ নিয়ে আগ্রহ একটুও কমেনি। তাই আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যেই বিদেশের চাষবাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য যায় ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় ও জাপানে। এই আগ্রহের সূত্রেই সখ্য হয়েছিল বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পরিচয় হয় বোড়ালের উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যিনি পরবর্তীকালে 'ভগবান বুনো

রায়ের বংশধর' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠেন। কলকাতাতেও ধান চাষ করার লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেননি। কারণ সুযোগ পেয়েছিলেন বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতীর আত্মীয় শীতল চৌধুরীর বেহালার বাগানবাড়িতে চাষ করার। প্রায় আঠারো বিঘা জমিতে পুনরায় ধান চাষ শুরু করেন লেখক, যদিও এখানে চম্পাহাটির মত সফল হতে পারেননি। অন্যদিকে চম্পাহাটির ভাগচাষীরা যাতে অনাহারে না থাকে তার জন্য চম্পাহাটির গ্রামের বাড়ি বন্ধক রেখে ভাগচাষীদের দিয়েই ধানচাষ করাতেন শ্যামল। এই ধান বিক্রির টাকা থেকেই বারুইপুরের ব্যাঙ্কের লোন শোধ করতেন লেখক।

চম্পাহাটিতে থাকাকালীন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ঘড়িচাঁদ, শরৎ, বেচো, ঘটি, কালো, খগেন, বজরা, হৃদয়, পঞ্চানন হাজরা, মদন, ভগীরথ, গণেশ, লক্ষ্মণ, ভদ্রেশ্বর, নাদু, পালান, সন্তোষ প্রমুখের সঙ্গে গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। এরা সেই সময়কার সমাজের সবচেয়ে হতদরিদ্র, নিম্নবিত্ত নিরক্ষর মানুষ ছিল। এদের মধ্যে কেউ ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর কেউ বা আবার চোর, ডাকাত, জেল খাটা আসামী। এদেরকে সমাজের সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে অনাযাসে গণ্য করা যেতে পারে। গায়ে জামা পরা এদের কাছে বিলাসিতা। লেখকের কাছে এইসব মানুষেরা জীবনচর্যায় অন্যতম সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। শহুরে মানসিকতা ও অভিজাত শ্রেণির মানসিকতার ছাঁচ থেকে অনায়াসেই লেখক নিজেকে আলাদা করতে পেরেছিল। তাই চিতি কাঁকড়া ভাজার সঙ্গে তাড়ি খেতে, ওলের ডালনা খেতে কিংবা ক্ল্যারিওনেটের পাশে বসে একসঙ্গে যাত্রা দেখতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কখনও অস্বস্তি হয়নি। এদের কাছে শ্যামল ছিলেন 'দা-ঠাকুর'। এদের সঙ্গে মেশার জন্য নিজেকে শ্রেণিচ্যুত করতে হয়। আর তা করতে গিয়েই লেখককে খুন করতে হয় কংক্রিটের জঙ্গলে বসবাসকারী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে কিছু গেঁথে যাওয়া ধ্যান-ধারণাকে। শুধু মেলামেশিই নয়, ঐ অঞ্চলের বিভিন্নরকম উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তিনি। ভারত সরকার ১৯৯৫ সালে প্রথম বিদ্যালয়ে মিড্-ডে মিল প্রকল্পটি শুরু করে। 'জাতীয় পুষ্টি সহায়তা' প্রকল্পের অন্তর্গত এই প্রকল্পটি শুরু হয়। কিন্তু শিক্ষানীতি যৌথ (কেন্দ্র ও রাজ্য) সহমতের ওপর ভিত্তি করে কার্যকর হবার সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছিল, তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার রান্না করা খাবার দেবার পরিবর্তে চাল, গম, ছাতু ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বিতড়ণ করত। তবে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ২০০৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রান্না করা খাবার দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে যে মিড-ডে মিলের প্রচলন দেখি— এই ধরনের ব্যাবস্থা অনেক আগেই লেখক প্রবর্তন করেছিলেন চম্পাহাটির

স্কুলে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রবর্তিত মিড-ডে মিলে থাকত বুলগারের খিচুড়ি, গুঁড়ো দুধ আর বিস্কুট। এই বুলগারের খিচুড়ি আসত আমেরিকার একটি সংস্থা থেকে। সর্বহারা চাষীদের সাহায্য করা, সমবায় প্রথায় কৃষিকাজ, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ, তাদের সঙ্গে দিনযাপন— এভাবেই গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষদের কাছে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে গ্রামের কিছু মাতব্বর, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে লেখক চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় তাকে হয়রানির চেষ্টা করা হয়, যদিও সফল হতে পারে না। 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসে রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট দক্ষিণা চক্কোত্তির মধ্যে দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ডাকাতদের উৎপাতও বেড়ে যায় চম্পাহাটির বাড়িতে। এছাড়াও মেয়েদের ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা, তাদের সুরক্ষা ও পড়াশোনা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে লেখক চম্পাহাটি ত্যাগ করেন। তবে নিয়ে যান নিজের ঘাম দিয়ে অর্জিত এক বিপুল অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন বাস্তব চরিত্র লেখকের বিভিন্ন লেখায় ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাহিত্য। 'কুবেরের বিষয় আশয়' ছাড়া বাকি তিনটি গ্রাম-মফস্বল কেন্দ্রিক উপন্যাসই (ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, স্বর্গের আগের স্টেশন, চন্দনেশ্বর জংশন) চম্পাহাটি ত্যাগ করে কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে বসে লেখা।

তবে উপরিউক্ত চারটি উপন্যাসের মধ্যে 'স্বর্গের আগের স্টেশন' ও 'চন্দনেশ্বর জংশন' উপন্যাস দুটিতেই আমরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চম্পাহাটি অঞ্চলের তৎকালীন সময়ের গ্রাম জীবনের সাধারণ ছবি, গ্রামীণ সমাজ, সেই সমাজের রীতি-নীতি, বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য ও গ্রামীণ মানুষের বাস্তব বিশ্বাসযোগ্য জীবন্ত ছবি পাই। কারণ স্পটলাইটের আলো কুবের বা অনাথবন্ধুর মত চরিত্র অপেক্ষা খগেন, বজরা, হৃদয় নস্কর প্রমুখ চরিত্রের ওপর বেশি করে পড়েছে। তাদের মত চরিত্রই এই দু'টি উপন্যাসে প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তৎকালীন সময়, সমাজ, ঐতিহ্য এই দুটি উপন্যাসের নিরিখে সূত্রাকারে নীচে উল্লেখিত হলো। যথা—

ক. সাধারণত এই অঞ্চলের জমি একফসলি। আর সেই ফসল হলো ধান। সেচ ব্যবস্থার সেরকম সুযোগ না থাকায় বর্ষাকালই একমাত্র ভরসা। অকর্ষিত জমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যা এই অঞ্চলে 'বাদা' নামে পরিচিত।

খ. সমুদ্র সংলগ্ন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মাটি। ফলে রোদের প্রভাবে জমিতে নোনা ফুটে ওঠে। তখন বাড়ির নারী, পুরুষ, সন্তানসহ সকল মিলে জমিতে বসে পড়ে। আর নোনা ফোটা মাটি

ভাঙা কলাই থালায় কাচিয়ে-কাচিয়ে তোলে। সেই মাটি গরম জলে ফুটিয়ে লবণ বের করা এই অঞ্চলের একটি পদ্ধতি লবণ আবার কেউ বাজার থেকে কিনতে পারে, এই অঞ্চলের গরীব মানুষের কাছে তা কল্পনাতীত বিষয়।

গ. বাজারে নুন বিক্রির টাকা থেকেই গরীব মানুষেরা দৈনন্দিন আহার্যের কিছুটা ক্রয় করতে পারে। গরীবের ঘরে আহার্য হিসাবে জনপ্রিয় গমের আটার পরিবর্তে ভুট্টার আটা। শাকের মধ্যে শুষনি বা মেথি শাকের ডগা।

ঘ. শুধুমাত্র কৃষিকাজকে অবলম্বন করে এই অঞ্চলে সারাবছরের জীবিকা নির্বাহ কঠিন বলে কিছু দুঃসাহসী মানুষের রাতের জীবিকা হয়ে ওঠে ডাকাতি। ফলে ডাকাতের উৎপাত এই অঞ্চলে সরল জীবনচর্যায় মাঝে মাঝেই উত্তেজনা নিয়ে আসে । ডাকাতের ভয়ে কতিপয় সম্পন্ন ঘরের কর্তারা রাতে কুপি জ্বালিয়ে কেউ বন্দুক নিয়ে বা না নিয়ে রাত জাগে। লেখকের গ্রাম কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোতে তাই ডাকাতের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবীভাবে দেখতে পাই। ইতি গঙ্গোপাধ্যায় তার ‘আমার শ্যামল’ গ্রন্থে চম্পাহাটি ত্যাগ করার অনেকগুলো কারণের মধ্যে ‘ডাকাতের উৎপাত’ বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন। যদিও শ্যামলের চম্পাহাটিতে মেলামেশির তালিকায় ডাকাত-চোর ইত্যাদি পেশাধারী মানুষও ছিল।

ঙ. এই অঞ্চলে ডাকাতি করবার পূর্বে পাহারাদার কুকুরকে বাজররণ (ফনিমনসা বা ক্যাকটাস জাতীয় গাছ) গাছের আঠা খাওয়ানো হয়। ফলে কুকুর বোবা হয়ে যায়। পেটের নাড়িভুঁড়ি পচে গিয়ে ধীরে ধীরে কুকুর মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে। এই অঞ্চলের লোকেরা বলে, কুকুরের ‘মুখন্ডী’ হয়েছে। লেখকের পোষা কুকুর বাঘাকেও ‘মুখন্ডী’ করে মেরে ফেলে ডাকাতদের কেউ। সেই ডাকাত হয়তো দিনের বেলায় চাষী হিসাবে লেখকের সঙ্গে বসেই তাড়ি খেতে খেতে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয় লেখকের সঙ্গে।

চ. যে কোনও গ্রামের মতো এই অঞ্চলের গ্রামগুলোতেও কতিপয় সম্পন্ন ঘরের অন্যতম ব্যবসা ছিল ‘বন্ধকি’ কারবার। ‘বন্ধকি’ জিনিস হিসাবে বগিথালা, রূপোর বিছে, পেতলের গাড়ু ইত্যাদি থাকত। এমনকি থাকত আবাদী জমি, বাস্তু ভিটা। ‘ঈশ্বরীতলার রূপোকথা’ উপন্যাসে ওষ্ঠ জানায়, তেষট্টি টাকার জন্য তাদের বাস্তু সাত বছর বাঁধা ছিল। সুদ না পেলে মহাজন এসে খাতকের বাড়ি থেকে গাই গরু ছিনিয়ে নেয়। শুধু তাই নয়, গাই গরু টেনে নিয়েও মহাজনের যদি মন না ভরে কিংবা খাতকের বাড়িতে গাই গরু না থাকলে, খাতকের স্ত্রীকে (পোয়াতি হলেও), কন্যাকে

মহাজনের বাড়িতে পেটেভাতে বেগার পরিশ্রম করার জন্য যেতে হয়। মহাজনের বাড়িতে প্রধান কাজ হলো ধান সেদ্ধ করা ও তা শুকিয়ে ভাঙনের জন্য প্রস্তু করা। গর্ভবতী মহিলারা নিজেদের শরীরে পুষ্টির অভাব মেটানোর জন্য মহাজনের বাড়ির গরুর বরাদ্দ ফ্যান চুরি করে খায়।

ছ. এই অঞ্চলের তৎকালীন সময়ের কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেন, ''এখানে হাসপাতালের নাম কলেজ। হাতুড়ে ডাক্তারের নাম বদ্যি। দুর্গাপুজোর নাম বড় পুজো। গোহালে খয়াটে গাই। এঁড়ে বেশি। বাড়ির বউরা আর গাই সমানে পোয়াতি হয়। লোক বাড়ছে। গরু-বাছুর বাড়ছে। মাঠে ঘাস কম। গাদ সমেত তেলো তাড়ি খেয়ে তিরিশ বছরের জোয়ানের চেহেরা পাকিয়ে যাচ্ছে। লিভার জখম। কাজ নেই। জমি নেই। উৎসব বলতে পঞ্চাননতলায় বোশেখ মাস জুড়ে হরিনাম।'' [স্বর্গের আগের স্টেশন, পৃ. ১১]

জ. হাঘরে হাভাতে মানুষজন মাঠে মাঠে ইঁদুরের গর্তে ইঁদুরের মজুত করা ধান সংগ্রহ করে পেটের ভাত জোগার করে। 'স্বর্গের আগের স্টেশন' উপন্যাসে খগেনের বড় ছেলে হাজরা এই ধরনের কাজে দক্ষ। নোনা মাটির দরুণ মিষ্টি জলের টিউবওয়েলের চাহিদা এই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের রয়েছে। বাদা ও উষ্ণ অঞ্চল জন্যে সাপের দেখা পাওয়া এখানে স্বাভাবিক ঘটনা। তবে বিষধর সাপকেও এই অঞ্চলের মানুষ ঘটায় না। বাস্তু সাপ থাকা এখানে মঙ্গলজনক ব্যাপার। সাপেদের মধ্যে হাসাকেউটে, কালাচ, শামুকভাঙানি, খড়িচোঁচ, চন্দ্রবোড়া, গেঁড়িভাঙা, মেছো কেউটে ইত্যাদি এই অঞ্চলে দেখা যায়।

ঝ. দুর্গাপুজো ছাড়াও পৌষমাসে বাস্তুপুজো, নালপুজো, ভাদ্র সংক্রান্তির পরের দিন রান্নাপুজো ইত্যাদি এসব অঞ্চলে পালিত হয়।

''নানান সময়কে জুড়ে আস্ত একটি যুগ করে দেয় যে ফেবিকল, তাই-ই বন্ধুত্ব। নতুন নতুন তিরিশ পেরিয়ে তাই একদিন কলকাতায় অ্যানউন্স করি—আয় মেশামেশি করি। ঘন ভালোবাসাবাসি করি। আমিই লাভ লাভ অ্যান্ড লাভ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। খুব কনডেন্সড বন্ধুত্বর জন্যে অনেকদিন আগে সবাইকে ডেকেছিলাম— আয় আমার কাছে দুশো টাকা আছে, আমার সঙ্গে মিশবি?''[১৮] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'জীবনরহস্য' গ্রন্থে এই কথা বলেছেন। 'বন্ধুত্ব' শ্যামলের আমৃত্যু সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া একটি বিষয়। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। কারণ এই সময়েই একঝাঁক তরুণের হাত ধরে সাহিত্যের জগতে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, সন্দীপন

চট্টোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, উৎপল বসু, বিমল রায়চৌধুরী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রফুল্ল রায় প্রমুখ সাহিত্যিক ও আরও নবীন অনুজ সাহিত্যিকদের সঙ্গে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধুত্ব ছিল। আর এই বন্ধুত্বেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলো আড্ডা। তবে এই আড্ডা বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'গোষ্ঠীবদ্ধভাবে আড্ডা শ্যামলের তেমন পছন্দ ছিল না। দু'একজনের সঙ্গে নিবিড় হয়ে থাকতেই সে স্বচ্ছন্দ বোধ করত।"[১৯] লেকখের কাছে পান করাটা (নেশা জাতীয় দ্রব্য) ছিল নিবিড়ভাবে মেলামেশার একটা অছিলা মাত্র। আসলে লেখকমন সর্বদা বন্ধুত্বের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকত। এই বন্ধুত্ব পাবার জন্যেই মেশামেশি। তার থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ হত— তাই উঠে আসত লেখকের রচনায়। তবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশিষ্টতা হল, বন্ধুত্বের কোনও শ্রেণি বিভাগ লেখকের অভিধানে ছিল না। কিন্তু এভাবে তো বেশি দিন চলতে পারে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানান দায়-দায়িত্ব-কর্তব্য এসে পড়ে। জীবিকার প্রয়োজনে তৈরি হয় দূরত্ব। ধীরে ধীরে নিজস্ব বৃত্ত-পরিধি নির্মিত হয়। গূঢ় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিবিধ প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হয়। বিবাহ, সন্তান মানুষের জীবনে অন্যতম মনোযোগের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। লেখক নিজেই বলেছেন, ''এই ব্যাপারটা বলছি এই কারণে যে লেখার শুরু হয় যন্ত্রণা, আবেগ থেকে। তা থেকে বাড়ি-ঘরদোর হয়ে গেলে— লেখাটা প্রফেশন হয়ে গেলে তার ভেতর দক্ষতা যেমন আসে তেমনি হারাবার জিনিসও অনেক ঘটে। যার প্রথম বলি— বন্ধু। কারণ লেখককে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। বন্ধু আর লেখাকে মিলিয়ে মিশিয়েই তো আমরা হয়ে উঠেছিলাম। তার ভেতর বন্ধু হয়ে গেল ব্যস্ত। কেজো। দরকারের কড়ি যোগাড়ে সে জড়িয়ে গেল। পড়ে থাকল লেখা।"[২০] এর ফলেই হয়তো শ্যামলের মনে গেঁথে গিয়েছিল বন্ধুত্ব হারানো যন্ত্রণা। আগের সেই বন্ধুত্বের দিনগুলো ফিরে পাবার একটা তাড়না সুপ্তভাবে আমৃত্যু লেখক অনুভব করে গেছেন। কিংবা এভাবেও বলা যেতে পারে আজীবন ধরে তিনি খুঁজে গেছেন নিজের আত্মার আত্মীয়। কুবের, অনাথ যেমন শ্যামলের একটি সত্তার বহিঃপ্রকাশ তেমনি 'নির্বান্ধব' উপন্যাসের নিবারণ পাকড়াশি লেখকের 'বন্ধুত্ব' সত্তার 'অল্টার ইগো'। এই নিবারণের মাধ্যমে লেখক 'বলি দেওয়া' বন্ধুত্বের হারানো সময়কে তুলে ধরেছেন। নির্বান্ধব থাকার যন্ত্রণা তুলে ধরেছেন। অন্বেষণ, আবিষ্কার তুলে ধরেছেন। লেখকের ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নিবারণ পাকড়াশির বক্তব্য তুলে ধরে আমাদের মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করব—

ক. ''জানো রেবা, আমি 'ভালোবাসা প্রাইভেট লিমিটেড' নাম দিয়ে একটা কোম্পানি খুলব। সবাই সেখানে নানারকম ভালোবাসার শেয়ার কিনতে পারে। বাৎসল্য, পরকীয়া, নেহাৎ বন্ধুত্ব, অষ্টপ্রহর মেশামিশি— সবকিছুর শেয়ার থাকবে। ভালোবাসা ছাড়া ওয়ার্ল্ডে সত্যি আর কিছু নেই।'' [নির্বান্ধব, পৃ. ১৫]

খ. ''কারও সঙ্গে আমার প্রাইভেট টক্ হয় না। সাইড টক্ হয় না। আমার কাছে আমার নিজের বা পরের কোনও গোপন কথা লুকানো নেই। আমি কোনওদিন দল পাকিয়ে ষড়যন্ত্র করার চান্স পাইনি। কেউ আমাকে কানে কানে কোনওদিন কিছু বলেনি। সো কল্ড্ বন্ধুদের কোডে কথা বলে হাসাহাসি করতে দেখে আমি আন্দাজে তাদের সঙ্গে গোবোধের হাসি হেসেছি শুধু।'' [নির্বান্ধব, পৃ. ২১]

বন্ধুত্ব ছাড়াও যে সময় উপন্যাসে উঠে এসেছে, তা হলো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মজীবনের একেবারে প্রথম পর্ব। যে সময় তিনি বেলুড়ের 'গ্রেট ন্যাশনাল আয়রণ অ্যাণ্ড স্টিল' কোম্পানিতে কাজ করতেন। তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষের বুকে ইস্পাত তৈরির কোম্পানির অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াই ফুটে উঠেছে। এই ধরনের কোম্পানিতে কর্মচারী ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। তৎকালীন সময়ের কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

ক. ''চিত্তরঞ্জনে তখনও ইনজিন তৈরি শুরু হয়নি। ভিলাই, রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর নেহরুর স্বপ্নের আঁতুড়ে। এখনকার বোকারো তখন ফাঁকা মাঠে চুয়াল্লিশখানা গ্রাম। ইস্পাতের বাজারে টাটা, বার্ণপুর একচ্ছত্র।'' [নির্বান্ধব, পৃ. ২৯]

খ. ''বাজারে লোহার দর নেই। তখন কোথায় ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যে, সরকার কেনাকাটা শুরু করবে। বাড়িঘর তৈরির ফাইভ-এইট রড, রেন ওয়াটার পাইপ আর কড়াই তৈরি হচ্ছে গুচ্ছের। কিন্তু বড় বড় ঢালাই কে করাবে? জগন্নাথদাস-বদ্রীদাস ওপেন হার্থ ফারনেস বসিয়েছে ঠিকই। কিন্তু অতবড় রাক্ষসের আহার যুগিয়ে থই পাচ্ছে না বাজারে। তাই ফারনেসের নামে কেনা স্ক্র্যাফ আয়রণ বাঁ হাত দিয়ে জাপানকে ঝেড়ে দিয়ে দুপয়সা করছে।'' [নির্বান্ধব, পৃ. ৩০]

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৫২-এর শেষের দিকে বেলুড়ের ইস্পাত কারখানায় অ্যাসিস্ট্যান্ট স্মেলটার হিসাবে। স্বাধীন ভারতবর্ষের পঞ্চাশের দশকের একেবারে শুরুর দিকে কলকাতার ইস্পাত কারখানার ছবি এখানে লেখক তুলে ধরেছেন। এক বছরের কিছু বেশি সময় লেখক এখানে কাজ করেছিলেন। ফলে একটা বিশ্বাসযোগ্য তৎকালীন সময়ের ছবি আমরা 'নির্বান্ধব'

উপন্যাসে পাই।

চম্পাহাটি ত্যাগ করার পর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কলকাতায় নতুন ঠিকানা হয় প্রতাপাদিত্য রোডের ভাড়া বাড়ি। প্রথম তিন মাস কল্যাণ মুখার্জির বাড়িতে ভাড়া থাকার পর উঠে আসে ৫০/১ প্রতাপাদিত্য রোডের নতুন ভাড়া বাড়িতে। এই সময়েই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় বাংলার থিয়েটার জগতের কিছু বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে। যেমন, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অসীম চক্রবর্তী প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই তৎকালীন সময়ে কলকাতার 'নান্দীকার' গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মনোজ মিত্রের সঙ্গেও লেখকের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। লেখক বলেছেন, ''গান শুনি প্রভার মেয়ের কেতকী— ছোড়দির। কলকাতার স্টেজের ধুলো তখন নাকে যেত। রিহার্সাল দেখতাম। বেপরোয়া অসীম, সাহসী কেয়া, অকুতোভয় অজিতেশ, রসিক মনোজ— এরা সবাই এক একজন দিকপাল লোক। নাটক লেখা, মহলা, হল আর টাকা যোগাড়, দর্শক ভোলানো— সব ব্যাপারেই এরা যেন বালজাকের হিউম্যান কমেডির এক একটি অংশ। এদের দেখেই আমার মনে অদ্য শেষ রজনী এসেছিল।''[২১] কলকাতা শহর রঙ্গমঞ্চের শহর, গ্রুপ থিয়েটারের শহর। 'অদ্য শেষ রজনী' উপন্যাসে মধ্য সত্তরের দশকে কলকাতায় গ্রুপ থিয়েটারের অবস্থা, থিয়েটার সংশ্লিষ্ট কুশীলব-সমাজ এবং গ্রুপ থিয়েটারের ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন।

আমরা সকলেই জানি যে, গ্রুপ থিয়েটারের জন্মলগ্নের বৈশিষ্ট্য হিসাবে রয়েছে বাণিজ্যিক থিয়েটারের বিরোধিতা। থিম, বিষয়বস্তু, অভিনয় কৌশল, উপস্থাপনা ভঙ্গি নিয়ে সর্বদা পরীক্ষাপ্রবণ মনোভাব—এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে কোনও উপায়ে অর্থ উপার্জনের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বার্তা, লেখক-দর্শন দর্শকের সামনে তুলে ধরাই গ্রুপ থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, গ্রুপ থিয়েটার যখন সফলতার শীর্ষে পৌঁছায় তখন প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি গ্রুপ থিয়েটারের শরীরে আঠার মত লেগে যায়। আর্থিক সচ্ছলতা গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিটি সদস্য অনুভব করতে থাকে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতা থিয়েটার সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মনে ভীতির সঞ্চার করে— তখনই গ্রুপ থিয়েটারের মৃত্যু সুনিশ্চিত হয়ে যায়। গ্রুপ থিয়েটারের এই ঐতিহ্যকেই লেখক তার উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। আমরা উপন্যাসের কাহিনিতেও দেখতে পাই 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটার যখন সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছে— সেখান থেকেই ধীরে ধীরে পতনের অভিমুখে যাত্রা করেছে। যে পরীক্ষাপ্রবণ মনোভাবের জন্য গ্রুপ থিয়েটার বিখ্যাত, তা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। যদিও কতিপয় মানুষ তারপরেও পরীক্ষাপ্রবণ মনোভাব নিয়ে লড়ে যায় (উপন্যাসে যেমন অমিয়

বন্দ্যোপাধ্যায়)। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের অস্তিত্বেই রয়েছে গ্রুপের প্রতিটি সদস্যের আন্তরিক, নৈষ্ঠিক সহযোগ। উপন্যাসে 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারে মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনির আওয়াজ যেভাবে শোনা গিয়েছে—

ক. ''অমিয় পরিষ্কার জানে— সে এখন একটি প্রতিষ্ঠান। নতুন করে ভাবতে গেলে সব ভেঙে পড়বে। নতুন নাটকের ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি হবে না। সবাই চায় নিরাপদে থাকি। বাড়ি ভাড়া রেশন হাউসফুল একস্ট্রা চেয়ার নিয়মিত পাবলিসিটি কলশো। কেউ চায় না, এই একই অভিনয়ের একঘেয়েমি ভেঙে ফেলে দিয়ে আরও কঠিন কিছুর জন্যে প্রাণপাত করি।'' [অদ্য শেষ রজনী, পৃ. ২৯০]

খ. ''মহলার পর গাড়ি গিয়ে সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দেয় এখন। খিদে পেলে খাবার আছে। চান করার বাথরুম। শোবার ঘর— সবই আছে। নেই সেই আগেকার দল বেঁধে কিছু করার উৎসাহ। সবাই কেমন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কথা বলছে। কারও পার্ট এখনো মুখস্থ হয়নি। সবাই জানে— মহলার পর নাটক স্টেজ হোক চাই না হোক— মাস গেলে মাইনেটা তো পাব।'' [অদ্য শেষ রজনী, পৃ. ৩২৬]

এভাবেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'অদ্য শেষ রজনী' উপন্যাসে সফলতার শীর্ষে পৌঁছে পতনের বীজ অঙ্কুরিত হবার সনাতন ঐতিহ্যের কথা শোনায়।

এই উপন্যাসে লেখক তৎকালীন সময়ে কলকাতায় গ্রুপ থিয়েটারের সমাজকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের ভেতরকার লড়াই, আর্থিক অভাবকে সঙ্গী করেই একটি গ্রুপ থিয়েটারের পথ চলা, অভাবের দিনে গ্রুপের প্রতিটি সদস্যের জোট বেঁধে থাকা, প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েও সৎ চেষ্টা ও আশাকে সঙ্গী করে স্টেজে নাটক নামানো ও অভিনয়, উপস্থাপনা কৌশল নিয়ে পরীক্ষা করা, নাটকের রিহার্সাল, মঞ্চ তৈরি করা, ভবন থিয়েটার উপযোগী করে তৈরি করা, পোষাক-সেট ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমরা এই উপন্যাসে পাই 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারের মাধ্যমে। আবার মঞ্চের জীবনের থেকেও মঞ্চের পর্দার আড়ালে যে জীবনধর্মী নাটক চলতে থাকে— সেই জীবনে যে বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-সাধ-সাফল্য-ব্যর্থতা প্রতিফিলিত হয় থিয়েটার সংশ্লিষ্ট মানুষদের মধ্যে— তারও একটি বিশ্বাযোগ্য ছবি এঁকেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। লেখক মধ্য-সত্তরের দশকে বিভিন্ন দিক্‌পাল নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে শুধু আড্ডা মারার জন্য মেশেননি— আরও বড় উদ্দেশ্য ছিল তাদের সমাজ-জীবনে প্রবেশ করা— আর তাতে তিনি যে সফলতা পেয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। কারণ উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র অমিয়-রজনীর মধ্যে স্পষ্ট ছাপ ছিল তৎকালীন কলকাতার

গ্রুপ থিয়েটারের দিকপাল দুই চরিত্র যথাক্রমে অসীম চক্রবর্তী ও কেতকী দত্তের। এজন্যই হয়তো ১৯৭৫খ্রি. 'বেতার জগৎ' পত্রিকা লেখকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েও উপন্যাসটি ছাপতে আগ্রহ দেখায়নি। এই সব বিষয় ছাড়াও তৎকালীন সময়ে গ্রুপ থিয়েটারকে লড়তে হয়েছে পাবলিসিটি-মার্কেটিং ও ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় হওয়া যাত্রাপালার সঙ্গে। ষাটের দশক থেকেই পশ্চিমবঙ্গে যাত্রায় আধুনিকতার হাওয়া লাগে। ফলে যাত্রায় যেমন তৎকালীন অনেক থিয়েটার অভিনেতা অভিনয় করতে শুরু করে তেমন দর্শক সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ 'যাত্রা শিল্পের ইতিহাস' (১৯৯৬) গ্রন্থে। ওঁনার মতে, যাত্রার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পেছনে যে দুটি প্রতিষ্ঠানের বড় ভূমিকা ছিল সেই দুটি প্রতিষ্ঠান হলো— এক. 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠী এবং দুই. কলকাতার আকাশবাণী কেন্দ্র 'বিবিধ ভারতী'। শংকরের বক্তব্যে সেটাই উঠে এসেছে, ''থিয়েটারের এখন আর কিছু নেই দাদা। সবটাই দর্শক। সবটাই যাত্রা। পাবলিসিটি বিল্ড-আপ। এই গ্রেটেস্ট মাস মিডিয়া শীগগিরি থিয়েটার-সিনেমাকে গিলে খাবে।"[২২] যাইহোক, গ্রুপ থিয়েটার মুভমেন্ট নিয়ে বাংলা সাহিত্যে 'অদ্য শেষ রজনী' পথিকৃৎ।

জমির নেশা, ফসলের নেশার সঙ্গে আরও একটি নেশা প্রতাপাদিত্য রোডের ভাড়া বাড়িতে থাকার সময় লেখকের হয়েছিল সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকে। লেখকের স্ত্রী ইতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ''তবে, তখন আর ধান চাষ নয়, পেয়ে বসল গাড়ির নেশা। সে এক মারাত্মক ব্যাপার বটে। একটা করে সেকেন্ড হ্যাণ্ড চার চাকার গাড়ি কিনছে, আর দুদিন বাদেই সেই গাড়িগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে, চালিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। বিক্রি করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না। আবার আর একটা নতুন সেকন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনছে। আর কেনা মানে কী? আবার তা বিক্রি।"[২৩] ফলে উপন্যাসে এই নেশার মাধ্যমেই উঠে এসেছে তৎকালীন সময়ে কলকাতার বুকে পুরানো গাড়ির ব্যবসা, বিভিন্ন রকমের ভিনটেজ্ গাড়ির পরিচয়, চাহিদা, মল্লিক বাজারের ছবি ইত্যাদি। দেশি, বিদেশী পুরানো গাড়ির এমন সম্যক পরিচয় হয়তো ইতোপূর্বে বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। শ্যামলের সব নেশার মধ্যেই কিছু তৈরি করার আনন্দ সর্বদা কাজ করে— আর যখন যা নেশা তাঁকে পেয়ে বসে, সেটার মধ্যে গভীর সমুদ্রের ডুবুরির মত চলে নিরন্তর অবগাহন। শ্যামলের এই গাড়ির নেশার পরিচয় আমরা পাই 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দিলীপ বসুর মাধ্যমে। লেখকের মত দিলীপ বসুও বানাবার জিনিস, বাড়াবার জিনিস পাবার জন্য জীবনের যাত্রাপথে যেন ওৎ পেতে বসে থাকে। একবার পেলে সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় সেই জিনিসটি। আবার এই দিলীপ বসু তো কুবের,

অনাথের নাগরিক সংস্করণ। তাই একে আমরা লেখকের 'অল্টার ইগো' বলতেই পারি। উপন্যাসে দিলীপ কাজ করে কোল ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে। ফলে কোল ইণ্ডিয়া কোম্পানির মোটামুটি একটা বিশ্বাসযোগ্য ছবি এখানে পাই। সরকারি অফিসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এখানে উদ্‌ঘাটিত করেছেন দিলীপ বসু। পেশাগত দক্ষতা অপেক্ষা মোসাহেবি প্রবণতা, গোষ্ঠীগত স্বার্থ, ইউনিয়নের হম্বি-তম্বি, কর্মদিবসের অপচয়, যোগ্য-দক্ষ কর্মচারীকে দিনের পর দিন বসিয়ে রেখে, কাজ করতে না দিয়ে নিজেদের দল (দক্ষতায় মরচে পড়া মানুষদের দল) ভারী করা, কর্মসংস্কৃতির গড়িয়ে গড়িয়ে চলা, রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির ঘুণ ধরা ইত্যাদি বিষয় এখানে উঠে এসেছে। আসলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর সত্তরের দশক থেকে বিভিন্ন বেসরকারি কয়লা খননকারি কোম্পানিগুলোর ন্যাশনালাইজেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানী তাদের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ একটি কোম্পানি। রাষ্ট্রায়ত্তকরণ হবার ফলে চাকরি সম্পর্কিত নিশ্চয়তা অনেক বেড়ে যায় এবং উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো ধীরে ধীরে গভীর অসুখের উপসর্গের মত দেখা দিতে থাকে। দিলীপ বসু সেই ঐতিহাসিক ট্রানজাকশন পিরিয়ডের অন্যতম সাক্ষী। দেড় দশকের ওপর কোল ইণ্ডিয়াতে চাকরি করে দিলীপের উপলব্ধি, ''এক এক সময় এদের অদ্ভুত লাগে দিলীপের। উঠতেও দেবে না তাকে। বাড়তেও দেবে না। প্রিয় দিলীপ— তোমাকে আমরা যে চেয়ারটি, যে টেলিফোনটি দিয়েছি— সেটি নিয়ে আমাদের পছন্দমত থাকো! ফাঁকি দাও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু বাড়তে চেয়ো না। তোমায় যেমন রাখতে চাই তেমন থাকো দিলীপ। এক একদিন ভালো গাঁইতি দিয়ে এই ফ্লোরটা আগাগোড়া তার উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।''[২৪]

ঠিক এই সময় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘাড়ে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন জোগাড়ের দায়িত্ব এসে পরে। প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে লেখক এই দায়িত্ব সাফল্যমণ্ডিত করার কাজে নেমে পরে। এই উদ্দীপনাই আমরা লক্ষ্য করতে পারি যখন দিলীপ বসু ভৌমিক ট্রাস্ট পরিচালিত খাদানের জন্যে ক্যাপিটাল সংগ্রহের কাজে নামে। কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপনের জন্য লেখক যেমন বিভিন্ন জায়গায় নানাবিধ লোকের সঙ্গে মেশার জন্য ছুটতে হয়েছিল— তারই হুবহু প্রতিফলন দেখতে পাই খাদানের জন্য ক্যাপিটাল সংগ্রহের কাজে। এই কাজ করতে গিয়েই হঠাৎ করে লেখকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় একদা বাল্যসখীর। বাল্যসখীর নাম রাণু। যে সময় লেখকের সঙ্গে দেখা হয়, সেই সময় রাণু একটি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর হয়ে কাজ করত। এর আগে বিবাহবিচ্ছিন্না রাণু বিদেশে গিয়ে ভুল ইংরেজীর সঙ্গে বিউটিশিয়ানের কোর্স করে এসেছিল। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর হয়ে রাণুর কর্মতৎপরতা

ভালো লাগে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের। মানুষকে আকর্ষণ করার একটা সহজাত দক্ষতা রাণুর মধ্যে দেখতে পায় লেখক। তাই রাণুকে কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজে সাহায্য করতে বলেন শ্যামল। রাণুকে নিয়ে লেখক যান হেওয়ার্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। হেওয়ার্ড তাদেরকে নেমতন্ন করে তার ভিলায় আসার জন্য। সেখানে রাণুকে দেখে শ্যামলের উপলব্ধি, ''রাণু খানিক বাদে সুইমিং কস্টিউম পরে এসে জলে ঝাঁপ দিল। সেই প্রথম আমি রাণুর ফিগার দেখলাম। দারুণ। ছোটবেলায় ভালবেসে কী বোকার মত মিনমিন করতাম। আসলে আমার মত লোককেই বোধহয় মেনিমুখো বলা হয়।

আমরা ছ'মাসের বিজ্ঞাপন পেলাম।''[২৫] শ্যামলের একদা এই বাল্যসখী রাণু এই উপন্যাসে রূপ পেয়েছে দিলীপের বাল্যসখী স্বাতী হিসাবে। হেওয়ার্ড সাহেব উপন্যাসে হয়েছেন স্যার লেজলি উড। উপরে উল্লিখিত ঘটনার প্রায় হুবহ প্রতিরূপ দেখতে পাই স্যার লেজলি উডের ফ্যামিলি ভিলায়। উপন্যাসেও স্বাতী দিলীপ বসুকে সাহায্য করেছে ভৌমিক খাদানের জন্য ক্যাপিটাল সংগ্রহে। কিছু কিছু ঘটনা মানুষের স্মৃতিতে একটা গভীর দাগ কেটে রেখে যায়। লেখকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সেই সব ঘটনা অনেক উপন্যাসে বারবার ফিরে এসেছে বিভিন্ন রূপে। এরকমই একটি ঘটনা ঘটে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিয় কর্মক্ষেত্রে। এই ঘটনার জন্য লেখক তাঁর প্রিয় কর্মক্ষেত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়। সহজেই অনুমেয়, ঘটনাটি শ্যামলকে সারা জীবন কষ্ট দিয়েছে। তবে যে ঘটনার কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেই ঘটনা পরবর্তী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর পদক্ষেপ লেখককে অনেক বেশি আহত করেছিল। এর ফলেই একটা বড় অভিমান লেখকের বুকে জন্ম নেয় পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রতি। ১৯৭৬ খ্রি. আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে লেখকের যখন শেষবারের মত সম্পর্ক ছিন্ন হয় তখন শ্যামল 'চিফ সাব এডিটর' পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে লেখক ও সাংবাদিক সন্তোষ কুমার ঘোষকে মতান্তরের ফলে শ্যামলের 'সোয়াইন' বলাকে কেন্দ্র করে ঘটনা ঘটেছিল। যদিও দু'জনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে মতান্তরের জন্য উভয়ের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে মাসখানেক ধরে— তবে 'সোয়াইন', 'থাপ্পড়', 'হাত ভেঙে যাওয়া' ইত্যাদি সেই ক্ষোভ প্রবাহের চরম পরিণতি। এই অপ্রীতিকর চরম মুহূর্তের অন্যতম সাক্ষী ছিলেন লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর 'Domestic enquiry', 'Letter of regret,' সাসপেন্সন, প্রতিষ্ঠান শ্যামলকে 'ক্ষমা' করে কাজে যোগ দিতে বলা ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। কিন্তু 'ক্ষমা' শব্দটি, সন্তোষকুমার ঘোষের

নিজের দুঃখ প্রকাশের চিঠি অফিসকে না দেওয়া কিংবা অফিসের চিঠিতে সেই চিঠির (সন্তোষকুমার ঘোষের চিঠি) উল্লেখ না থাকায় লেখকের মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। ফলশ্রুতি ইস্তফা। যদিও পরবর্তীকালে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। উপরে উল্লিখিত ঘটনাটির সঙ্গে আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পাই দিলীপ বসু ও তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অনাথ চক্কোত্তির ঝামেলায়—

''কেন? কি বলতে হবে তোমাকে? অনাথবাবু! আপনি!!

ইউ সোয়াইন—

সোয়াইন মানে কি জানো তুমি? এখুনি উইথড্র করো। নয়তো ব্যথা পবে—

একশোবার বলবো। সোয়াইন। সোয়াইন। সোয়াইন।

দিলীপের ডান হাত একখানা ধারালো কুড়োল হয়ে অনাথের গালের দিকে ছুটে গেল।''[২৬]

তবে বাস্তব জীবনে সন্তোষকুমার ঘোষ সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন লেখক। তিনি স্বীকার করেছিলেন সন্তোষকুমারের কাছ থেকেই তিনি কাজ শিখেছিলেন। প্রচুর ভালোবাসা-প্রশ্রয় পেয়েছিলেন। এজন্যই হয়তো যে উপন্যাসেই নায়কের অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে কোনও চরিত্র দেখানোর প্রয়োজন এসেছে, কিছু কল্পনার সংমিশ্রণে আমরা বারবার সন্তোষকুমার ঘোষকে ফিরে আসতে দেখি। উপরে বর্ণিত চরম মুহূর্তটিও নানান রূপে বিভিন্ন উপন্যাসে ফিরে এসেছে, অনেকটা সেজদার আত্মহত্যার ঘটনার মতো।

'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসের একটি অন্যতম চরিত্র দিলীপ বসুর একমাত্র ছেলে রবি। এই রবির মাধ্যমেই সত্তরের দশক যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের জন্য সমগ্র ভারতে চিহ্নিত হয়, সেই নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে। তবে নকশাল আন্দোলন বিষয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই এই বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার কোনও বক্তব্য আমরা পাই না। তবে রবির সঙ্গে মালবিকার, রবির সঙ্গে বিষ্ণুর এবং রবির সঙ্গে তার পিতা দিলীপ বসুর নকশাল আন্দোলন প্রসঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছে তাতে নকশাল আন্দোলনের বিপরীত দিকেই শ্যামলের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণিশত্রু চিহ্নিত করে মানুষ খুন করা শ্যামলের মত দিলীপ বসুও কখনও মেনে নিতে পারেনি। নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রসঙ্গে লেখক বলেন, ''আরও মুশকিলের কথা— আমার কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। কোনদিন মনে হয়নি— অমুকে ক্ষমতাচ্যুত হলে এবং সে জায়গায় অমুক এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সর্বদাই জানি রাষ্ট্র ও প্রশাসন মানে একটি অন্ধ কবন্ধ

দানব। সেজন্য কেউ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয়। এটা একটা ব্যবস্থা বা প্রথা।"[২৭] এজন্যই হয়তো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিপুল বৈচিত্র্যময় রচনাসম্ভারে একটিও সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস নেই।

'অলীকবাবু' উপন্যাসে আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কৈশোর থেকে যৌবনের মধ্যবর্তী অংশের সময়কে দেখতে পাই। সময়কাল বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক। এই দুই দশকের খুলনা, কলকাতা তথা দেশের তৎকালীন সমাজ, পরিস্থিতির আভাস এখানে পাই। এছাড়াও লেখকের ব্যক্তি জীবনের নানান ঘটনা-প্রসঙ্গ, লেখক হয়ে ওঠার পর্বের একটি সুস্পষ্ট ছবি পাই। লেখক বলেছেন, ''তখন যুদ্ধ চলে গেছে। পড়ে আছে ট্রেঞ্চ, ব্যাফেল ওয়াল, শহরের বাইরে মিলিটারির এয়ারস্ট্রিপ, কনডেন্সড মিল্ক, এ-আর-পি-র দমকল। কিছুকাল হল রেশন চালু হয়েছে। খবরের কাগজে পাশবিক অত্যাচারের খবর বেরোয়। পেনিসিলিন জিনিসটা ডাক্তাররা আলোচনা করেন। রমেনদের ছেলেবেলার শহরটা যুদ্ধ কাটিয়ে উঠে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে চাইছিল। সেই শান্ত নদী তীর। সন্ধ্যায় নির্জন রাস্তা। উনিশশো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সনের সামাজিক কাঠামো। কিন্তু তা তো হবার নয় আর! কন্ট্রাক্টর, পেনিসিলিন, দু'নম্বর খাতা, জালনোট এসে গেছে। এসে গেছে মানে-বইয়ের ডিউ পার্ট, রেশনের ডিউ স্লিপ।"[২৮] এটা সম্ভবত লেখক খুলনা শহরের কথা বলেছেন। কারণ ১৯৪৭ সালের দেশভাগের আগে পর্যন্ত লেখকের জীবন কেটেছে খুলনা শহরে। আর খুলনা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভৈরব নদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটেন তৈরি করে এ.আর.পি. (Air Raid Precautions) সার্ভিস। ভারতবর্ষ যেহেতু তখনও ব্রিটিশদের অধীনে ছিল এবং ভারতীয় সেনারাও ব্রিটেনের পক্ষ নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এ.আর.পি-র দমকল পরিষেবা চালু হয়। খুলনা শহর সেই সব অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি ছিল। এই খুলনা শহরের বাইরে ভৈরব নদীর ওপর রুজভেল্ট জেটি তৈরি করা হয়েছিল। অধুনা বাংলাদেশের খুলনায় এখনও পূর্ব নামেই সেই জেটি রয়েছে। তৎকালীন সময়ে অনেক বেকার যুবকদের কাছে অর্থ রোজগারের একটি অন্যতম উপায় ছিল মিলিটারি ফিল্ড টেলিফোনের তার। তারের গায়ের রবার তুলে ভেতরের ধাতুটা বিক্রি করত কেজি দরে।

বর্তমান একুশ শতকের ভারতবর্ষে সরকারি চাকরি পাবার ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের গুরুত্ব আর ততটা নেই। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত সরকারি চাকরি পাবার একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল এটা। লেখক ব্যক্তিগত জীবনেও এই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে নানা চাকরির পরীক্ষায় বসেছিল। অবশ্য কোনও সরকারি চাকরিতে তিনি সেরকম সুবিধা

করতে পারেননি। উপন্যাসের কাহিনিতে রমেন ঘোষের বড়দা লেখকের বাস্তব জীবনের বড়দার অনুকরণে নির্মিত। বাস্তব জীবনের বড়দা সুখেন্দুবিকাশ যখন দেখেছে তার এক ভাই শ্যামলের কিছু হচ্ছে না, তখন সংসারে আরও কিছু টাকা আনার জন্য শ্যামলকে নিয়ে যায় রেসের ঘোড়াদের আস্তাবলে, ''ট্যাকসি গিয়ে থামল রেসের মাঠ ছাড়িয়ে গঙ্গার গায়ে এক বাগানে। তখনো হেস্টিংসে এত ঘরবাড়ি হয়নি। এত অফিস-কাছারি, নাবিক-গৃহ হয়নি। কয়েকটা পুরনো দিনের বাগানবাড়ি। নির্জন। গঙ্গার বাতাস উঠে সেসব গাছের মাথা দোলায় সারাদিন। তারই অবিরাম শব্দ।

বড়দা সেরকমই একটা বাগানবাড়িতে আমায় নিয়ে ঢুকল। ঢুকতে ঢুকতে যাকে বলে সগর্বে— সেরকম মুখ করে বলল, এটা বর্ধমানের রাজার নিজের স্টেবল।

তখনো বুঝিনি। বড়দা আমায় নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল ফ্যামিলিতে যদি একজনও জকি থাকে তো মার দিয়া কেল্লা।''[২৯] এই ঘটনার অনুকরণ আমরা উপন্যাসে রমেন ঘোষের জকি হওয়ার চেষ্টা প্রসঙ্গে দেখি। শুধু তাই নয়, লেখক কাস্টম্‌সের লিখিত পরীক্ষায় পাশ করে শারীরিক সক্ষমতার (লং-জাম্প, হাই-জাম্প, ট্রাক-রেস) পরীক্ষায় গিয়ে কী রকম অপদস্থ, অপমানিত হয়েছিল, তারও বিবরণ লেখক উপন্যাসে লিখেছেন। আসলে এই উপন্যাসে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর যৌবনের যে অংশে সংসারের কিছুটা আয় বাড়াতে বড়দার তাড়নায় চাকরিতে ঢোকার লড়াই করে যাচ্ছিলো, সেই অংশের লড়াইয়ের কথা উঠে এসেছে। এরই সঙ্গে তৎকালীন সময়ে (দেশভাগ পরবর্তী সময়) সরকারি চাকরির অবস্থা, বেকার যুবকদের কথা উঠে এসেছে। অবশ্য আজ একুশ শতকে জনসংখ্যার ভারে ক্লান্ত ভারতবর্ষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কিছুটা সহজ ছিল সেই সময় চাকরি পাবার সম্ভাবনা। তাই কাহিনিতে আসল রমেন ঘোষ একটা কাজ পেয়ে যায়। আমরা জানি, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র উনিশ বছর বয়সে বেলুড় ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড স্টিল কোম্পানিতে (নিসকো) অ্যাসিস্ট্যান্ট স্মেলটার হিসাবে কাজে যোগদান করেন লেখক।

জীবনের এই সময় যখন চাকরি পাবার লড়াই চলছিল তখন লেখকের মনের অভ্যন্তরে আর এক ধরনের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছিল যা পরবর্তীকালে বনস্পতির আকার ধারণ করে। সেই বীজ হলো লেখক হবার মানসিক প্রক্রিয়া। এই পর্বের চিন্তাধারার একটা সুস্পষ্ট রূপ আমরা পাই এই উপন্যাসে। জীবনের নানান ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৈশোর জীবনেই শ্যামলকে অপমানিত, অপদস্থ, ব্যর্থতা ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু পরিবারের লোকজনের আশা, ভরসা, বিশ্বাস, প্রত্যাশা ইত্যাদি বজায় রাখার জন্য শ্যামলকে নানান রকম বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে

হত। তবে এই ধরনের কথা তো অনেকেই বলে। কিন্তু শ্যামল বুঝতে পারছিল তাঁর বানানো কথা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে অনেকেরই কাছে। ফলে এই রকম বানানো কথা বলা শ্যামলের কাছে নিয়মিত চর্চা হয়ে দাঁড়াল, ''একসময় অভ্যেস হয়ে দাঁড়াল— হলেও হতে পারে ব্যাপার-স্যাপার গম্ভীর হয়ে বন্ধুদের বলে যাই— যদি দেখি ওরা তাতে মজে যাচ্ছে— তো সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেললাম। লেখাটা পড়ে শোনালে কেউ কেউ বলতে লাগল— উ:, দারুণ! কেউ বা বলল—সাহিত্য!''[৩০] এই প্রক্রিয়ার কথাই তিনি বলেছেন 'অলীকবাবু' উপন্যাসে রমেন ঘোষের মধ্য দিয়ে। কীভাবে একজন লোফার বা লায়ার ধীরে ধীরে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হয়ে উঠল। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনেও এরকম একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল যেখানে তিনি লায়ার থেকে লোফার, লোফার থেকে লুম্পেন হিসাবে বাকি জীবন কাটাতে হত। কিন্তু মিথ্যে কথা বানিয়ে বলার ক্ষমতাকে তিনি সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতায় পরিণত করলেন। তবে শ্যামল বানিয়ে বানিয়ে বন্ধুদের সামনে যা বলত, তা সবটাই কাল্পনিক ঘটনা ছিল না। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যা হলেও হতে পারত এমন কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে বলত ও লিখত। এর ফলেই হয়তো অন্যের কাছে তা আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠত। কারণ আমাদের শ্রবণে ও পাঠে নিজেদের কল্পনাও কিছুটা কাজ করে। আর লেখক সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে বাস্তবতার সঙ্গে পরিমাণ মতো কল্পনা মেশানোর দক্ষতা অর্জন করতে থাকে। লেখকের মতে যা 'কেলাসিত সত্য'। উপন্যাসে শ্যামল বলেছেন, ''আরেকটা জিনিস পরিষ্কার হল— সে এমন কিছু জিনিস দেখতে পায়— যা আর কেউ পায় না। অনেক পরে বুঝেছিল— এই পুরো ব্যাপারটার নাম হল— দৃষ্টিভঙ্গি। বা দেখার চোখ। একই পৃথিবী সবার চোখের সামনে। লেভেল ক্রসিং। হিমসাগরের ডাঁই। পাকা কাঁঠাল। লোকাল ট্রেন। রিকশা সাইকেলের প্যাঁক প্যাঁক। পায়ে পায়ে বর্ষাকালের জলকাদা। এর ভেতরেও মানুষের একটা রূপ ফুটে ওঠে। ... দেখতে জানলেই দেখা যায়। এই দেখা কেউ শেখায় না। দেখতে দেখতে শেখা। জীবন হতে হতে জানা।''[৩১] লেখক হিসাবে পরবর্তীকালে বনস্পতি হবার ইঙ্গিত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের এই পর্বে ও 'অলীকবাবু' উপন্যাসে রমেন ঘোষের চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে পেয়ে যাই। কীভাবে ''ওভারল্যাপিং সীমান্তে সাবধানে দাঁড়িয়ে একজন হয়ে যায় লেখক— অথচ একই ধাঁচের আরেকজন হয়ে যায় লোফার, লায়ার, লুম্পেন। একজন আরেকজনের পরিপূরক। কিংবা আয়নার প্রতিচ্ছবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আসলের আইডেনটিটি ক্রাইসিস।''[৩২] লেখক হয়ে ওঠা শ্যামল (উপন্যাসে লেখক চরিত্র রমেন ঘোষ) এবং সম্ভাব্য লুম্পেন হয়ে ওঠা (হলেও হতে

পারত) শ্যামল (উপন্যাসে অলীক রমেন ঘোষ)— এই দু'জনের কাহিনি নিয়ে নির্মিত উপন্যাসটি। এভাবেই তিনি লেখক রমেন ঘোষের মধ্য দিয়ে লেখক হবার মানসিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা করে অন্যান্য লেখকদের লেখক হবার প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ ঐতিহ্য তুলে ধরেন। কারণ, আসল কথা হলো পাঠকের কাছে নিজের কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করা। তাহলেই পাঠক নিজের কল্পনার সহযোগে কাহিনির সঙ্গে নিজের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে। সেখানেই একজন লেখকের লেখক হিসাবে সিদ্ধি। তাই আমরা বলতেই পারি এটাই লেখক হবার প্রক্রিয়ার সাধারণ সনাতন ঐতিহ্য।

এই লেখক হবার প্রক্রিয়ার যাত্রাপথে নানান রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। যার মধ্যে কিছু অভিজ্ঞতা জীবনের অন্ধকার দিকগুলোর বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছিল লেখককে যৌবনের প্রথম পর্বেই। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্কুল কোড বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ছাত্র-রাজনীতি করার অপরাধে (বামপন্থী ছাত্র সংগঠন) ১৯৫১ সালে কলেজ থেকে বিতাড়িত হতে হয় শ্যামলকে। এরপর কর্মজীবনে প্রবেশ এবং সেই পর্বের পাট চুকিয়ে পুনরায় ১৯৫৪ সালে চারুচন্দ্র কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি হওয়া। বাইশ বছর বয়সে ট্রাম ভাড়া, কলেজের মাইনে ইত্যাদির জন্য টাকা নিতে অস্বস্তি হওয়ারই কথা। তাই টিউশানি জোগাড় করতে হয়। এই সময় সদ্য খোলা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে লেখকের যাতায়াত ছিল। সেই সময়কার ন্যাশনাল লাইব্রেরি সম্পর্কে লেখক জানাচ্ছেন, ''পড়ার লম্বা হলঘরটার কাচের বাক্সে বিশেষ বই বা পাণ্ডুলিপি রাখা হোত। বিশেষ করে যেদিন কোন বিদেশী অতিথি আসতেন— সেদিন সেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি বা বই ওই কাচের বাক্সে থাকত। তাছাড়াও সেদিন ওইসব দামী বই কাচের বাক্সের কাছে টেবিলে খুলে রাখা হত— যেন কেউ পড়তে পড়তে এই মাত্র জল খেতে উঠে গেছেন। বিদেশী অতিথি এই দৃশ্য দেখে পুলকিত হতেন।''[৩৩] এই লাইব্রেরির বারান্দাতেই লেখকের সঙ্গে দেখা হয় স্কুলফ্রেন্ড মনোজ ঘোষের। মনোজ ঘোষ ও তার পরিবারের মধ্য দিয়ে শ্যামল অভিজ্ঞতা লাভ করে জীবনের অন্ধকার দিক সম্পর্কে এবং ঘুষখোর পুলিশের জীবনযাত্রা বিষয়ে। আবার তৎকালীন সমাজ, সময়ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে 'সিদ্ধকামিনী' উপন্যাসে।

'সিদ্ধকামিনী' উপন্যাসে মনোজ হয়েছে 'পার্থসারথি দত্তগুপ্ত' ও লেখক নাম নিয়েছেন 'খোকন।' পার্থসারথির জীবনে অন্ধকার এসেছে দু'রকমের। একটা অন্ধকার কিছুটা হাল্‌কা ও ফ্যাকাশে। যেখানে মানুষ নিজের পরিচিতি একেবারে ভুলে যায় না। কিন্তু অন্য অন্ধকার হলো গাঢ়

ও গভীর। যেখানে মানুষ নিজের পরিচিতি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। তখন জীবন যেন হয় অনেকটা যন্ত্রচালিত রোবটের মত। পার্থসারথির জীবন এই দুই ধরনের অন্ধকারের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে। স্কুল জীবন থেকেই একটু একটু করে খারাপ হতে শুরু করে পার্থ। বিশ শতকের ষাটের দশকে ভারতে প্রথম নিরোধ তৈরি করা হয় জনসচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য। তারপর সেটা বাজারে ছাড়া হয়। ভারত সরকার ১৯৫০ সালেই 'জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা' কর্মসূচি গ্রহণ করলেও নিরোধ নিয়ে আসত বিদেশ থেকে। কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে তেমন জনপ্রিয় হয় না। তাই সুলভ মূল্যে নিরোধ সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ভারত সরকার ১৯৬৬ সালে কেরলের 'হিন্দুস্থান ল্যাটেক্স লিমিটেড' কোম্পানি থেকে নিরোধ উৎপাদনের কাজ শুরু করে। এই কাজ ভারত সরকারের 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ' মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষণে শুরু করা হয়। আর ১৯৬৯ খ্রি: জাপানের ওকামোটো ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় ভারতবর্ষে বাণিজ্যিকভাবে নিরোধের উৎপাদন শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের বাজারে চারের দশক থেকেই নিরোধ উপলব্ধ ছিল। পার্থ জানাচ্ছে, ''আমি চিরকালই সাবধানী। বিবিধ ভারতী তখনো নিরোধের গানটা ধরেনি। আমরা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের কিশোর। আমেরিকান সোলজারদের কৃপায় জিনিসটা পানের দোকানে এসে যায়।''[৩৪] পার্থসারথির বাবা নিত্যানন্দ দত্তগুপ্ত। স্বাধীনতার পূর্বেই কনস্টেবল হয়ে পুলিশের চাকরিতে যোগদান। তারপর যত দিন গিয়েছে প্রোমোশন পেয়ে উপরে উঠতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ঘুষ নেওয়ার পরিমাণও লাগামছাড়া হয়ে যায়। ফলশ্রুতি নিত্যানন্দের পেছনে ভিজিল্যান্স লাগা— হাতেনাতে ধরা পড়া— চাকরি থেকে সাসপেন্ড। নিজের কেস পুলিশ কোর্টে লড়তে গিয়ে তিনি দেখলেন, তার মত অসংখ্য পুলিশ রয়েছে। আইন ও আইনের ফাঁকফোকর ভালো জানতেন জন্যে তিনি অনেকের আনঅফিসিয়াল উকিল হয়ে গেলেন। দারোগা থেকে ইন্সপেক্টর সবাই আসতে লাগল পার্থর বাবার কাছে। সাসপেন্ড— প্রোমোশন— বেআইনি প্রোমোশন ইত্যাদি নানান সমস্যা নিয়ে পুলিশ অভিযুক্ত পুলিশ নিত্যানন্দ দাশগুপ্তের দ্বারস্থ হতে শুরু করে। এই কাজে নিত্যানন্দ এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে দু'জন টাইপিস্ট, সর্বক্ষণের জন্য কাজে রাখতে হয়। নিত্যানন্দ নিচু স্তর (কনস্টেবল) থেকে উঁচু স্তর (এস.পি.) উন্নীত হয়েছিল— তাই এই যাত্রাপথের নানান ফাঁক-ফোকর, আলো-অন্ধকার সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল পার্থর বাবার। আর তাছাড়া নিত্যানন্দ ঘুষ খেতে লজ্জা পেত না। ফলে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখান আইনের চোখে অভিযুক্ত নিত্যানন্দ হিরো হয়ে উঠল। এই নিত্যানন্দ

চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশি ব্যবস্থা আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। আইনের রক্ষক হয়ে আইনকে কাজে লাগিয়ে নিজের আখের গোছানো নীতিহীন কাজ করা— এই ধরনের মনোভাব সম্পন্ন বৃহৎ সংখ্যক পুলিশ আগাগোড়াই পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যে সক্রিয় ছিল। তার ফলেই হয়তো ধীরে ধীরে সাধারণ জনগণের বিশ্বাস কমতে শুরু করে পুলিশি ব্যবস্থার ওপর। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি উপন্যাস 'যতীন দারোগার বেদান্ত' উপন্যাসে কাশীপুর অঞ্চলের থানা, পুলিশ ও মানুষজন উঠে আসে। এই উপন্যাসেও যতীন দারোগার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পুলিশি সমাজ ব্যবস্থার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়ি ছেড়ে যখন তৎকালীন আর.এস.পি.-র পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর সহযোগিতায় ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কাশীপুরের একটি সরকারি আবাসনে উঠে আসেন লেখক তখন 'যতীন দারোগার বেদান্ত' উপন্যাসটি লেখেন।

শুধু পার্থসারথি নয়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসেই অনেক চরিত্রকে দেখি তারা ঘোড়ার রেসে টাকা লাগায়। কলকাতার নগরজীবনে তৎকালীন সময়ে এই জুয়া খেলা যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলো এবং প্রায় সর্বস্তরের মানুষই এই জুয়াতে টাকা লাগাতে পারত। ঘোড়ার রেস ভারতে জনপ্রিয় হবার মূলে ছিল ব্রিটিশরা। ব্রিটিশ আমলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। যেমন, মাদ্রাজ, কলকাতা ইত্যাদি। বাংলায় ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিনোদনের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম ঘোড়ার দৌড় আয়োজন করা হয়েছিলো। তবে ১৮৬০ খ্রি: থেকে কলকাতায় লর্ড উলরিখ ব্রাউনের উদ্যোগে ঘোড়ার দৌড় অন্য মাত্রা লাভ করে। প্রথম দিকে উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণির কাছে ঘোড়ার দৌড় জনপ্রিয় থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে ঘোড়ার দৌড় জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষ করে কলকাতায়। এই কলকাতাতেই এশিয়ার বৃহত্তম রেস কোর্স তৈরি করা হয় ১৮২০ খ্রি:। 'রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব' রেস কোর্সের দায়িত্বে আজ পর্যন্ত রয়েছে। ঘোড়ার রেস জনপ্রিয় হবার ফলে 'জকি' হওয়া একটা লোভনীয় কেরিয়ার ছিল তখন অনেকের কাছে। শ্যামলের নিজের বড়দা ঘোড়ার রেসে আগ্রহী ছিলেন এবং আমরা তো জানি, তিনি নিজেও একসময় চেয়েছিলেন শ্যামল 'জকি' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক। বন্ধু মনোজের মধ্য দিয়ে শ্যামলের পরিচয় হয় মনোজদের বাড়িতে আশ্রিতা এক মাসীর সঙ্গে। এই পরিচয় শ্যামলকে জীবনের অন্ধকার দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দেয়। তন্ত্র-সাধনা সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা লাভ করেন লেখক মনোজ ও মাসীর সূত্রে। লেখক বলেছেন,

''মাসীর ক্রিয়ায় বসাটা খোলসা হয়েছিল আমার কাছে আরও পরে। তখন মনোজ আরও ছন্নছাড়া। আরও ছিবড়ে। তখনই জানলাম— মানুষ মানুষকে খায়। খেয়ে শাঁস মজ্জা শুষে নিয়ে মাড়াই-আখ করে ফেলে দেয়। তখন সে স্রেফ জ্বালানি।

এইসব দেখে দেখেই কি আমি জীবনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি? আর তো তেমন স্বাদ পাই না! কোথায় যেন বিস্মিত হবার ক্যামেরাটা হারিয়ে ফেলে বসে আছি! কোন এক যাত্রা-পালায় হিরোইনের গান শুনেছিলাম— ''আমার কানের পাশা হারিয়ে গেল ওই ডোবায়—''[৩৫] এই মাসীর সমস্ত কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছে 'সিদ্ধকামিনী' উপন্যাসে। সঙ্গে রয়েছে তন্ত্র-সাধনার নানান বিষয়। যৌবনেই একটি পরিবারের চূড়ান্ত ভরাডুবি ও তন্ত্র-সাধনার অন্ধকারের সম্মুখীন হওয়ায় লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে, বৈচিত্র্যময় হয়েছে। কিন্তু লেখক জীবন সম্পর্কে আগ্রহ-উদ্দীপনা প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য হারানোর পর খুঁজে পাবার আনন্দ তো অনেক গুণ বেশি, তখন সেই জিনিসটার মূল্য আরও বেড়ে যায়। সময়ের স্রোত লেখককে বুঝিয়ে দেয় জীবন এই রকম। তাই পুনরায় যখন আগ্রহ-উদ্দীপনা ফিরে আসে তখন তা ক্রমশ বর্ধমান ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। তারই প্রতিফলন দেখি তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলোতে, তার জীবনদর্শনে। এভাবেই মানুষ বারবার ভেঙে পড়েও বারবার উঠে দাঁড়ায়। শুধু জীবনকে ভালোবেসে, জীবনের প্রতি মুখ করে। আর শ্যামল সেগুলো নুড়ি পাথরের মত সংগ্রহ করে নিজের অভিজ্ঞতার কোঁচড় ভরাচ্ছিল যা পরবর্তীকালে লেখকের রচনায় মণি-মুক্তোর মত উঠে এসেছে। অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি সময়-সমাজকে দেখার একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি অনেক আগে থেকেই ক্রীয়াশীল ছিল লেখকের মধ্যে।

লেখক ঔপন্যাসিক বীক্ষায় এই পৃথিবীর পাল্টে যাওয়া সময়কে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। রামধনু রঙের এই পৃথিবীর নানা বর্ণচ্ছটায় লেখক বিস্মিত হচ্ছিলেন। আর উপলব্ধি করেছিলেন, কোনও কিছুর জন্য সময় থেমে থাকে না। কারণ সময় ও জীবন সর্বদা গতিশীল। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে যে যন্ত্রণা বুকে নিয়ে নিজের জন্মভিটা ছাড়তে হয়েছিল, সেই যন্ত্রণার উপশম হয়তো কোনও দিন হয়নি লেখকের। তবে দেশ ছাড়ার পঁচিশ বছর পরে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ ভ্রমণে যান শ্যামল সেই যন্ত্রণায় মলম লাগাতে। লেখক বলেছেন, ''সেই যে চলে আসি ছেলেবেলার শহর পেছনে ফেলে— তার ছবি সবসময় মনে ভাসত। ছবিটা আসলে কাঁটার মত বিঁধে ছিল মনের ভেতর। সেই কাঁটা তুললাম ঠিক তার পঁচিশ বছর পরে। তখন পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় জওয়ানদের সঙ্গে ছোটবেলার শহরে ঢুকে দেখি কিছুই চেনা যায় না।"[৩৬] দেশভাগের পর উদ্বাস্তুরা দুই বাংলাতেই জনবিন্যাস, জীবন-যাপন, ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস ইত্যাদি সবকিছুর ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। লেখক যেহেতু কিশোর বয়সে দেশভাগের সময় এপার বাংলায় চলে আসে, ফলে বুকে যন্ত্রণা ও চোখে বিস্ময় ভরে বদলে যাওয়া সময়-সমাজকে নিরীক্ষণ করেছিল, ''কত জলা জমি— কচুরি পানায় ঢাকা পুকুর আজ জনপদ। বাঁশবাগান, শ্মশান, পোড়ো বাড়ি, ধোপার মাঠ, বাগানবাড়ি, ধ্যারধ্যারে গোবিন্দপুরে দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে নিরুপায় মানুষের দল দফায় দফায় এসে হাজির হয়েছে। তখন প্রায়ই গুলি চলত। কত লোকের টি.বি. হল। কত মেয়ে আস্তে আস্তে মেয়েমানুষ হয়ে গেল। কত ছেলে পকেটমার। পশ্চিম বাংলার মাঠে মাঠে এরাই এসে পাঠ চাষ শুরু করে দিল। এরা সংখ্যায় এত এল যে, একদিকটার বাংলা ভাষাই পাল্টে গেল। বাজারে জিনিসপত্রের চাহিদা অন্যরকম হয়ে গেল। কত স্কুল কলেজ গড়ে উঠল। রাস্তা হল। ইলেকট্রিক গেল। নতুন রেল স্টেশন জন্মালো। পিয়ারডোবা, গোদা পিয়াসাল, বাছুরডোবা, মানা, দণ্ডক, চান্দা জেলায়— দূর দূর জায়গায় খড়ের ছাউনি, নতুন বসানো টিউবয়েলের জল সম্বল করে নতুন নতুন জনবসতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা হল।"[৩৭] শ্যামলের বাবা মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় অবসর নেন দেশভাগের মুখে। তবে তার আগেই কলকাতায় শ্যামলের বড়দা সুখেন্দুবিকাশ ও মেজদা জ্ঞানেন্দুবিকাশ চাকরি পেয়ে যায়। ফলে শ্যামলদের কোনও উদ্বাস্তু শিবিরে (যেমন— তাহেরপুর কিংবা কুপার্স ইত্যাদি) লাইনে দাঁড়িয়ে সরকারি ডোল নিতে হয়নি। তবে শ্যামলের বাবা মতিলাল ও মা কিরণময়ীকে প্রথম পর্বে ঢাকার বাংলাবাজারে নতুন জীবন শুরু করার পর (মতিলালের বয়স তখন ২৭ বছর) দ্বিতীয় পর্বে চুয়ান্ন বছর বয়সে কলকাতার এক বাসাবাড়িতে নতুন জীবন শুরু করতে হয়। জন্মভূমির প্রতি অগাধ ভালোবাসা থেকেই হয়তো ওপার বাংলাকে উদ্বাস্তুরা সর্বদা পূর্ব বাংলা বলে এসেছে। আর এই ভালোবাসাই মনে হয় প্রভাব ফেলেছে 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর নামকরণে।

'ফিরোজা' উপন্যাসে লেখকের ভাবনা-চিন্তা- অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করেছে 'খোকন' চরিত্রটি। আর 'লুৎফর' চরিত্রে ছায়া রয়েছে শ্যামলের একদা স্কুলের বন্ধু ফেরদৌসের। উপন্যাসের কাহিনি অবশ্যই কাল্পনিক কিন্তু তৎকালীন সময়ে দুই বাংলার ছবি ও দেশভাগ সম্পর্কিত নানান ভাবনা শ্যামলের দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ ও ৭২ সালে বাংলাদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রসূত। ফলে দুই বাংলার অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ। বাকিটা কল্পনাশক্তির মাধ্যমে কাহিনিকে

সাহিত্যে উত্তীর্ণ করা। আমরা এখানে কিছু ছবি ও ভাবনা কোটেশনের আকারে তুলে ধরব যা দুই বাংলাকে বুঝতে খানিকটা সাহায্য করবে—

ক. ''গত পঁচিশ বছরে আমরা রেল লাইনের দু'ধারের জলা জমি, পোড়ো মাঠে বসতি বসিয়েছি, রাস্তা করেছি, আলো এনেছি, স্কুল কলেজ করেছি। এই কলকাতার অনেক জায়গায় আমরাই ফেরিওয়ালা, আমরাই খদ্দের, আমরাই দোকানি, আমরাই মুটে, আমরাই ছাত্র।" [পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের বাসস্থান/'ফিরোজা', পৃ. ১৬৮]

খ. ''বেগার খাটিয়ে দ্যাখ লক্ষ লক্ষ টাকার মাটি কাটিয়ে বাংকার বানিয়েছিল শালারা। একটা লোককেও পয়সা দেয়নি নিশ্চয়। খাতায় মজুরি লিখে সব টাকা নিজের নামে করাচি কিংবা লাহোরে ব্যাংকে জমা পাঠিয়েছে। দেশে ফিরে সুখ করবে ভেবেছিল।" [পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধকালীন অবস্থা/'ফিরোজা', পৃ. ১৬৯]

পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের সময় শেষদিকে যখন পশ্চিম পাকিস্তানের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় এবং ভারতবর্ষের যুদ্ধে যোগদানের জন্য তখন পশ্চিম পাকিস্তানের হয়ে লড়াই করা পূর্ব পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়াররা নির্বিশেষে খুন করতেন না। মাথা পিছু কিছু টাকা আদায় করে ভারতে চলে যেতে বলতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যতম সমর্থক ছিল বিহারি মুসলিম মানুষ। তাদের হাতে রাইফেল তুলে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানেই গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের নীতি নির্ধারকরা। তবে এমন অনেক পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মানুষও ছিলেন যারা প্রাণ ভয়ে রাজাকারদের দলে নাম লিখিয়েছিল। এরাই অবশ্য মুক্তিযোদ্ধাদের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করত। হার নিশ্চিত জেনে শেষদিকে পাকিস্তানী সোলজাররা আরও বেশি অমানবিক ও নির্মম হয়ে ওঠে। মেশিন দিয়ে কেমিক্যালের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে পাড়ার পর পাড়া আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। নতুন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর নবগঠিত সরকারের একটা অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে আর্মস ফিরিয়ে নেওয়া। লেখক 'ফিরোজা' উপন্যাসে দেখাচ্ছেন, ''চায়ের দোকানে ছেলেরা চা খাচ্ছে, গুলতানি করছে, গালে দাড়ি, পিঠে তাদের সাবমেশিনগান। রাস্তা দিয়ে দশ চাকার লরি বোঝাই হয়ে ছেলেরা ফিরছে। লরির মাথায় মুজিবর রহমান আর ইন্দিরা গান্ধীর ছবি। ... শহরটা নাকি এখন মেজর জলিলের হাতে। খালিসপুর আর ফেরিঘাটে বিহারীদের একত্র করে পাহারায় রেখেছে ইণ্ডিয়ান আর্মির বিগ্রেডিয়ার জেইল সিংহের সোলজাররা।"[৩৮]

স্মৃতি আকুলতা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৪৩ খ্রি: কাননবালা দেবী অভিনীত চলচ্চিত্র 'যোগাযোগ' খুলনার মায়ের (লেখকের তৎকালীন বয়স অনুসারে) বয়সী মহিলাদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষ করে কাননবালা দেবী ব্যবহৃত ঘটি হাতা ব্লাউজ। লেখকের স্মৃতির দুয়ারে খুলনার 'উল্লাসিনী' সিনেমা হলের থেকে 'যোগাযোগ' দেখে ফেরা মহিলাদের ঘটি হাতা ব্লাউজ পরার প্রবণতা ভেসে ওঠে। লেখকের নিজের মা কিরণকুমারী দেবীও সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে ভালোবাসাতেন। সার্কাস সেই সময়কার জনজীবনে অন্যতম একটি বিনোদনের (বিশেষ করে বাচ্চাদের) বিষয় ছিল। লেখক স্পষ্ট মনে করতে পারতেন তাদের শহরে (খুলনা) সার্কাস এলে ডিট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লাগত। না হলে গরীব মানুষেরা ঘটি, বাটি, থালা ইত্যাদি বন্ধক রেখেও সার্কাস দেখতে যাবে। ফলে গরীব মানুষ সাময়িক বিনোদনের জন্য আরও গরীব হয়ে যাবে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে এই রকমের সতর্কতা গ্রহণ করা হতো। লেখকের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস ও অব্যবহিত পরের ঘটনাক্রমও রয়েছে। সেই বিষয়টি স্মৃতির সঙ্গে লেখকের বড় বেলার যুক্তি-বুদ্ধি মিশিয়ে বর্ণনা করেছেন এভাবে—''রবীন্দ্রনাথ মারা গিয়েছেন শুনে হেডস্যার স্কুলে ছুটি দিয়েছিলেন। ... ক্যালেণ্ডার কোম্পানিগুলো সে বছর অসংখ্য দাড়িওয়ালা ছবি ছেপে রবীন্দ্রনাথকে বাংলার ঘরে ঘরে ব্যাটারি, আলতার অ্যাভারটাইজমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে পিপল্‌স পোয়েট করে দিল দু'মাসের ভেতর। কলকাতার বাইরে তো সে আমলে এত রবীন্দ্রজয়ন্তী ছিল না— রবীন্দ্রসংগীতও এত যত্রতত্র শুনতে পাওয়া যেত না সে সময়ে। নাইন্টিন ফর্টিওয়ান টু-তে রবীন্দ্রনাথকে ছড়িয়ে দেবার মূলে ছিল এইসব ক্যালেণ্ডার— কানন দেবী, পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত।''[৩৯]

এভাবেই পুরো উপন্যাস জুড়ে নানান টুকরো টুকরো ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। ১৯৭২ সালে যখন শ্যামল সোলজারদের গাড়িতে চড়ে নিজের জন্মভূমি খুলনা শহরে পৌঁছান তখন 'স্মৃতিক্লিষ্ট', 'শৈশব ভারাক্রান্ত' হয়ে ওঠেন লেখক। পুনরায় নিজের জায়গা, পরিবেশ, দাপিয়ে বেড়ানো শৈশব-কৈশোরের (প্রথম পর্ব) ক্ষেত্রগুলো দেখে নস্টালজিয়ায় ভুগতে থাকেন লেখক। পঁচিশ বছর ধরে যে ধারণা-ভাবনার জন্ম হয়েছে— তা স্মৃতি খুটে খুটে দেখতে থাকেন। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি পাতাতে তার নিদর্শন ছড়ান। দেশভাগ বিষয়ে, উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া বিষয়ে ও ধর্ম বিষয়েও এখানে লেখক তাঁর ভাবনা-বিশ্বাস খোকন চরিত্রের মাধ্যমে অকপটে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্বাভাবিক অবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে কোনও শূন্যস্থান থাকতে পারে না। ১৯৪৭-এর

দেশভাগের পর বৃহৎ সংখ্যক মানুষ তাদের জীবিকা-ভিটেমাটি ছেড়ে এপার বাংলায় চলে আসার ফলে ওপার বাংলায় একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। ওপার বাংলার অনেক মানুষই সেই সুযোগটা গ্রহণ করে। ফলে একটা নবীন তরুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের জনগণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বড় সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাওয়ার মত। কারণ লেখক মনে করেন, যে কোনও দেশের পক্ষে বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। দেশের যে কোনও সমস্যা, প্রতিবাদ, আন্দোলন ইত্যাদির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার জন্য দরকার হয় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে কোনও দেশ বা জাতির ক্ষেত্রে মেরুদণ্ড স্বরূপ। বয়েস নবীন, তরুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণি হবার জন্য নবগঠিত বাংলাদেশের সামনে আরও উন্নতি, বিকাশের অপার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর ইতিহাস সাক্ষী, বর্তমান বাংলাদেশের গ্রোথ রেট তৃতীয় বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। এভাবেই লেখক সময়ের একটি ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। আর শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভাবেই হয়তো পাকিস্তানে বারবার মিলিটারি শাসন কায়েম হয়েছে কিংবা একুশ শতকে এসেও পাকিস্তান দেউলিয়া হবার পথে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর জীবন সম্পর্কে বরাবর অকপট। নিজের প্রিয়জন সম্পর্কেও, নিজের প্রিয়জনের কাছেও। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইতি সান্যালের সঙ্গে বিয়ে হবার একত্রিশ বছর পরে একটি মেয়ে আসে লেখকের জীবনে। ষাট বছর বয়সের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লেখকের অনুভূতির জগতে মেয়েটি তীব্র আলোড়ন ফেলে দেয়, ''... প্রায় ৩০/৩৫ বছর কেউ আর আমাকে নাম ধরে ডাকে না। কাকা— না হয় দাদা— কিম্বা জেঠু অথবা দাদু বলে সবাই। ও এসেই বলল— 'শ্যামল, দেখে হাঁটো, আছাড় খাবে।' শুধু শ্যামল বলায় এত ভালো লাগল কী বলব। আমিও তাকে বললাম, 'সাবধান।''[৪০] ইতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মতানুসারে শ্যামল যখন ব্রহ্মপুরের বাড়িতে বসে তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'শাহজাদা দারাশুকো' লিখছিলেন, তখন এই মুগ্ধ পাঠিকার আবির্ভাব। ইতি গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, ''সেই মুগ্ধ পাঠিকার সঙ্গে শ্যামলের সম্পর্ক গ্রন্থাগারের বই, মোঘল সাম্রাজ্য সম্পর্কে জোগাড় করা তথ্য এবং আরও অনেক কিছু পেরিয়ে এক অন্য নিবিষ্টতায় পৌঁছল। যাকে এক অর্থে বলে প্রেম।''[৪১] এই সম্পর্ক শ্যামলের জীবনে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ ও মানসিক দূরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার একটা কারণ ছিল শ্যামলের কোনও বিষয়েই সেরকম কোনও লুকোছাপা কোনও দিন ছিল না। মুগ্ধ পাঠিকার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অকপট। শ্যামলের জীবনে এই সম্পর্কের গুরুত্ব এই বিষয় থেকেও অনুমান

করা যায় যে, ১৯৯০ সালের পরবর্তী সময়ে লেখা (আমৃত্যু পর্যন্ত) বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে এই মুগ্ধ পাঠিকার সঙ্গে সম্পর্ক বিভিন্ন রূপে লেখকের কলমে বারবার উঠে এসেছে। আমরা এখানে এরকম কিছু উপন্যাসের কথা তুলে ধরছি। 'শাহজাদা দারাশুকো' (১৯৯১) উপন্যাসে শাহজাদা দারাশুকোর সঙ্গে রানাদিলের সম্পর্ক, 'বাম অলিন্দ' (১৯৯০) উপন্যাসে এগজিকিউটিভ আর্কিটেক্ট রঘুনাথ সেনের সঙ্গে জয়শ্রী বসুর সম্পর্ক, 'তারসানাই' (১৯৯৩) উপন্যাসে এসরাজ শিল্পী সুধীর পালিতের সঙ্গে সোহিনীর সম্পর্ক, 'অদৃশ্য ভূমিকম্প' (১৯৯৪) উপন্যাসে লেখক কনক পালিতের সঙ্গে সোহিনীর সম্পর্ক, 'কন্দর্প দর্পণ' (১৯৯৪) উপন্যাসে 'হলিডে-ইন' হোটেলের মেশিন ঘরের অপারেটিং সুপার তুষার সরকারের সঙ্গে তপতী দত্তের সম্পর্ক, 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' (১৯৯৭) উপন্যাসে লেখক সমরেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে ইরা দত্তের সম্পর্ক, 'সূর্যাস্তের আগে' (১৯৯৮) উপন্যাসে রিটায়ার্ড কাস্টম্‌স অফিসার নীলাম্বর হালদারের সঙ্গে মন্দিরার সম্পর্ক। 'ভোরবেলার ভালোবাসা' (১৯৯০) উপন্যাসে লেখক মাণিকলাল মিত্রের সঙ্গে জয়শ্রী পালিতের সম্পর্ক। এই উপন্যাসগুলোতে এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে আমরা শ্যামল ও আর তাঁর সঙ্গে মুগ্ধ পাঠিকার সম্পর্কের প্রভাব দেখতে পাই। উপন্যাস আলাদা, প্রেক্ষাপট-পরিবেশ আলাদা, চরিত্র আলাদা কিন্তু উপরিউক্ত প্রতিটি সম্পর্কে কিছু সাধারণ ভাবনা, বিষয় ও বক্তব্য রয়েছে যার মধ্য থেকেই আমাদের মনে হয় প্রতিটি সম্পর্কই একটি সম্পর্কের অভিজ্ঞতারই রকমফের। আমরা যদি এখানে সম্পর্কগুলোর সাধারণ বক্তব্য-ভাবনা তুলে ধরি, তাহলে সেই সময়ে লেখকের মনোভাবের একটি লেখচিত্র পাওয়া যাবে। যথা—

ক. প্রতিটি সম্পর্কেই নায়ক চরিত্রের বয়স পঞ্চাশোর্ধ। নায়িকা মেয়ের বয়সী বা তার থেকেও কম। নায়কের জীবনের প্রায় শেষ পর্বে নায়িকার আগমন ঘটে।

খ. নায়ক চরিত্র বিভিন্ন পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে ক্লান্ত। বাবা, স্বামী, শ্বশুর, দাদু ইত্যাদি ভূমিকার বাইরে ব্যক্তি মানুষ হিসাবে স্বতন্ত্র কোনও পরিচয় বিলুপ্তের পথে। ব্যক্তি মানুষের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে বিভিন্ন পারিবারিক সম্পর্কের নিরিখে নিজের স্বপ্ন-সাধ আকাঙ্ক্ষাকে পরিমার্জিত-নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। ফলে নায়ক চরিত্রের অস্তিত্বের সংকটে ভোগা।

গ. ''হয়ত ওর ভেতর স্বামী বলতে যে-ছবিটা আছে— তাও আমি হয়ে উঠতে পারিনি ডাক্তার। কিন্তু ধরো— সন্ধ্যেবেলা জানতে চাইলাম— আজ কি খাবো রাতে? সঙ্গে সঙ্গে ওর জবাব— তুমি বলো। যা বলবে তাই হবে। একবার কি ও নিজে একটা মেনু করতে পারে না।

খাবার টেবিলে মুখোমুখি খেতে বসলে মনে হয়— অপারেশন টেবিলের দু'দিকে দু'জন বসে আছি। আমি ফলি মাছ ডিসেক্ট করে কাঁটা বেছে চলেছি। ও ডাল ঢেলে ফেলে হিমোগ্লোবিন খুঁজে পাচ্ছে না।" [তারসানাই, পৃ. ৪০]

ঘ. জীবনের শেষ পর্বে এসে উপলব্ধি করা, সারাটা জীবন ধরে সংসারের শুধু চাহিদা মিটিয়ে এসেছে। সংসারের যেখানে যেখানে গর্ত নজরে এসেছে, সেই প্রয়োজনের গর্ত বুজিয়ে এসেছে। সংসারে শুধু একজনের জন্য কিছু করা হয়নি। তা হলো সে নিজে। নিজেকে সংসারে মনে হয়েছে প্রয়োজন মেটানোর একটি যন্ত্র।

ঙ. "শিখা, আমি তোমাকে মহুয়াকে, তপতীকে— সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কেউ তোমরা রাজি হলে না। অথচ আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতে পারতাম। কোন অসুবিধে ছিল না। ... আমি একই সঙ্গে অনেককে ভালোবাসতে পারি। ভালোবাসতে চাই—" [কন্দর্প দর্পণ, পৃ. ১৩৪]

ছ. দুই নারীর মধ্যে একজন (স্ত্রী) ডিভোর্স দিতে রাজি নয় অন্যজন (প্রেমিকা) ডিভোর্স নেবার ওপর বেশি জোর দেয়— যাতে তারা নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে। এদিকে নায়কের মধ্যে এতদিনকার স্ত্রী-সংসারকে ছেড়ে আসার দ্বিধাগ্রস্ততা। এই দ্বিধা কাটানোর জন্য নায়কের অভিনব প্রস্তাব— তিনজনে মিলে একসঙ্গে থাকা। দুই নারীরই তীব্র প্রতিবাদসহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

এই ধরনের কিছু ভাবনা-বক্তব্য ছিল সেই সম্পর্কগুলোর সাধারণ যোগসূত্র। আসলে হয়তো শ্যামলের ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে তথাকথিত একঘেয়েমি বাসা বেঁধেছিল। লেখা ও সংসার নিয়ে নিয়মিত নাড়াচাড়া করার ফলে দাম্পত্য জীবনের একটা পর্বে শীতলতা এসে যায়। জীবনে এক ধরনের শূন্যতা, অভাববোধ অনেক অগে থেকেই হয়তো তৈরি হচ্ছিল— সেই মুগ্ধ পাঠিকা এসে সেটাকে জাগিয়ে তোলে। আর শ্যামল মানেই জীবনকে নানান ভাবে আস্বাদন করা। ফলে সম্পর্ক অতি সহজেই নিবিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এই সম্পর্কগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা শ্যামলের ত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের মানসিকতার একটা আভাস পাই। কিন্তু একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই মনোভাব লেখকের দাম্পত্য জীবনের পুরো সত্য নয়। তবে এই সম্পর্ক যে শ্যামলকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, তা বোঝা যায় এতগুলো উপন্যাসে সেই সম্পর্ককে নানান রূপে আঁকা। জমি, ফসল, গাড়ির নেশার মত এই সম্পর্কের নেশাও একদিন কেটে যায় শ্যামলের জীবন থেকে। স্ত্রী ইতি গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "আবার শ্যামলও ছিল ভেতরে ভেতরে পরিবারের

মধ্যে মজে থাকা একটি লোক। ঝড়ের মতো সেই মুগ্ধ পাঠিকা শ্যামলের জীবনে এলেও, চলে তাকে যেতেই হত, গেলও। কিন্তু ওই যে শ্যামলের কোনো গোপন ছিল না। ছিল শুধুমাত্র জীবন।"[৪২]

বিবাহিত জীবনের আগে ও পরে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বারবার প্রেমে পড়েছে। ছোটবেলার এক প্রেমিকার নাম ছিল রাণু। যাকে আমরা পাই 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসে 'স্বাতী' নামে। 'পরীর সঙ্গে প্রেম' উপন্যাসে পাই 'রাধা' নামে। বিদেশে পড়াশোনা করা, শ্যামলকে 'শ্যামলু সোনা' (লিপস্টিক দিয়ে লেখা) বলে চিঠিতে সম্বোধন করা মীরা সরকার নামে মেয়েটিও বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে ('তুষারহরিণী', 'ব্রিজের ওপাশে', 'ফোয়ারার ওপারে', 'অরবিন্দবাবুর ডায়েরি এবং স্ত্রী' ইত্যাদি ছোটগল্প, 'বৃহন্নলা' উপন্যাস) উঠে এসেছে। বাল্যবন্ধু মনোজের বোন আশার প্রতি দুর্বলতা উঠে এসেছে 'সিদ্ধকামিনী' উপন্যাসে। শ্যামলের নারী প্রেমের ঘটনা-প্রসঙ্গ আমরা আরও অনেক উপন্যাসে দেখতে পাই। যেমন— 'পরস্ত্রী', 'সরমা ও নীলকান্ত', 'সতী-অসতী', 'যতীন দারোগার বেদান্ত', 'নতুন নগরের চিন্ময়ী' , 'টানেলের ভেতরে ট্রেন', 'বড় হওয়ার আগে' ইত্যাদি উপন্যাস। অবশ্য এই বিষয়ে ইতি গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ''বিয়ের আগে ও পরে আজীবন শ্যামলের কাছে ঘুরে ঘুরেই প্রেম এসেছে। শ্যামল অংশ নিয়েছে তাতে। মনে হয়, শুধু প্রেমের জন্যেই প্রেম করেনি শ্যামল। প্রেম ও সম্পর্কগুলো ধরা দিয়েছে লেখা হয়ে।"[৪৩] তবে 'শাহজাদা দারাশুকো' লেখার সময় যে 'মুগ্ধ পাঠিকা' শ্যামলের জীবনে এসেছিল সেটাই হয়তো বিবাহ বহির্ভূত শেষ নারীপ্রেম। অনেকেই মনে করেন লেখক 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন সেই মেয়েটির নামেই। আর উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে, 'শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়/কল্যাণীয়াসু'। আর আমরা তো দেখেছি 'কল্যাণীয়াসু' শব্দটির প্রয়োগে শ্যামলের দ্বিধাবোধ 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাসে ও এই ধরনের উপন্যাসগুলোতে।

গ্রন্থাকারে ১৯৯৭ সালে প্রথম প্রকাশিত 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাসটি দু'টি কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক, এই উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস'শাহজাদা দারাশুকো' (সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত) রচনার সময় লেখক-মানসিকতার খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। দুই, 'শাহজাদা দারাশুকো' লেখার সময়ই লেখকের জীবনে মুগ্ধ পাঠিকার আবির্ভাব ঘটে। সময়ের ব্যবধানে মুগ্ধ পাঠিকার সঙ্গে সম্পর্কের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ছবি 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাসেই পাওয়া যায়।

১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জুবিলি পার্কের বাড়ি ছেড়ে লেখক ব্রহ্মপুরের সমীর রায়চৌধুরীর বাড়িতে

এসে ওঠেন। বাড়িটি সব দিক থেকে ভালো হওয়া সত্ত্বেও একটি বড় সমস্যা ছিল। সমস্যাটি হলো মশাদের ভয়ানক উপদ্রব। লেখক এই সমস্যার সমাধান করে এই ভাবে, ''আড়াইশ টাকা দিয়ে লোকাল লেপতোশকের দোকান থেকে একটা মশারি বানালাম। দশ ফুট বাই দশ ফুট বাই দশ ফুট। দিনের বেলায় সেই ঢাকা বারান্দায় মশারি টাঙিয়ে তার ভেতরে টেবিল-চেয়ার নিয়ে লিখতে বসি। খিদের জ্বালায় মশারা মশারির বাইরে গান গায়। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় লোকে বলে বুড়োটা লিখতে বসেছে। দিনেরবেলায় মশারি টাঙিয়ে।''[৪৪] ব্রহ্মপুরের ভাড়া বাড়ির বৃহৎ মশারি টাঙানো বারান্দাতেই সৃষ্টি হয়েছিল 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসটি। অবশ্য আরও কিছু উপন্যাস এখানে রচিত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার জন্য শ্যামলকে বিপুল পরিশ্রম করতে হয়েছে। এই উপন্যাস লেখার আগে লেখার জন্য শ্যামলের পরিশ্রম ছিল মূলত কায়িক। নিজেকে সর্বদা অনিশ্চয়তা, বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া, নিজের জীবনচর্যা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, স্মৃতিচারণ এবং নিজের নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে লেখার বিষয়বস্তু উঠে আসত। কিন্তু 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসটি লেখার জন্য শ্যামলের পরিশ্রম ছিল মূলত বৌদ্ধিক। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মোঘল রাজবংশ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ঐতিহাসিক, পণ্ডিত, অধ্যাপকগণদের। আমন্ত্রিত মানুষদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক অমলেন্দু দে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকতেন লেখক। বাড়ির বইয়ের তাক্ ভরে গিয়েছিল মোঘল রাজবংশের সময়কার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুস্তকে। শুধু তাই নয়, শিক্ষক রেখে শিখতে হয়েছিল উর্দু ও ফারসি ভাষা। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি লেখার প্রেক্ষাপটে লেখকের কিছু ভাবনা তুলে ধরব 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাস অবলম্বনে—

ক. ''ভেবেছিলাম একটা পিরিয়ড নভেল লিখব। অনেকেই তো অনেক কাহিনী লেখে। কিন্তু চলে যাওয়া সময়ের মানুষগুলোকে ফের জ্যান্ত করে তোলায় একটা আনন্দ আছে।''[একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, পৃ. ১৫৮]

খ. ''এক একসময় মনে হয়— এই বাতাসের ভেতরই মিশে আছে আঠেরশ বত্রিশ, সাতান্ন, তেষট্টি। উনিশশ ষোল, সাঁইত্রিশ, বিয়াল্লিশ। শুধু সন্না দিয়ে আলতো করে সময়ের পাতলা পর্দা তুলে ফেললেই সব বেরিয়ে পড়বে। তখনকার মানুষ জানত না এখন কী ঘটবে। আমি এখন যা ঘটছে— তা দেখতে পাচ্ছি। আমার আজকের এই দেখাটা তখনকার সময়ে তখনকার মানুষের ভাবনায় দেখাতে পারলেই ঐতিহাসিক উপন্যাসে ভবিষ্যতের আগাম আভাস আঁকা যায়।'' [একটি

ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, পৃ. ১৫৮]

ব্রহ্মপুরের ভাড়া বাড়ির মশারি ঢাকা বারান্দায় বসে সৃষ্টি করে চলেছেন মোঘল রাজবংশ নিয়ে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। লেখকের মতে এই রচনা 'কুটির শিল্প'। বাইরে থেকে শুধু শিল্পের কাঁচামাল (তথ্য) এনে বাড়িতে বসেই বিভিন্ন তথ্য সহযোগে কল্পনাশক্তির সাহায্যে এমন আস্বাদময় সাহিত্য রচনা করেছেন লেখক। আর 'মুগ্ধ পাঠিকা' যার উপন্যাসের কাহিনিতে নাম 'ইরা', তিনি লাইব্রেরী থেকে নোট করে লেখকের তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। লেখক বলেছেন, ''... ইরা শিপ্রার ভালমন্দ উপন্যাসের দুই নায়িকার মুখে ভালমন্দ হয়ে বসে যেতে লাগল। এছাড়া আমি আর কোন রাস্তা পাচ্ছি না। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগের ভারতবর্ষের দুই ঐতিহাসিক নারী। তাদের মনের ভেতরটা আমি আজকের ইরা আর শিপ্রাকে দিয়ে গড়ে দিতে লাগলাম।"[৪৫] এই দুই নারীর মাঝখানে শাহজাদা দারাশুকোর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন সাড়ে তিনশ বছর পরেকার সমরেন্দ্রনাথ বসুর (উপন্যাসের কাহিনিতে) ওরফে লেখকের জীবনের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা। তাই দারাশুকোর মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং মিশে গিয়েছেন, ''... দুই নারীর মাঝে ঐতিহাসিক পুরুষটির চোখে তার সাড়ে তিনশ বছর পরেকার সমরেন্দ্রনাথ বসুর জীবনের বিষাদ, আহ্লাদ, ক্ষোভ। তাই ওই কুটির শিল্পে আমি নিজেও কোথাও কোথাও রয়ে গেলাম।"[৪৬] এভাবেই লেখকের ভেতরে একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। বাইরে থেকে লেখকের দৈনন্দিন জীবনচর্যা দেখলে মনে হবে, একজন বুড়ো মানুষের শেষ বয়সে এসে ভীমরতি হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে লেখক তাঁর মিশ্রণ ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজের দৈনন্দিন জীবন-ভামা তুলে ধরেন। 'মুগ্ধ পাঠিকা'র সঙ্গে লেখকের সম্পর্কের রসায়ন প্রভাব ফেলে দারাশুকো ও রানাদিলের সম্পর্কে। বানাদিল যেন হয়ে উঠেছে 'মুগ্ধ পাঠিকা' ওরফে ইরা-র (একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাসের কাহিনিতে নাম দিয়েছেন লেখক) প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র। লেখক বলেছেন, ''ইতিহাস থেকে একটা উপন্যাস আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। মরা স্যাটেলাইটে আজকের আকাশ ভর্তি। সেরকম একটা স্যাটেলাইট হয়ে পড়ে আছি। বইয়ের আণ্ডিলের ভেতর ডিকশনারি হয়ে বসে আছি। তার ভেতর থেকে আস্তে আস্তে পুরুষ হয়ে উঠছি। প্রেমিক হয়ে উঠছি।"[৪৭] এখানে সমরেন্দ্রনাথ বসু আসলে লেখক স্বয়ং এবং 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসে শাহজাদা দারার মধ্যে কোথাও কোথাও লেখক নিজেই অবস্থান করেছেন। অবশ্য আমরা তো জানি, সাহিত্যিক চরিত্র বাস্তব চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে কিন্তু হুবহু অনুসরণ

প্রথম শ্রেণির সাহিত্যে সাহিত্যগত কারণেই সম্ভব নয়। আর ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্রের ক্ষেত্রে তো বেশি মাত্রায় প্রভাবিত হওয়াই সম্ভব নয়।

সাহিত্য-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখতে এই ধরনের নানান মানসিকতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল হয়তো লেখককে। অন্যতম শক্তিশালী উপন্যাসের প্রসব যন্ত্রণা আমরা 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাস পাঠে কিছুটা অনুভব করতে পারি। লেখক বর্তমান সময়ের রাগ-ক্ষোভ, ভালোবাসা-অভিমান, জয়-পরাজয়, রাজনীতি-কূটনীতি ঐতিহাসিক পরিবেশে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক চরিত্রদের মধ্যে নিপুণ শিল্পীর মত বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাই 'শাহজাদা দারাশুকো' পড়তে পড়তে সময়ের প্রবাহমানতা ও মুহূর্তের সঙ্গে মুহূর্তের আত্মীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। আর আমরা তো জানি, ''ইতিহাসের গান অমিত্রাক্ষরে হয় না, এর চরণে চরণে মিল।''[৪৮] সময়-সমাজ তার চেহেরা বদলে ফেলে শুধু। এই অনুভবের ধারণা যেন পাঠকের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে চান লেখক।

ব্রহ্মপুরে আসার আগে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে টালিগঞ্জের জুবিলি পার্কের ভাড়া বাড়িতে ছিলেন শ্যামল সপরিবারে প্রায় দু'বছর। এখানে পুনরায় শ্যামলের জীবনে নেমে আসে অনিশ্চয়তা। 'যুগান্তর' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। আবার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে শ্যামলের পা ভাঙে। আর্থিক ও শারীরিক— দু'টো দিক থেকেই কষ্টের সম্মুখীন হন লেখক। ঠিক এই সময় 'আলোকপাত' পত্রিকা থেকে লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এতোদিন শ্যামল গল্প ও উপন্যাসের আঙ্গিকে জীবন-অভিজ্ঞতা লিখে যাচ্ছিলেন। হয়তো দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় একই রকম আঙ্গিকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে করতে এক ধরনের একঘেয়েমি ও ক্লান্তি মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। তাই 'আলোকপাত' পত্রিকাতেই শ্যামল প্রথম আঙ্গিক বদলে ফেললেন। ইতি গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ''তাই 'আলোকপাত'-এ ওর লেখা শুরু হল নিজের জীবনের কথা দিয়েই, তবে সেটি আর গল্প বা উপন্যাসের খাঁচায় আটকে রইল না। এই আত্মকথা হয়ে উঠল ওর জীবনের স্মৃতির জানালা। সেই জানালা দিয়ে নিজের অতীত সরাসরি আলোর মত এসে পড়ল 'জীবনরহস্য' লেখায়, যা ধারাবাহিকভাবে 'আলোকপাত'-এ বেরোতে শুরু করল।''[৪৯] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর জীবনের প্রায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র এই 'জীবনরহস্য' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই শ্যামলের সময়-সমাজ এবং উপন্যাসের সময়-সমাজ জানার জন্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যা লেখকের নিজের হাতে রচিত। এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয় বুঝে গেছে এই গবেষণাপত্রে বা বিশেষ করে এই অধ্যায়ে আমাদের মূল সহায়ক গ্রন্থ বা দিক নির্দেশক গ্রন্থ হিসাবে

‘জীবনরহস্য’ গ্রন্থটি কেন অবলম্বন করেছি। এই গ্রন্থটির আমরা পৃথক বিস্তৃত আলোচনা করছি না, কেন না, আমাদের এই গবেষণাপত্রে বা বিশেষ করে এই অধ্যায়ের আলোচনায় এই গ্রন্থটিরই বিভিন্ন অংশ কোট করা হয়েছে সময়-সমাজ-ঐতিহ্যকে বোঝার জন্য। আর তাছাড়া ‘জীবনরহস্য’ গ্রন্থটি একটি আত্মজীবনীমূলক রচনা, উপন্যাস নয়।

‘‘আঃ! মানুষ কেন অতদিন বাঁচে না? আমার তো ইচ্ছে করে কয়েকশো বছর ধরে বাঁচি। এই পৃথিবীর যত সুর আছে— তার ভেতর ছন্ন হয়ে ডুবে থাকি। এত রস। এত আনন্দ। মহানিম মাটির ভেতর থেকে— আলোর ভেতর থেকে রস-প্রাণ শুষে নিয়ে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিচ্ছে।’’[৫০] জীবনরসে ডুবে থাকা মানুষ সুরের সাগরে ডুবে থাকতে চাইবে— এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ জীবনরসেরই তো একটি উপাদান সুর। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বরাবরই সুরপাগল এক মানুষ। তাঁর লেখার সময় গানের রেকর্ড বাজত, যেন গানের রেকর্ড শুনতে শুনতে প্রবেশ করত তারই সৃষ্ট জগতে। সুর ও গানের জগতে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল ক্লাসিক্যাল মিউজিক। বন্ধু অশেষ চট্টোপাধ্যায় আমাদের জানান, ‘‘গানবাজনা শ্যামলকে টানত। তবে ভিন্টেজ ওয়াইনের মতো ভিন্টেজ গান। বিশেষ করে ঠুংরি, জদ্দনবাঈ বা জোহরাবাঈয়ের গান শুনতে ভালোবাসত। আর ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ সাহেব কিংবা ভীষ্মদেব। সব আটাত্তর আর.পি.এম-এর। ফুটপাথে অবহেলায় পড়ে থাকা খোসা ছাড়ানো ডাঁই করা রেকর্ড ঘেঁটে কেনা।’’[৫১] এছাড়াও গাঙ্গুবাঈ, গওহরজান, বেগম আখতার প্রিয় ছিল শ্যামলের। অন্যান্য গানের ক্ষেত্রে কে.এল.সায়গল, রবীন মজুমদার, কাননদেবী, শচীনদেব বর্মন, অখিলবন্ধু ঘোষ, কিশোরকুমার, মহঃ রফি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখর গান শুনতে বড় ভালোবাসতেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যে বিষয়টি ভালোবাসেন, তা তাঁর লেখায় উঠে আসবে না— এটা হতে পারে না। গান-সুর-রেকর্ড-বাদ্যযন্ত্র তাই বিভিন্ন উপন্যাসে বারবার উঠে এসেছে। তবে সেই সব উপন্যাসগুলোর মধ্যে হয়তো অন্যতম দুটি উপন্যাস হলো, ‘তারসানাই’ ও ‘মাতৃচরিতমানস’। এই দুটি উপন্যাসে এসরাজের প্রতি লেখকের বিশেষ দুর্বলতা দেখা যায়। হয়তো এই বাদ্যযন্ত্রটির সুর লেখকের মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিত।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে নিজের শৈশব-কৈশোর পর্বটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একজায়গায় বলেছেন, ‘‘যার পকেটে শৈশব নেই সে যেন কোনদিন প্রতিভার নদীতে না নামে। নামলেই ডুবে যাবে। নয়তো ভেসে যাবে। যার আছে— সেই শুধু সাঁতরাতে পারবে। জীবনেও তাই হয়। ভালো ছোটবেলা আসলে বড়বেলার অ্যাডভান্স টিকিট। আগে লাইন দিয়ে কেটে রাখতে হয়। এ টিকিট

হাতে থাকলে বড়বেলাটাও সুন্দর।"[৫২] আর সাহিত্য সৃষ্টি করা তো প্রতিভার নদীতে সাঁতার দেওয়া, যে কাজে শ্যামল অত্যন্ত সফল একজন মানুষ। তার কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট, শ্যামলের পকেটে শৈশব-কৈশোরের অভিজ্ঞতার খনি থাকা। আসলে প্রতিটি মানুষের শৈশব-কৈশোরের পর্বে কিছু সাধারণ গুণগত বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন, অপার বিস্ময়, কল্পনাশক্তি, অন্তহীন কৌতূহলতা, পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়াবার প্রবল ইচ্ছাশক্তি, নতুন কিছু তৈরি করা, বানানোর অদম্য পরিকল্পনা, স্বপ্ন, পরিণাম অপেক্ষা কাজ করবার জেদি মানসিকতা, নিজেকে বারবার অনিশ্চয়তা ও বিপদের মুখে ঠেলে দিলেও মজা উপভোগ করার মানসিকতা, মুহূর্ত ধরে জীবন কাটানো ইত্যাদি। তবে সাধারণ বৃহৎ সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে সময়ের স্রোতে বা ধাক্কায় এই বৈশিষ্ট্যগুলো ভেসে যায় নয়তো ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। আর হয়নি বলেই পকেটে সমৃদ্ধ শৈশব-কৈশোরের অভিজ্ঞতা-অনুভূতি নিয়ে সহজেই সাহিত্য-প্রতিভার নদীতে সাঁতরাতে পেরেছেন। 'তলানিশুদ্ধ জীবনরসের নেশাড়ু শ্যামল'-এর বীজ লেখকের এই শৈশব-কৈশোর পর্বেই রোপিত হয়েছিল।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তার শৈশব-কৈশোর পর্ব সম্পর্কে আরও জানাচ্ছেন, ''আমরা ছিলাম দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানের রূপকথার জগতে। অন্তত এখনকার চোখে তাকালে তো তাই মনে হবে। মহাযুদ্ধ এসে আমাদের তুলে নিয়ে গিয়ে এক অকল্পনীয় সব ব্যাপারের ভেতর টুপ করে ফেলে দিল। এখন যেমন ঘটনাই ঘটে না — তখন শুধু ঘটনার ভেতরই আমরা থাকতাম।"[৫৩] শুধু মহাযুদ্ধ নয়, আরও অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাস্রোত বয়ে গেছে লেখকের কৈশোর পর্বে। যেমন, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশভাগ, শেকড় ছিড়ে উদ্বাস্তু হওয়া, পরিবেশ-পরিস্থিতি-আবহ দ্রুত গতিতে পাল্টে যাওয়া ইত্যাদি। ফলে সত্যি, লেখক ঘটনার ভেতরেই সর্বদা অবস্থান করত। এজন্যই হয়তো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রায় সব উপন্যাসে শৈশব-কৈশোর পর্বের ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র কোনও না কোনও ভাবে উপস্থিত হয়েছে। তবে মনে হয় লেখক জীবনের প্রায় অন্তিম লগ্নে লেখা শেষ অন্যতম বৃহৎ (পৃষ্ঠা সংখ্যায়) উপন্যাস 'আলো নেই' (দু'খণ্ড)-এ অবিভক্ত ভারত তথা বঙ্গের বিশেষ করে খুলনার সময়-সমাজ অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং লেখকের শৈশব-কৈশোর জীবনের ছবি এখানে দেখতে পাই। বা এভাবেও বলা যেতে পারে লেখকের শৈশব-কৈশোর পর্বের (দেশভাগের আগে) সবচেয়ে বেশি ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র লেখকের জীবনের প্রায় অন্তিম পর্বে স্মৃতি-রোমন্থনের সাহায্যে 'আলো

নেই' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে বম্মাপুর পর্ব শেষ করে কয়েক মাসের জন্য ছিলেন কুঁদঘাটের একটি ভাড়া বাড়িতে। কিন্তু বাড়ি পছন্দ না হওয়ায় শ্যামল পুনরায় চলে আসেন টালিগঞ্জের পুরানো ঠিকানায়। এখানেই তিনি লেখেন 'আলো নেই' উপন্যাসটি যার প্রথম খণ্ডটি তৎকালীন অপর্ণা সেন সম্পাদিত 'সানন্দা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখক তাঁর জীবনে দু'টি উপন্যাস লেখার জন্য সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা করতে হয়েছিল। এক, 'শাহজাদা দারাশুকো' (দুই খণ্ড) উপন্যাস এবং দুই. 'আলো নেই' (দুই খণ্ড) উপন্যাস। দ্বিতীয় উপন্যাসটির জন্য দেশভাগ সম্পর্কিত বিষয়, তৎকালীন রাজনীতি, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি, নানান ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের ভাবনা-চিন্তা, কর্মসূচী, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি, সাধারণ জনগণের সার্বিক চিন্তা-ভাবনা, জমিদার-মধ্যবিত্ত-ক্ষেত মজুরদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দোলাচলতা, কমিউনিস্ট চিন্তা-ভাবনা প্রসারিত করার চেষ্টা, কৃষক-সংগঠন, বাঙালি হিন্দু-মুসলমান মানসিকতা ইত্যাদি নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করতে হয়েছিল লেখককে। এই ঐতিহাসিক কালখণ্ডের ছবি ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি রোমন্থনের সাহায্যে অবিভক্ত বঙ্গের খুলনায় কাটানো নিজের শৈশব-কৈশোর পর্বটিও জীবন্ত করে তুলেছেন তিনি। ফলে তৎকালীন সময়-সমাজ- ঐতিহ্য বোঝার জন্য 'আলো নেই' উপন্যাসটি অন্যতম। এই উপন্যাসে অনন্ত ঘোষাল ও তার পরিবার আসলে লেখকের পরিবারকে প্রতিফলিত করেছে। লেখক টালিগঞ্জের ৭৯ দেশপ্রাণ রোডে 'ঘড়িঘর' নামক বাড়িতে বসে জীবন্ত করেছেন নিজের ছোটবেলাকে। ছোটবেলার দেখা-অনুভূতি-নানান কর্মকাণ্ড খুলনা শহরকে কেন্দ্র করে ফুটে উঠতে থাকে 'আলো নেই' উপন্যাসে। লেখক যেন জীবন-আয়ুর সায়াহ্নে বসে সময়-পরিভ্রমণের মাধ্যমে উপস্থিত হয়েছেন জীবন-আয়ুর প্রভাতবেলায়। অনন্ত ঘোষাল ও অন্যান্য মানুষ এবং ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্রের সঙ্গে লেখকের কল্পনাশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি 'আলো নেই' উপন্যাসকে একটি শিল্পসম্মত রূপ দিয়েছে। উপন্যাসটির সময়কাল হলো ১৯৩৬-৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি-রাষ্ট্রপতি হিসাবে সুভাষ চন্দ্র বসুর পুনর্নির্বাচিত হয়ে এই পদ থেকে ইস্তফা দেবার আগে পর্যন্ত। তাই বলা যায়, তিন-চার বছরের সময়সীমার কাহিনি এখানে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসের দু'খণ্ড মিলিয়ে। আমরা প্রথমে উল্লিখিত সময় পর্বের তথাকথিত নানান গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্রের মাধ্যমে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তৎকালীন সময়-সমাজ-পরিস্থিতিকে বোঝার চেষ্টা করব। যথা—

ক. পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তখন মূল চালিকাশক্তি জাতীয় কংগ্রেস। না পূর্ণ স্বরাজ, না সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ বিরোধিতা, না দীর্ঘকাল ধরে জমিদারদের হাতে অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত গরীব কৃষকদের স্বার্থে কোনও ভূমি সংস্কারের পরিকল্পনা— কোনোটারই ক্ষেত্রে সেই সময় কোনও সঠিক দিশা দেখাতে ব্যর্থ তৎকালীন সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস। ফলে দেশের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্ব, কর্মীদের মধ্যে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। পরপর দু'বার (হরিপুরা ও ত্রিপুরা) নির্বাচিত হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি-সভাপতি হিসাবে সুভাষ চন্দ্র বসু। কিন্তু তারপরেও তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ জাতীয় কংগ্রেসে মহাত্মাগান্ধী তখনও সর্বেসর্বা।

খ. যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে— সেই জায়গা ভরাট করতে উত্থান ঘটে বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও মুসলীম লিগের। সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে ভারতের বাতাসে ছড়িয়ে দিতে থাকে শুধু অবিশ্বাস, ঘৃণা, প্রতিশোধের মানসিকতা। লেখক জানান, সুভাষ চন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হবার পর চেয়েছিলেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানতে। কিন্তু গান্ধিজী সুভাষের এই চরমপন্থী মানসিকতার সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। ফলে সুভাষের নেতৃত্বের সময় কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষপন্থী ও গান্ধীপন্থী-এই দুই মতাদর্শের সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সুভাষ চূড়ান্ত কঠোর অনমনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দুর্বলতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতা, ভোটে জেতা আবুল কাশেম ফজলুল হকের সঙ্গে জোট বাঁধতে দেয় না। ফলে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে লিগ। মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেয়ে মুসলীম লিগ আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে বাংলায়। অন্যদিকে মুসলীম লিগকে কাউন্টার করতে গিয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার কমিউনিস্টসহ বামপন্থী দল তাদের সাম্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণায়, প্রতিটি স্তরে পৌঁছানোর মত সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে তাদের পক্ষেও বাংলা তথা ভারতের মানুষকে একত্রিত করে বৃহৎ কোনও আন্দোলনে যাওয়া সম্ভব নয়।

এই সব রাজনৈতিক ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র ছাড়াও লেখক সাহিত্য, থিয়েটার, গান, চলচ্চিত্র— এই সব জগত থেকেও নানান বিখ্যাত ঐতিহাসিক মানুষদের হাজির করিয়েছেন উপন্যাসের পাতায়। ফলে তৎকালীন সময়-সমাজ বুঝতে আমাদের সাহায্য করেছে। এই সব মানুষদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সজনীকান্ত দাশ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রমুখ। লেখকের মতে, এই পৃথিবীতে

একই সঙ্গে একই সময়ে নানান জায়গায় বিভিন্ন ঘটনা ঘটে। মানুষ যেহেতু ত্রিকাল ও সবদর্শী নয়, সেহেতু মানুষের পরিচিত পরিধির মধ্যে যা ঘটে, বাস্তব মানুষ সেটুকুই জানতে পারে। কিন্তু লেখকের সৃষ্ট জগতে লেখক বাস্তব মানুষের এই ক্ষমতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তাই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এখানে চেষ্টা করেছেন একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তরে ঘটা ঘটনার একটি কোলাজ তৈরি করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে। যাতে তৎকালীন সময়-সমাজের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পাঠকের মধ্যে একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে ওঠে। অনন্ত ঘোষাল ও তার পরিবারের ক্ষেত্রে নিজস্ব অভিজ্ঞতা-অনুভূতির সাহায্যে তৎকালীন সময়-সমাজকে তুলে ধরেছেন অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ নানান ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্রদের ক্ষেত্রে লেখককে ইতিহাস বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন এবং ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে ও ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্রের সহযোগিতা সেই সময়কে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও কাল্পনিকতা। ফলে গ্রন্থটি নেহাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ না হয়ে ইতিহাস-আশ্রিত শিল্পসম্মত একটি উপন্যাস হয়ে উঠেছে। কিন্নর রায় বলেছেন, ''নিরাসক্ত ভাবে তিনি বাঙালি জাতির এই আলোবিহীন দুঃসময়কে তুলে এনেছেন তাঁর মতো করে। এমনকি যে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির ব্যাপারে তিনি বেশ খানিকটা দুর্বল ও এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গে নানা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, সেই জাতীয় কংগ্রেসের সেই সময়কার ভূমিকাকে তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে সমালোচনা করার ব্যাপারে পিছিয়ে যাননি।''[৫৪] কংগ্রেসের রাজনীতি বিষয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন, ১৯৩৭ সালের মার্চে বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে যখন কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে কোয়ালিশন সরকার গড়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় জাতীয় কংগ্রেস। সেদিনই যেন বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। বঙ্গবিভাগ হওয়া ছিল তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

আমরা প্রথমেই বলেছি যে, অনন্ত ঘোষাল ও তার পরিবার লেখকের পরিবার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নির্মাণ করা। কোন কোন ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র লেখক বাস্তব ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তার একটা ধারণা আমরা এখানে তুলে ধরব। যার মাধ্যমে খুলনা তথা বাংলার সময়-সমাজ সম্পর্কে একটি ধারণা আমরা পাব। যথা—

ক. সেসন জজের পেশকার অনন্ত ঘোষাল লেখকের বাবা মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি দিয়ে নির্মিত। তেমনি স্ত্রী রত্না ও অনন্তর পাঁচ সন্তান লেখক তাঁর নিজের পরিবারের স্মৃতিকে মাথায় রেখেই তৈরি করেছেন। অবশ্য বাস্তবে লেখকরা ছয় ভাই ও এক বোন হলেও একমাত্র

বোন রমা ও সর্বকনিষ্ঠ ভাই তাপসের জন্ম ১৯৩৬ সালে হয়নি। আর বছর চারেকের খোকন ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেওয়া শ্যামলকেই ইঙ্গিত করে। উপন্যাসের খোকনের এক দাদা (পানু) জড়িয়ে পড়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে— সেভাবে বাস্তব জীবনেও লেখকের এক দাদা (পুর্ণেন্দুবিকাশ) জড়িয়ে পড়েছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনে। মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আদি বাড়ি ছিল বরিশালে। কর্মসূত্রে খুলনায় এসে ভাড়া বাড়িতে উঠেছিলেন। অনন্ত ঘোষালের ক্ষেত্রেও সেই কাহিনি আমরা দেখতে পাই।

খ. খুলনা শহর খুব বেশি প্রাচীন শহর নয়। ১৮৪২ সালে মহকুমা হিসাবে 'খুলনা'র জন্ম হয়। আর জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে। যশোর জেলার খুলনা ও বাগেরহাট মহকুমা ও চব্বিশ পরগনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা নিয়ে খুলনা জেলা নির্মাণ করা হয়। ইতিহাসে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে এই শহরে প্রথম জনবসতি গড়ে ওঠে। খুলনা শহর সম্পর্কে লেখক লিখেছেন, ''যেভাবে একটি নগর গড়ে ওঠে— বসতি বেড়ে ওঠে— ঠিক সেইভাবেই এই খুলনা শহরের বাড়বাড়ন্ত। এই শহরে মাস্টার মশাই আছেন, জমিদার, কমিউনিস্ট পার্টির অফিস আছে আবার গাঁজা আফিমের দোকান আছে। বেশ্যালয় আছে। মদের দোকান আছে। মেথর পাড়াও আছে।" [আলো নেই', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৯] বড় বড় চা-কোম্পানি চা-এর প্রচারের জন্য বা সাধারণ মানুষদের মধ্যে চা-এর নেশা ধরার জন্য এই সময় এক ধরনের প্রচার কৌশল অবলম্বন করেছিল। বাজার-হাট বা যেখানে সাধারণ লোকজনের ভিড় বেশি সেখানে তৎকালীন কোনও জনপ্রিয় গান বাজিয়ে (কল-রেকর্ড বাজিয়ে) একদম বিনামূল্যে চা বানিয়ে খাওয়ান। এই চিত্র আমরা এই উপন্যাসেও দেখতে পাই।

গ. কচ্ছপ ধরা বা খাওয়া তখনও ভারতে নিষিদ্ধ হয়নি। বাজারে মাছের মত কচ্ছপও উঠত। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় যে, শীতের বিকালে অনন্ত বাজার থেকে কচ্ছপ এনে কেটে দেন রত্নাকে। কচ্ছপের মাংস ভালো রাঁধতে পারেন রত্না।

ঘ. উপন্যাসে জমিদার কালিদাস ঘোষ বলছেন, ''দেখবে বেশিরভাগ বাড়ি উকিল নয়তো মোক্তারদের। মামলা মোকদ্দমায় আমরা শেষ। আর পয়সা গিয়ে উঠেছে উকিলের ঘরে। ওরা ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। পলিটিক্স করছেন। পাকা বাড়ি করছেন। কংগ্রেস, লিগ— সব দলেরই তাবড় তাবড় নেতারা তো সবাই পেশায় উকিল।" ['আলো নেই', প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩০] আসলে এখানে লেখক একটি বদলে যাওয়া সময়কে তুলে ধরেছেন। ইংরেজ শাসনের শেষদিকে (বিশ শতক)

আইনচর্চা তৎকালীন শিক্ষিত মানুষদের কাছে অন্যতম লোভনীয় কেরিয়ার হিসাবে দেখা দেয়। অন্যদিকে সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন বা পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে কিংবা জমি ছাড়া বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে না পেরে জমিদারদের হাত থেকে ক্ষমতা ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে। হয়তো সময়-সমাজ-পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি জমিদাররা কখনও ধরতে পারেনি বা ধরতে চায়নি। বাংলায় ফজলুল হকের উত্থান তো এই জমিদারদের বিরোধিতা করেই। তাই জন্য হয়ত গরীব হিন্দু-মুসলিম কৃষক ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ 'কৃষক প্রজা পার্টি'র সমর্থক ছিল।

আমরা খুলনা, কলকাতা, ভৈরব, রূপসাসহ বাংলার যে ছবি এই উপন্যাসের দু'টি খণ্ডে দেখতে পাই, তা আসলে লেখকের পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা। নিজস্ব স্মৃতি, দাদা-ভাইদের স্মৃতি, মায়ের কাছ থেকে শোনা গল্প, বড় হয়ে বিভিন্ন বিষয় জেনে কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণে তৎকালীন সময়-সমাজ তুলে ধরেছেন সাধারণ মানুষদের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই কিন্নর রায় যথার্থই লিখেছেন, ''আলো নেই' লিখতে গিয়েও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় শুধু সেই সময়ের প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্রদেরই ধরেননি। তিনি এইসব নামী দামীদের পাশাপাশি নেমে এসেছেন একদম প্রান্তিক মানুষের কাছাকাছি। সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত হিন্দু-মুসলমানের ঘরের ভেতর।''[৫৫] উপন্যাসে উঠে আসে জমিদারের অবৈধ সন্তান কালোদা, ফোতোদা ও তাদের বিধবা বোন ফ্যাকাশি দাইয়ের কথা। উপন্যাসের দু'খণ্ড জুড়ে আরও অনেক ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র আছে যা লেখকের বাস্তব জীবন থেকে গড়িয়ে উপন্যাসের পাতায় উঠে এসেছে। তাই সেই ঐতিহাসিক কালপর্বকে জানতে হলে, বুঝতে হলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আলো নেই' উপন্যাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ৯

২. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ১৩

৩. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৭৯

৪. তদেব, পৃ ১৮০

৫. তদেব, পৃ. ১০

৬. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী' (দ্বিতীয় ভাগ), সম্পাদক-শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, ভাদ্র-১৩৫০, পৃ. দ্বিতীয় খণ্ডের ১।

৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়' রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৩৩৪

৮. তদেব, পৃ. ৪২৮

৯. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ২৭

১০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ৭২

১১. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ২৫

১২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮১

১৩. তদেব, পৃ. ১৮১

১৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' রচনাসমগ্র-৪, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৮৫

১৫. তদেব, পৃ. ১৪৭

১৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮৬

১৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮১

১৮. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮৭

১৯. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'অতি জীবিত শ্যামল', প্রসঙ্গ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (পুনর্মুদ্রণ),

সংকলক-সমীর চট্টোপাধ্যায়, দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ১৫

২০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৯২

২১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ২১৯

২২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'অদ্য শেষ রজনী' রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১২, পৃ. ৩৩৭

২৩. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৬১

২৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'হাওয়াগাড়ি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ. ১০৮

২৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ২২১

২৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'হাওয়াগাড়ি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ. ৩০৪

২৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮২

২৮. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'অলীকবাবু', দশটি উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩২৯

২৯. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ; পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৪৮

৩০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ; পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১২২

৩১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'অলীকবাবু', দশটি উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩৩২

৩২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ; পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৬০

৩৩. তদেব, পৃ. ১৩৩-১৩৪

৩৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'সিদ্ধকামিনী, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ১৬

৩৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ; পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৪৫

৩৬. তদেব, পৃ. ৯০

৩৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'ফিরোজা', রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ১৬৬

৩৮. তদেব, পৃ. ১৮৩

৩৯. তদেব, পৃ. ১৯১

৪০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ; পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৬৭

৪১. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৯০-৯১

৪২. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৯১

৪৩. তদেব, পৃ. ১৯

৪৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, জানুয়ারি, ১৯৯৭, পৃ. ১৭৩

৪৫. তদেব, পৃ. ১৬৪-১৬৫

৪৬. তদেব, পৃ. ১৬৫

৪৭. তদেব, পৃ. ১৯৩

৪৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'বাতায়নিকের পত্র', 'কালান্তর', রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্বিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৮৮০ শকাব্দ: ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

৪৯. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, ‘আমার শ্যামল’, অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৭৯-৮০

৫০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘তারসানাই’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি, ১৯৯৩, পৃ. ১৪

৫১. চট্টোপাধ্যায় অশেষ, ‘তলানিশুদ্ধু জীবনরসের নেশড়ু শ্যামল’ (পুনর্মুদ্রণ) ‘প্রসঙ্গ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়’ সংকলক: সমীর চট্টোপাধ্যায়, দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রকাশ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ৩১

৫২.গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘জীবনরহস্য’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ; পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৫৮

৫৩. তদেব, পৃ. ৪৩

৫৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘কথামুখ’, কিন্নর রায় লিখিত ভূমিকা অংশ, ‘আলো নেই’, দ্বিতীয় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪০৯।

৫৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘কথামুখ’, কিন্নর রায় লিখিত ভূমিকা অংশ, ‘আলো নেই’, দ্বিতীয় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪০৯।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শিল্পরীতি

''ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের। তাহা একজন যদি বাহির না করে তো কালক্রমে আর-একজন বাহির করিবে। কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে আর-একজনের তেমন হইবে না। সেই জন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।

অবশ্য, রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়; কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।''[১]

পৃথিবীর যে কোনও শিল্পই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তার শিল্পরীতির মধ্য দিয়েই। একমাত্র শিল্পরীতিতেই লেখকের প্রতিভা, কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়। কারণ ভাব ও বিষয় স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ কিন্তু রীতিকেই আমরা একমাত্র বলতে পারি ব্যক্তি-বিশেষের উপর নির্ভরশীল। আর শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভাব ও বিষয় দ্বারা রীতিকে আচ্ছন্ন করে সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠককে আনন্দ দান করা। একজন প্রথম শ্রেণির রাঁধুনির কৃতিত্ব রান্না করার বিষয়বস্তুতে নাই। তিনি যেভাবে বিভিন্ন কাঁচামালের সহযোগে রান্নাটি তৈরি করলেন— সেই পদ্ধতিতেই রাঁধুনির কৃতিত্ব প্রকাশিত হয় এবং অন্য রাঁধুনি থেকে তার স্বতন্ত্রতা, অভিনবত্ব প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে লেখক বা শিল্পী সম্পর্কে একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মূল্যায়নে তাই শিল্পরীতির আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর আমরা তো জানি, শিল্পের ইতিহাস আসলে তো শিল্পরীতির ইতিহাস। বিষয়বস্তু, জীবন দৃষ্টি, সময়-সমাজ-ঐতিহ্য ইত্যাদি যে পদ্ধতিতে লেখক একটা শিল্প সংরূপের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, তাতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলা কথাসাহিত্যে একজন প্রথম শ্রেণির সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে শিল্পরীতির কয়েকটি দিক থেকে লেখকের কিছু উল্লেখযোগ্য নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে লেখকের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করব। তিনি যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে উপন্যাস নামক শিল্প সংরূপটি নির্মাণ করেছেন— তার গোপন স্বভাবটি পাঠকদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করব। সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত বিন্যাসকে বিশ্লেষণ করে দেখব— কীভাবে তা পাঠকের মনের মধ্যে রস সঞ্চার করে আনন্দ দান করতে সমর্থ হয়েছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস মূলত চরিত্রপ্রধান। তাই চরিত্রই উপন্যাসের ঘটনা নিয়ন্ত্রিত

বা পরিচালিত করেছে— এই চরিত্রের মাধ্যমেই কাহিনিবৃত্ত বা প্লট গড়ে উঠেছে। আরও বিশ্লেষিত করলে বলা যায় চরিত্রের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা-চিন্তা-ভাবনা নিয়ে কাহিনিবৃত্ত নির্মিত হয়েছে। আর অধিকাংশ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র লেখকের 'অল্টার ইগো' (Alter Ego) বলতে পারি। ঘাম দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার যথেচ্ছ ব্যবহার—এর একটি অন্যতম কারণ। কল্পনার চেয়ে নিজের জীবনাভিজ্ঞতাকেই অনেক বেশি আঁকড়ে ধরেছেন তিনি। অবশ্য ঔপন্যাসিক মাত্রেই তা করেন কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যেন শুধু লেখার জন্য অভিজ্ঞতা সংগ্রহের অভিযানে নেমেছেন। সাহিত্য মাত্রেই কল্পনা থাকবে— কিন্তু কল্পনার প্রয়োগ লেখক-বিশেষে নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে শ্যামলের কল্পনার প্রয়োগ যেন কোনও লেখাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করার জন্যে যে ন্যূনতম পরিমাণ দরকার হয়, ততটুকুই। এই প্রসঙ্গে লেখক জানান, ''সন্দীপন বলেছিলেন, তুই একদম বানাতে জানিস না। তোর কোন ইমাজিনেশন নেই!

একথারও কোন জবাব দিতে পারিনি। কারণ দিয়ে কোন লাভ নেই। কোথায় বানাই— কোথায় আসলের সঙ্গে মিশেল দিই, তা বাইরের লোক কি করে বুঝবে! সৃষ্টিতে আমি দ্বিতীয় ব্রহ্মা—এমন কোন গর্ব আমার নেই।"[২] এজন্যই হয়তো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রায় অধিকাংশ উপন্যাসের প্লট যৌগিক। সেই সব উপন্যাসে লেখকের 'অল্টার ইগো' বা কেন্দ্রীয় কোনও ভাব আপাতবিচ্ছিন্ন কাহিনিগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। আসলে লেখকের ঔপন্যাসিক-চরিত্রসত্তার স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা এতটাই প্রাধান্য বিস্তার করে যে অন্যান্য কাহিনিগুলো সর্বদা উপন্যাস তৈরির ক্ষেত্রে অনিবার্য আবশ্যিক হয়ে উঠতে পারে না। আবার উক্ত কাহিনিগুলো নিয়ে একটি স্বতন্ত্র উপন্যাস নির্মাণ করা যেতে পারে— লেখক কখনও কখনও তা করেছেনও। তাই যৌগিক প্লটের উপন্যাস লেখকের রচনাবলীতে বেশি পরিমাণে দেখা যায়। অবশ্য সরল ও জটিল প্লটও লেখকের উপন্যাসে দেখা যায়— যা ক্রমশ আলোচ্য। আমরা এই অধ্যায়ে শিল্পরীতির আলোচনা তিনটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব। যথা— ক. গঠননৈপুণ্য, খ. উপস্থাপনা রীতি ও গ. ভাষাবিন্যাস।

ক. গঠননৈপুণ্য:

আমরা নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে গঠনরীতি, আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' (পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত নাম) উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাস কৌশল আলোচনা করা যাক। মোট ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই উপন্যাস। মূলত চারটি কাহিনিকে আশ্রয় করে এই উপন্যাস গড়ে উঠেছে— ১. প্রমথ-সুধা ও তার

পরিবার, ২. অবিনাশ-লিলি-নীলিমা-প্রমথ, ৩. প্রমথ-বীথি-নীতিশ ৪. প্রমথ ও তার পরিবার। প্রতিটি কাহিনির মধ্যে যোগসূত্র রক্ষিত হয়েছে প্রমথের মধ্য দিয়ে। প্রমথের এক ধরনের অনুভব কাহিনিগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংগতি দান করেছে। সেই অনুভব হলো, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও স্ব-নির্মিত কৃত্রিমতার মোড়ক থেকে বেরিয়ে আসার তীব্র আকুলতা। মানুষ যখন ছদ্মবেশে ধুঁকতে থাকে, নিজের বিবেক দ্বারা দংশিত হতে হতে নিজেরই গায়ের রঙ নীল হয়ে যায়— তখন মানুষের ভেতর থেকেই সজ্ঞানে- অজ্ঞানে প্রতিরোধ শুরু হয়। আলোচ্য উপন্যাসের বিভিন্ন কাহিনিগুলোতে বিভিন্ন মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে থেকে প্রমথ যেন সেই চেষ্টাই করে যায়। তাই কাহিনির ঐক্যের নিরিখে এই উপন্যাস যৌগিক প্লটের উদাহরণ।

অন্যদিকে, বৃত্তাকার ও রৈখিক প্লটের ধারণা গুণময় মান্না তার 'বাংলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক' গ্রন্থে সুন্দরভাবে দিয়েছেন, ''যে সমস্যা দিয়ে কোনো জীবনের শুরু, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান হলে বৃত্তাকার প্লট হয়, যদিও পরিধির অপর মুখ ফিরে এসে একই জায়গায় মেলে না, রূপ নেয় স্পাইর‍্যালের। পক্ষান্তরে, রৈখিক প্লটে ঘটনার পর ঘটনা যুক্ত হয়ে একটা শৃঙ্খল রচনা করে, যার দুই মুখ খোলা থাকে, ধরে নেওয়া হয়, যে ঘটনা দিয়ে শুরু হল তার আগেও অনুরূপ ঘটনার সম্ভাবনা।''[৩] উপরিউক্ত সংজ্ঞার নিরিখে 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসটিকে আমরা বৃত্তাকার প্লট বলতে পারি। কারণ ''বৃত্তাকার প্লটের অন্তিমে উপলব্ধির স্তর একটু উঁচুতে ওঠে (Spiral development), মানুষটাও বদলে যায়।''[৪] প্রমথের যাত্রা শুরু হয় ছদ্মবেশে ধুঁকতে থাকা সমস্যা নিয়ে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখি প্রমথের অনুভবের গুণগত পরিবর্তন। যে প্রত্যয় নিয়ে প্রমথ তার ছালচামড়ার উপর ধুলো দিয়ে চিত্রবিচিত্র পোশাক তৈরি করেছিল, উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখি সেই প্রত্যয়কে ভেঙে ফেলার আকুল প্রচেষ্টা। ফলে আমরা বলতেই পারি উপন্যাসের অন্তিমে প্রমথর উপলব্ধির স্তর একটু উঁচুতে উঠে বৃত্তাকার প্লটের সৃষ্টি করেছে। এই বিষয়টি একটি লেখচিত্রের সাহায্যে দেখা যাক—

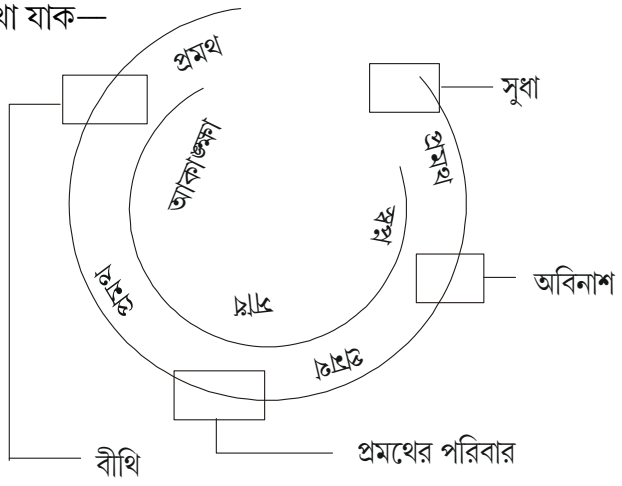

কাহিনিকাল ও কথনকাল নিয়ে কোনও উপন্যাসের বাচনকাল নির্মিত হয়। আমরা জানি কাহিনিকাল পরিচালিত হয় 'প্রকৃত' সময়ের অনুসারেই। অর্থাৎ কাহিনিকাল হল: ক-খ-গ-ঘ-ঙ। কিন্তু উপন্যাসের বাচনকাল 'প্রকৃত' সময়ের অনুক্রমে নিয়ন্ত্রিত হয় না। যে কোনও প্রথম শ্রেণির লেখক বাচনকাল সাজায় ঘটনার পুনর্বিন্যস্ত বা বিপর্যস্ত ক্রমে। কারণ বহমান সময়ের হুবহু নকল (অর্থাৎ পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনার পরপর বর্ণনা) লেখকের শিল্প-কল্পনার অভাব প্রদর্শন করে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে 'প্রকৃত' সময়ের অনুক্রমে যদি ঘটনাগুলো সাজানো যায় তা হবে অনেকটা এই রকম—

ক. প্রমথের ম্যাট্রিকে পড়ার সময় তনুদার মৃত্যু।

খ. লেখালেখির সূত্রে অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব।

গ. গ্র্যাজুয়েট হবার জন্য প্রমথের কলেজে ভর্তি হওয়া। সেখানেই সুধা ও তার দিদি রেখার সঙ্গে পরিচয়। সুধার সঙ্গে প্রমথর ভালোলাগার প্রেম পর্ব শুরু।

ঘ. গ্র্যাজুয়েট হবার পর প্রমথর পুনরায় চাকরির চেষ্টা।

ঙ. প্রমথের কাছে সুধার ধীরে ধীরে বাসি হয়ে যাওয়া— তারপরেও প্রমথর সেই সম্পর্কের বোঝা টানা।

চ. নীলিমার সঙ্গে অবিনাশের পরিচয় ও নীলিমার প্রেমে পরা বা ভালোলাগার টান তৈরি হওয়া বিবাহিত অবিনাশের।

ছ. নীলিমার প্রতি আকর্ষণে অবিনাশের হাবুডুবু খাওয়া।

জ. প্রমথর নীতিশের সঙ্গে নীতিশের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ও বীথিকে প্রথম দেখা।

ঝ. বীথির প্রতি প্রমথের দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া।

ঞ. অবিনাশ চৌধুরীর অফিসে প্রমথের চাকরি হয়ে যাওয়া।

ট. বীথির সঙ্গে প্রমথর বিবাহ ও তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু হওয়া।

এই ঘটনাক্রমকে লেখক তাঁর উপন্যাসে কীভাবে পুনর্বিন্যস্ত বা বিপর্যস্ত ক্রমে সাজিয়েছেন, তার লেখচিত্র তুলে ধরা হলো—

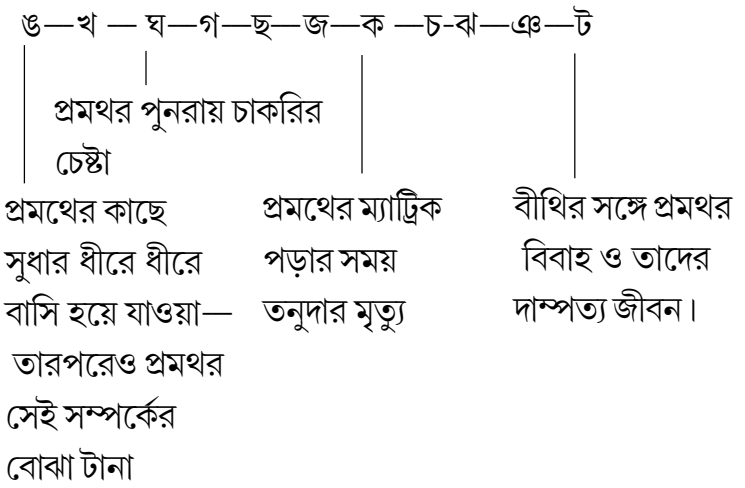

লেখক এভাবেই বাচনকালে ঘটনাকে পুনর্বিন্যস্ত বা বিপর্যস্ত ক্রমে সাজিয়েছেন, কখনও কখনও ঘটিয়েছেন পূর্ব-উদ্‌ভাস বা পশ্চাৎ-উদ্‌ভাস। ''আখ্যানকালের সীমা বা পরিসর বদ্ধ অথবা মুক্ত, উভয়ই হতে পারে।''[৫] আমরা যদি 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' কাহিনির দিকে তাকাই, তাহলে এই আখ্যান কালের সীমাকে বদ্ধ পরিসর বলতে পারি। প্রথমে নামকরণের দিক থেকে দেখা যাক। পৌরাণিক সূত্রে অজ্ঞাতবাস হোক বা বৃহন্নলা (পূর্বনাম)— উভয়ই একটি নির্দিষ্ট সীমিত সময়কেই ইঙ্গিত করে। উপন্যাসের ভাবগত দিকটিও বদ্ধ পরিসরের দিকে ইঙ্গিত করে। ছদ্মবেশের সৃষ্টি— ছদ্মবেশে সাময়িক মজা পাওয়া— ধীরে ধীরে ছদ্মবেশের ভেতর ধুঁকতে থাকা— ছদ্মবেশ খুলে ফেলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা— বেরিয়ে আসার আকুল প্রচেষ্টা— ভেতর ও বাহির, উভয় প্রকার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পোষাকটার আকর্ষণ তুচ্ছ করে সত্যের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ান। এবার 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের বাচনক্রম দেখা যাক—

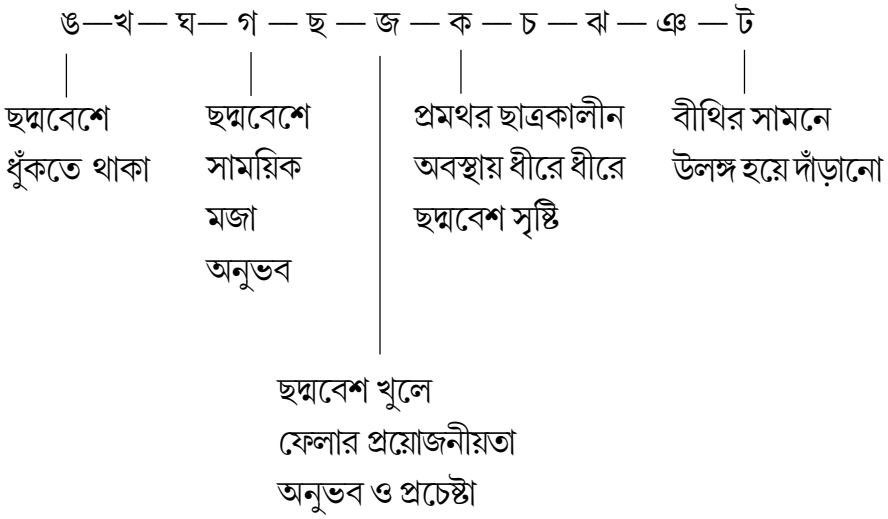

আখ্যানকালের মুক্ত পরিসরের পক্ষে যুক্তি এমন হতে পারে যে, এই পৃথিবীতে কোনও রক্ত-মাংসের মানুষ পুরোপুরি সৎ হতে পারে না। সে শুধু আমৃত্যু সৎ হবার চেষ্টা বা প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে। ফলে উপন্যাসের কাহিনি যেখানে শেষ হচ্ছে, তা আসলে প্রমথর সত্যের সামনে নিজেকে উলঙ্গ করে দাঁড়ানোর সূত্রপাত মাত্র— যা অন্য একটি আখ্যান-সম্ভাবনা লালিত করছে। এই সূত্রে এই আখ্যান মুক্ত পরিসরের। কিন্তু আমরা বলতে চেয়েছি প্রমথ যেভাবে তার স্ত্রী বীথির সামনে নিজেকে নগ্নভাবে প্রকাশ করেছে— তা আগে কখনও করতে পারেনি। তাছাড়া নিজেকে সৎ করার বক্তব্যটি এই উপন্যাসের বাচনে পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এক ধরনের ক্রিয়াগত ঐক্য (Unity of Action) এই উপন্যাসের বাচনে দেখতে পাই। তাই আমরা একে বদ্ধ পরিসরের বাচন হিসাবেই ধরব। আর 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের প্রতিটি কাহিনির মধ্যে প্রমথ চরিত্রের পৌনঃপুনিকতা ও পাঠগত আধিপত্য তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে মর্যাদা দেয়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরবর্তী উপন্যাস 'অনিলের পুতুল' সরল প্লটের আখ্যান। অনিল ও তার পরিবারের কাহিনি নিয়ে এই উপন্যাস নির্মিত হয়েছে। 'মৃত্যু, দম্ভ, শোক, অসুখ এবং ওষুধ'[৬] এই সব প্রসঙ্গ নিয়েই একটি সরল প্লট নির্মিত হয়েছে। লেখক সাধারণত কাহিনি-বিন্যাস কৌশলে কাহিনিগত ভূমিকা ব্যবহার করেন না। সরাসরি কাহিনিতে প্রবেশ করা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য— এই উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। কাহিনি-বিন্যাসে প্রথম থেকেই তিনি প্রসঙ্গগুলো সাজিয়ে দিয়েছেন এভাবে—

মৃত্যু— মৃত্যুপথযাত্রী তরঙ্গিণীর প্রসঙ্গ দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত— পরবর্তীতে মৃত্যু।

দম্ভ— তরঙ্গিণীর গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ অব্যবহিত পর্বে তরঙ্গিণীর পিতার সূত্রে তরঙ্গিণী ও তার সব বোনেদের লালিত দম্ভের প্রসঙ্গ।

শোক—তরঙ্গিণীর মৃত্যু এবং অন্যান্য মৃত্যু-প্রসঙ্গ।

অসুখ—তরঙ্গিণীর অসুস্থতা থেকে পুতুলের অসুখ। মাঝে অনিলের ডিজিস-ফোবিয়া।

ওষুধ— কাহিনি জুড়ে ওষুধের বিস্তৃত বর্ণনা।

এই বিন্যাসক্রম পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু, দম্ভ, শোক, অসুখ এবং ওষুধ নিয়ে একটি বিশেষ প্যাটার্ণ তৈরি করে। যা অনিলের সংকট, মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত, ফোবিয়া, উত্তরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ-এর এক একটি সিঁড়ি নির্মিত হতে দেখি। ফলে অনিলের গতিশীলতা, মনস্তত্ত্ব আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপরে উল্লিখিত প্রতিটি প্রসঙ্গ এতবার পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হয়

যে— লেখক যেন এই প্রসঙ্গগুলোর মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন অনিল ও পাঠকের চিন্তা-ভাবনাকে। প্রতিটি প্রসঙ্গকেই অনিল যেন পোস্টমর্টেম করেছে এবং শেষপর্যন্ত ওই সব প্রসঙ্গ থেকেই আবিষ্কার করেছে উত্তরণের সিঁড়ি। সরল প্লট রচনা ও প্রসঙ্গগুলোর পৌনঃপুনিক ব্যবহার এক্ষেত্রে কার্যকরী কৌশল হিসাবে দেখা গিয়েছে।

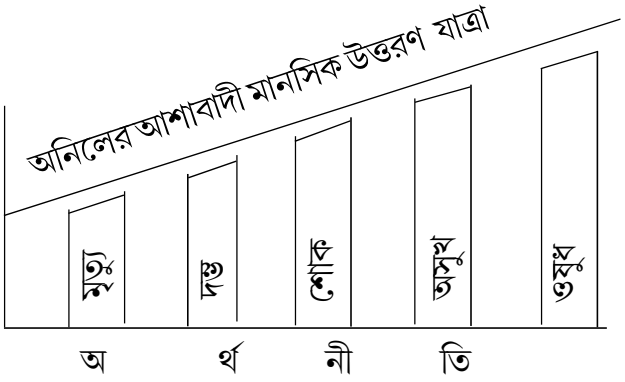

সমস্যা, প্রতিকূলতা স্বীকার করে অনিলের জীবনবাদী আশাবাদী মানসিকতা

মৃত্যু, দম্ভ ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো সর্বদা এক এক করে এসেছে, তা হয়তো নয়। অনেক সময় মিলেমিশে এসেছে বা কাহিনি জুড়ে থেকেছে— কিন্তু অনিলের মানসিক উত্তরণ যাত্রা সমস্যা বা প্রতিকূলতাকে সামনে থেকে লড়াই করার ইচ্ছাশক্তির ফলেই ঘটেছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় বিখ্যাত একটি উপন্যাস হলো, 'কুবেরের বিষয় আশয়'। এই উপন্যাসেও আমরা যৌগিক প্লটের দেখা পাই। যে কাহিনিগুলো নিয়ে এই উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে, তার কেন্দ্রীয় ভূমিকাগুলো নির্বাহ করেছে—

১. কুবের

২. ব্রজ ফকির

৩. বুলু

এই তিনটি চরিত্রের জীবন দু'টি অংশ বা পর্বে বিভক্ত হয়ে মোট ছ'টি পর্বের (অলিখিত) সমষ্টি করে উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণ করা হয়েছে। তাহলে কাহিনি-বিন্যাসের চিত্রটি হবে এই রকম—

কুবের

১ ক — পারিবারিক গতানুগতিক জীবন। সামান্য জমি কিনে সবাইকে নিয়ে একটু খোলামেলা থাকার ইচ্ছা। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী বুলু, সন্তান, বাবা, মা, দাদা-ভাই ও তাদের স্ত্রী। শেষপর্যন্ত কদমপুরে জমি কেনা।

পর্ব ১ খ

জমির নেশায় মাতোয়ারা ড্রিম মার্চেন্ট কুবের।

পারিবারিক সম্পর্কগুলো শিথিল ও ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া। ড্রিম সেলার কুবের।

২ ক — চকদার হবার আকাঙ্ক্ষায় মেদনমল্লের দ্বীপে বিনিয়োগ। ইতিহাসের বিস্তৃত কালপ্রবাহে সেনাপতি মদনমল্লের দুঃসাহসিকতা, অনিশ্চয়তা কুবেরের অনুভব করা। মা-এর মৃত্যু। ব্রজ ফকিরের স্ত্রী আভার সঙ্গে দ্বীপের মধ্যে সংসার— আভাকে খুন করা।

২ খ — সর্বস্ব খুইয়ে পুনরায় কদমপুরে ফিরে আসা।

ব্রজ ফকির

পর্ব ১ — ভবঘুরে অস্থির জীবন। নানান ছল-চাতুরির সাহায্যে অর্থ উপার্জন ও জীবন নির্বাহ। অর্থ উপার্জনের কৌশল বদলানোর মত স্ত্রী বদলানো। কোনও কিছুতেই থিতু হতে না পারা।

পর্ব ২ — ব্রজ দ্বারা রেলেশ্বর শিবের পাথর আবিষ্কার ও রেলেশ্বর শিব নাম দিয়ে স্থাপনা। আর্থিক উপার্জনের নিশ্চয়তা আনবার জন্য মন্দির নির্মাণ ও মোহন্ত হিসাবে নিজেকে ঘোষণা। এই একটি বিষয়েই সমস্ত মনোযোগ ও থিতু হওয়া।

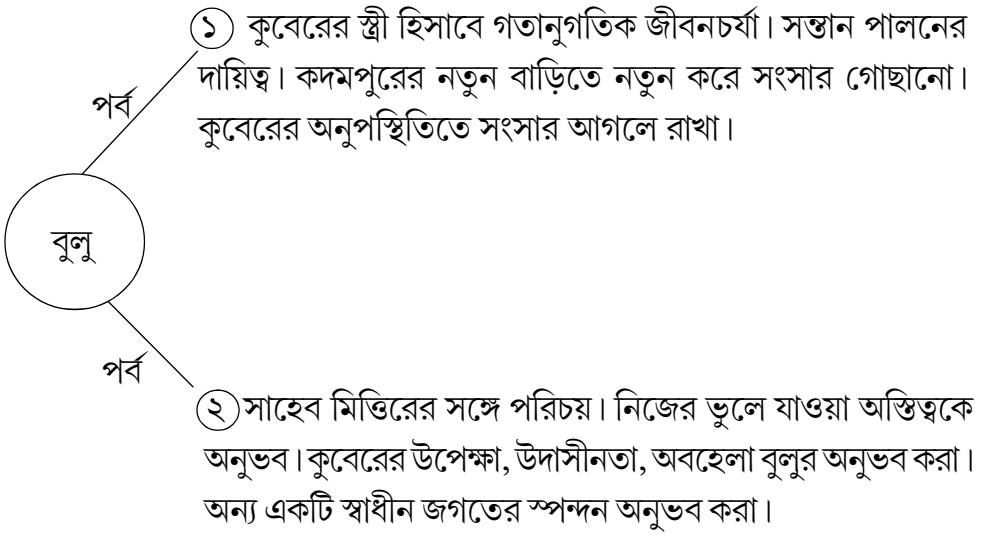

কুবেরর জীবনের প্রথম পর্ব প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য আমরা প্রথম পর্বের দু'টি উপবিভাগ করেছি। পর্ব একের ক প্রথম থেকে সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত এবং পর্ব একের খ অষ্টম থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত। কুবেরের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ থেকে একত্রিশতম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বটিকেও দু'ভাগে বিভক্ত করলে, পর্ব দু'য়ের ক পঞ্চদশ থেকে আঠাশতম পরিচ্ছেদ এবং পর্ব দু'য়ের খ ঊনত্রিশতম পরিচ্ছেদ থেকে একত্রিশতম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিন্যস্ত। অবশ্য প্রথম পর্বে চতুর্থ পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় পর্বে কুড়ি, বাইশ, তেইশ ও ছাব্বিশ পরিচ্ছেদে কুবেরের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় না। এরপর আমরা ব্রজ ফকিরের কাহিনির যদি পর্ব বিভাগ করতে হয়, তাহলে এখানেও দু'টি পর্ব স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিন্যস্ত (এর মধ্যে দ্বিতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, নবম, একাদশ পরিচ্ছেদে পাঠগত আধিপত্য লক্ষণীয়) এবং দ্বিতীয় পর্ব চতুর্দশ থেকে একত্রিশতম পরিচ্ছেদে পর্যন্ত বিস্তৃত (এর মধ্যে চোদ্দ, কুড়ি, একুশ, বাইশ, তেইশ, ছাব্বিশ, একত্রিশ পরিচ্ছেদে ব্রজ ফকিরের পাঠগত আধিপত্য রয়েছে)। এরপর আসা যাক, বুলুর কাহিনিতে যেখানে প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিন্যস্ত (যার মধ্যে দুই, ছয়, আট, নয়, দশ, বারো, ষোলো, সতেরো নম্বর পরিচ্ছেদগুলোতে বুলুর পাঠগত আধিপত্য লক্ষণীয়) এবং দ্বিতীয় পর্ব কুড়ি থেকে একত্রিশতম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিন্যস্ত (যার মধ্যে কুড়ি, বাইশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ পরিচ্ছেদগুলোতে পাঠগত আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়)। উপরিউক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণের যদি নির্যাস বের করা যায়, তাহলে সেটা হবে—

চরিত্র	পাঠগত উপস্থিতি
ক) কুবের	২৬ টি পরিচ্ছেদ
খ) বুলু	১৫ টি পরিচ্ছেদ
গ) ব্রজ ফকির	১২ টি পরিচ্ছেদ

খুব সহজেই তাহলে বোঝা যাচ্ছে কুবের চরিত্র যাকে আমরা লেখকের 'অল্টার ইগো' (Alter Ego) হিসাবে চিহ্নিত করেছি, লেখকও সেই চরিত্রকেই কাহিনিতে অধিক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কুবেরই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বা ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ''আমার জীবনে এটা একটা স্যাড্ ঘটনা আভা—বলতে পার এক্সপিরিয়েন্স।''[৭]— এই বাক্যটি উপন্যাসের কাহিনিতে প্রায় ধ্রুবপদের মত ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি কাহিনির সূত্রপাতও হয়েছে এই বাক্যের প্রসঙ্গ সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে, ''বাঁ হাতখানা মেলে ধরলো কুবের। ...'' ছোটবেলায় ঘটা একটি ঘটনার স্মৃতি কুবেরের জীবনের (ভ্যাগাবন্ড- ড্রিম মার্চেন্ট- চকদার) প্রতিটি পর্যায়ে তাড়া করে বেড়ানো, এটাই প্রমাণ করে যে, মধ্যবিত্ত পরিবারে ছোটবেলায় তৈরি হওয়া সংস্কার-মূল্যবোধ কুবের কখনোই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই বুর্জোয়া সমাজে নিজেকে উন্নীত করলেও কখনও মানিয়ে নিতে পারেনি— ফলে একাকীত্ব, নির্বাসন কুবের চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই এসেছে। পুরানো সমাজের মূল্যবোধ যে কুবের কখনোই ত্যাগ করতে পারেনি— তা দেখানোর একটা কৌশল হিসাবেই যেন বাক্যটি ধ্রুবপদের মত ব্যবহৃত হয়েছে।

'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসের প্লটকেও আমরা যৌগিক বলতে পারি। আর যৌগিক প্লটের উপন্যাসের গঠন কিছুটা শিথিল প্রকৃতির হয়, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে আত্মজৈবনিক উপাদান ব্যবহার করেছেন বলেই যৌগিক প্লটের উপন্যাসে বিভিন্ন কাহিনিগুলোর মধ্যে একটি কাহিনি পাঠগত আধিপত্য লাভ করে। আমরা 'কুবেরের বিষয় আশয়' এই উপন্যাসটিতে লক্ষ্য করেছি আবার 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসেও সেটা দেখতে পাই। এখানেও মূলত তিনটি কাহিনির তিনটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো— ক. অনাথবন্ধু বসু খ. বংশী চন্দ্র কাপালি এবং গ. সন্তোষ টাকি। কিন্তু অনাথবন্ধু বসুর কাহিনি এতটাই প্রাধান্য বিস্তার করেছে যে, কখনও উপন্যাসটিকে জটিল প্লটের রচনা মনে হয়। এই উপন্যাসে দু'টি ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও তার সামগ্রিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা লেখকের কখনও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনটি কাহিনির বিন্যাস-কৌশল একটু দেখা যাক—

ক. অনাথবন্ধু বসু: শহরের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে গ্রামে অনেকটা জায়গা জুড়ে নিজের বাড়ি তৈরি করে স্ত্রী, সন্তান, পোষ্যদের নিয়ে 'বাবু' হিসাবে বসবাস করা। ডেইলি প্যাসেঞ্জার হিসাবে কলকাতায় চাকরি। নতুন কিছু তৈরি করে আনন্দ পাবার স্বপ্নে বুঁদ হয়ে ব্যাংক ঋণ নিয়ে সমবায়িক প্রথায় কৃষিকাজে নেমে পড়া। তৈরি করার আনন্দের লেজুড় হিসাবে আসতে থাকে একের পর এক বিপর্যয়, কিন্তু 'হেরে যেতেই হবে আগাম জেনেও দৌড় থামানোর উপায় নেই।' দম ফুরিয়ে আসছিল বলেই যেন খানিক বিশ্রাম নেবার প্রয়োজনে সাময়িকভাবে থামতে হলো— পুনরায় কলকাতার ভাড়াবাড়িতে গিয়ে ওঠা। দম নেবার বিনিময়ে ঈশ্বরীতলার সমস্ত সম্পত্তি (বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট পোষ্য-সহ) বংশী কাপালির কাছে বিক্রি করে দিতে হয়— ঈশ্বরীতলা থেকে নিয়ে যেতে পারে শুধু পৃথিবীকে দেখবার কৌশল।

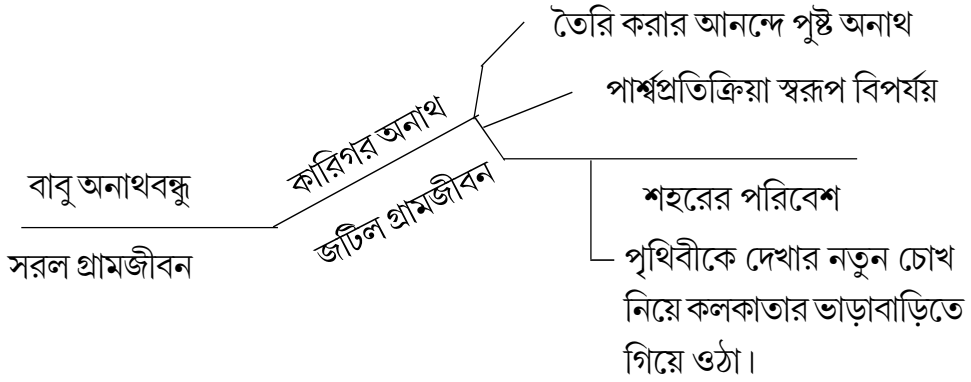

খ. বংশী কাপালী : বিবাহ পরবর্তী শ্বশুরবাড়ির গ্রামে এসে তেলেভাজার দোকান দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস। কঠিন পরিশ্রম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হাতিয়ার করে ধীরে ধীরে ব্যবসার সম্প্রসারণ। তামাকের বস্তায় তামাকের পরিবর্তে ভাগ্যক্রমে বস্তাভর্তি টাকা পাওয়া। কঠোর পরিশ্রম, সঠিক পরিকল্পনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভাগ্যকে সঙ্গী করে সাফল্যের সিঁড়ি দীর্ঘ হওয়া। একসময়ের স্বপ্নের মানুষ অনাথবন্ধুর ঈশ্বরীতলার সমস্ত সম্পত্তি কিনে নেওয়া এবং সেই গ্রামের সবচেয়ে সম্মানীয়, শ্রদ্ধেয়, ধনী মানুষ হয়ে ওঠে টোবাকো মার্চেন্ট বি.সি. কাপালি।

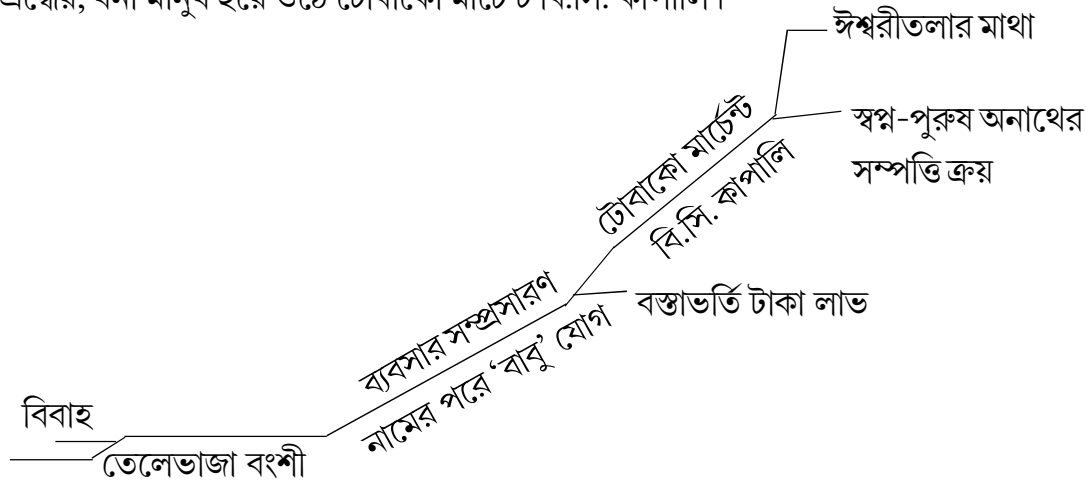

গ. সন্তোষ টাকি: ঈশ্বরীতলায় দুর্ধর্ষ ডাকাত হিসাবে জীবনধারণ। রাজনৈতিক প্রয়োজনে প্রার্থী দক্ষিণা চক্কোত্তির ডানহাত হয়ে ওঠা। দক্ষিণা চক্কোত্তির আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে জীবনচর্যায় পরিবর্তন। যাযাবার অনিশ্চিত ডাকাতি জীবন ভুলতে বসা। শেষের দিকে রিনির সঙ্গে সম্পর্ক। মানসিকতার গুণগত পরিবর্তন ঘটা। 'ভদ্দরলোকেদের জীবন'— এর প্রতি লোভ মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। কিন্তু নিজের অতীত কর্ম ও মানসিকতার গুণগত পরিবর্তন তার জীবনে মৃত্যুর পদচিহ্ন এঁকে দেয়।

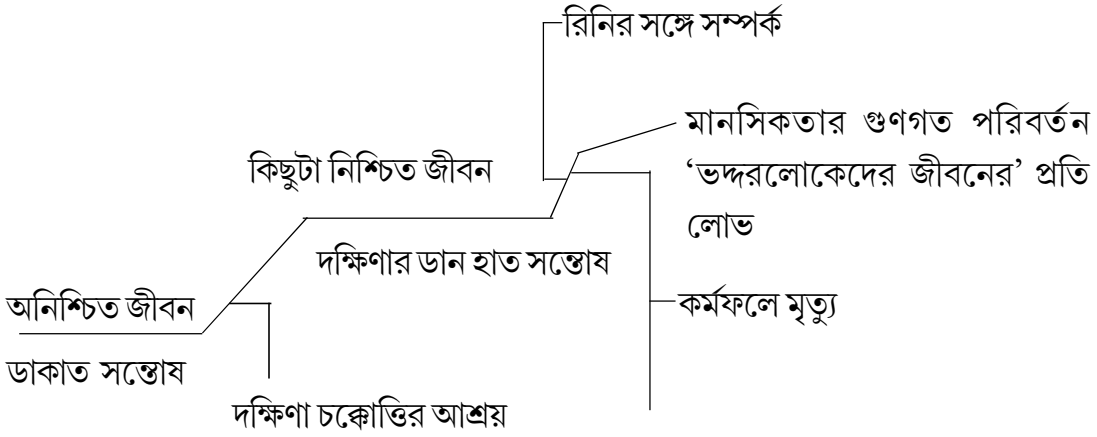

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উপরিউক্ত তিনটি কাহিনিই উপন্যাসে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেছে— তাদের পরিণতিও স্বতন্ত্র। এই উপন্যাসেও পাঠগত আধিপত্য লাভ করা অনাথবন্ধু বিভিন্ন কাহিনির মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপন করেছে কুবেরের মত। তিনটি কাহিনির মধ্যে দুটি কাহিনি যেখানে শেষ হচ্ছে— তা নতুন আখ্যান সম্ভাবনাকে লালন করছে। ফলে এটিকে আমরা রৈখিক প্লটের উদাহরণ হিসাবে ধরতে পারি। তিনটি কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্রদের উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে 'পূর্ব সংকেত' শিল্পকৌশল ব্যবহার করেছেন লেখক। যথা—

ক. অনাথবন্ধু বসু— পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে অনাথের পোষ্যদের মৃত্যু। ধীরে ধীরে তারপর অনাথ এগিয়ে গিয়েছে সমূহ বিপর্যয়ের দিকে।

খ. বংশী কাপালি— ষোলোতম পরিচ্ছেদে তামাকের বস্তায় নোটের তাড়া পাওয়া— কঠোর পরিশ্রম ও সঠিক পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হলো ভাগ্যদেবী। এরপর অতিদ্রুত সাফল্যের সিঁড়ি টপকানো।

গ. সন্তাষ টাকি— অতীত জীবনের কৃতকর্মের ঋণ পরিশোধ না করেই সামাজিক জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসার চেষ্টা। স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই গণপ্রহারে মৃত্যু।

'পূর্ব সংকেত' শিল্পকৌশল হিসাবে ব্যবহার করায় কাহিনি তার নির্দিষ্ট গতিতে, স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। ফলে 'আকস্মিকতা ' লেখক সহজেই এড়িয়ে যেতে পেরেছেন।

কাহিনিবৃত্তের পরিণতি হিসাবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্লটে দু'ধরনের প্লট গঠনই দেখা যায়। একটি হলো বিবৃত সমাপ্তি (Open Ended)। এর উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 'অনিলের পুতুল', 'অলীকবাবু', 'আলো নেই', 'এক সিংহ ও তার রমণী', 'গঙ্গা একটি নদীর নাম', 'জলপাত্র', 'দশ লক্ষ বছর আগে', 'নতুন ভুবন', 'নির্বান্ধব', 'ভালোবাসিব না আর', 'যতীন দারোগার বেদান্ত', 'সওদাগর', 'সিদ্ধকামিনী', 'অদ্য শেষ রজনী', 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' ইত্যাদি। প্লট গঠনের দ্বিতীয় শ্রেণিটি হলো, বৃত্তায়িত সমাপ্তি (Close Eneded)। এর উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 'কুবেরের বিষয় আশায়', 'পরস্ত্রী', 'সতী অসতী', 'হাওয়াগাড়ি', 'বাম অলিন্দ', 'অদৃশ্য ভূমিকম্প', 'কামিনীকাঞ্চন', 'মহাজীবন','তারসানাই', 'স্বর্গের আগের স্টেশন', 'চন্দনেশ্বর জংশন', 'কন্দপ দর্পণ', 'বড় হওয়ার আগে', 'স্বর্গে তিন পাপী', 'টানেলের ভেতরে ট্রেন' ইত্যাদি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ফিরোজা' উপন্যাসটি একটি সরল প্লটের উদাহরণ। এই প্লটে রয়েছে চারদিকে হিংসা, মারামারি, বদলা, প্রতিহিংসা, ভাঙন, পতন, উত্থান ইত্যাদির মাঝখানেও দুটি মানুষের ভালোবাসার প্রতি গভীর আস্থা। যার মধ্যে মানুষের বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব, মানবিকতা ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। উপকাহিনি নেই। স্মৃতিচারণ ও বর্তমান পরিস্থিতি— উভয় সময়কে ধরে আছে জন্মভূমির প্রতি গভীর টান ও প্রতিশোধ-হিংসা ভুলে মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা। কাহিনি বিস্তারের কৃপণতা, সূচনা বাক্য থেকেই পরিণামের দিকে তীরবেগে ছুটে চলা, স্বল্প চরিত্রের উপস্থিতি ইত্যাদি আমাদের মনে ছোটগল্পের ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করে। ঠিক প্রায় একই রকম ব্যাঞ্জনা আমরা পাই শ্যামলের 'স্বর্গে তিন পাপী' উপন্যাসে। এটিও একটি সবল প্লটের উপন্যাস। এখানে তিন বন্ধুর আত্মউপলব্ধির কথা ফুটে উঠেছে— এই আত্মউপলব্ধির পরিধির মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্ব, শারীরিক আকর্ষণ, গুপ্ত অভিসন্ধি। এই উপন্যাসের আত্মউপলব্ধির বিন্দুটি ছোটগল্পের মত 'চরম মুহূর্ত'-এর ব্যঞ্জনা দেয় এবং সেখানেই উপন্যাসের 'সমাপ্তি' যেন ছোটগল্পের পথ অনুসরণ করে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসের গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব ছোটগল্পের মত অনিশ্চয়তা, আকস্মিকতা, প্লট গঠনের অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। যদিও আমরা জানি, পাঠকের সামনে অনিশ্চয়তা-আকস্মিকতা উপস্থিত করতে হলেও তা কাহিনিবৃত্ত তৈরির অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত হবে। লেখক এই বিশেষ রীতির অমান্য

না করেই পাঠকের সামনে এক ধরনের অনিশ্চয়তা-আকস্মিকতা উপহার দেয়। কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব। যেমন— 'জলপাত্র' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে যখন ঋষিরাজ পুরকায়েত তার বাড়ির পরিচারিকা কুন্তি মান্নার সঙ্গে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কুন্তির গ্রামের বাড়ির দিকে রওনা দেয় তখন পাঠকও এক ধরনের অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে সেই যাত্রাপথে সামিল হয়। শেষপর্যন্ত উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক বা সফল হবে কিনা সে বিষয়ে খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও ঋষিরাজের কুন্তির গ্রামের বাড়িতে ওঠা নিয়ে কোনও সন্দেহ লেখক পাঠকের মধ্যে তৈরি করে না। কিন্তু আমরা কাহিনিতে দেখতে পাই, কুন্তির হেঁড়িয়া-বেচবেড়িয়া গ্রামে ঢোকার অনেক আগেই মাদাখালি গ্রামে নিশুতি রাতে যখন চারিদিকে শুধু নিঃঝুম ঘুটঘুটে অন্ধকারের রাজত্ব সেখানে ঋষিরাজের যাত্রা খানিকটা যেন আকস্মিকভাবেই থেমে যায়। উদ্দেশ্য সফল হওয়া তো দূরের কথা, উদ্দিষ্টের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হয় না ঋষিরাজের। কিন্তু লেখক সফল হয় উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত নির্মাণের মধ্যে থেকে পাঠকের সামনে আপাতদৃষ্টিতে অনিশ্চয়তা-আকস্মিকতা উপহার হিসাবে তুলে ধরতে। গভীরভাবে কাহিনি বিশ্লেষণে দেখা যাবে, যাত্রার শুরু থেকে কুন্তিকে প্রতিনিয়ত গালি দিয়ে সম্বোধন, উনিশ শতকীয় 'বাবু' মানসিকতায় নিজেকে উপস্থিত করার চেষ্টা, জলপাত্র করে রাখার পুরানো নোংরা মানসিকতায় ঋষিরাজ উপলব্ধিই করতে পারেনি বদলে যাওয়া সময়কে। কুন্তী প্রথম থেকেই একটি লোভনীয় টোপ সামনে রেখে নিজের পরিকল্পনা মতো কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ঋষিরাজের ওপর আমাদের অতিরিক্ত ফোকাস থাকার ফলে কুন্তির আচরণ আকস্মিক ও ঋষিরাজের উদ্দেশ্যে অনিশ্চয়তা আপাতদৃষ্টিতে দেখতে পাই। কিন্তু লেখক নিপুণ শিল্পীর মত কাহিনির অন্তর্গঠনেই এই অনিশ্চয়তা ও আকস্মিকতার বীজ রোপিত করেন। লেখকের এই গঠনশৈলীর বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই 'কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল' উপন্যাসে, সেখানেও কুন্দনলালের মৃত্যু হয় নিজেরই ছেলে প্রবীরের হাতে। আবার 'যতীন দারোগার বেদান্ত' উপন্যাসে যতীনের মনস্তাপ, মালতীর ভবিষ্যৎ ও নেপালের যতীনের প্রতি সহমর্মী হয়ে ওঠা কাহিনির সমাপ্তিতে একটি অনিশ্চয়তা ও আকস্মিকতার সামনে আপাতদৃষ্টিতে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেয়। আবার 'কহেলগাঁও' উপন্যাসে স্বরূপ ও মশায়ের তর্ক যেন আকস্মিকভাবেই শুরু হয় এবং স্বরূপের সঙ্গে রণেনের বন্ধুত্ব এক অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে যায়। 'মাতৃচরিতমানস' উপন্যাসে শুরু থেকেই আভা-অসিতের সম্পর্ক নিয়ে প্রবল আপত্তি জানানো আভার দুই পুত্রবধূ রুবি ও সরমা আভার মৃত্যুর পর অসিতের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। এটাকেও আমরা পাঠকের সামনে

আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিকতা-অনিশ্চয়তা তুলে ধরা বলতে পারি। 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কাহিনি শেষ হচ্ছে মাঝ গঙ্গায়। যখন ইঞ্জিন চালু করা যাচ্ছে না ভুটভুটির, বরফ গলে গিয়ে ভেটকি-ইলিশ দুই-ই পঁচতে শুরু করেছে, আশেপাশে ডাঙার কোনও অস্তিত্ব নেই। হাজরা হালদার ও মুকুন্দ পালের ভবিষ্যৎ আকস্মিক অনিশ্চয়তা নিয়ে পাঠককে যেন জোর ধাক্কা দিয়ে যায়। 'ভালবাসিব না আর' উপন্যাসে জন্মান্তরের স্মৃতি মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। কাহিনির শেষে খুকুকে বাঁধা দেবার সময় সদ্য সাবালক হয়ে ওঠা পটলের সঙ্গে খুকুর একটি বৃত্ত সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলে লেখক থেমে যান। যেন পাঠকের কাঁধে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয় এই সম্ভাবিত বৃত্তের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে। তবে এটি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গঠননৈপুণ্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রায় একই রকম পদ্ধতিতে বীরেনের সংশয় সমাধানের দায়িত্ব বর্তায় পাঠকের কাঁধে 'এক গেরস্তর তিন সংশয়' উপন্যাস পাঠে।

অনেক ঔপন্যাসিক কাহিনি-বিন্যাস রীতিতে নাটকীয়তার উপাদান ব্যবহার করেন। ফলে উপন্যাসের মধ্যে নাট্যধর্ম প্রকাশিত হয়। এখন প্রশ্ন হলো নাট্যর্ধম বা নাটকীয় উপাদান বলতে আমরা কী বুঝি? আর কেনই বা লেখকদের প্রয়োজন হয় উপন্যাসে এটা ব্যবহার করার? আসলে জীবন যেখানে ঘটনাবিমুখ বা ঘটনার স্বল্পতায় প্রকাশমান কিংবা জীবন যেখানে নিস্তরঙ্গ নদীর মত বহমান সেখানে সেই জীবনকে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তোলা বা সজীব করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করার জন্য উপন্যাসের মত ধীর লয়ের আঙ্গিক যথোপযুক্ত। কিন্তু যেখানে জীবন দ্বন্দ্বপ্রধান, ঘটনাপ্রধান, টালমাটাল অস্থির জীবনপ্রবাহ, সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবনকে মুহূর্ত ধরে অনুভব করার চেষ্টা, সেখানে সেই জীবনকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নাটকীয় উপাদান ব্যবহার করা হয়। সেই জীবনকে জীবন্তভাবে প্রকাশের জন্য নাট্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। আর আমরা জানি, জীবন বিচিত্র, জীবন বহুমুখী; আর সেই বিচিত্র বহুমুখী জীবনের সামগ্রিক প্রকাশ একমাত্র উপন্যাসের আঙ্গিকেই সম্ভব। ঠিক এই কারণেই উপন্যাসে যে জীবন প্রকাশিত হয়, তার প্রকৃতি অনুযায়ী লেখক নাটকীয়তা, কাব্যিকতা, ছোটগল্পীয় বৈশিষ্ট্য, প্রাবন্ধিক তথ্যনিষ্ঠা ইত্যাদি নানান উপাদান লেখক ব্যবহার করেন। উপন্যাস তার আঙ্গিক নমনীয়তার জন্য উপরিউক্ত সমস্ত শিল্পকৌশলের বৈশিষ্ট্যকে সহজেই আত্মীকরণ করে নিতে পারে। এজন্যই হয়তো একমাত্র উপন্যাসের আঙ্গিকেই বিচিত্র বহুমুখী জীবনের সামগ্রিক পরিচয় লেখকরা ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আর দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে জন্ম নেওয়া যে লেখকের শৈশব-কৈশোর পর্ব শুধু ঘটনার ভেতরে বাস করে; শুধু তাই নয়, দেশভাগ, উদ্বাস্তু

সমস্যা, শুধু লেখার জন্য শহর ছেড়ে গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস, কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটে; সেই লেখক অর্থাৎ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে নাটকীয় উপাদান ব্যবহার করবেন— এটাই তো স্বাভাবিক।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই নাটকীয় উপাদান ব্যবহার করেছেন। এখানে আমরা কিছু নির্বাচিত উপন্যাসে সংক্ষেপে নাটকীয় উপাদানের প্রয়োগ উল্লেখ করব। 'দশ লক্ষ বছর আগে' উপন্যাসে কাহিনির সূচনাতেই একটা অদ্ভুত জন্তুর কথা বলে নাট্যোদ্বেগ সৃষ্টি করেন লেখক। তারপর দেখতে পাওয়া ও না-দেখতে পাওয়া মানুষদের সেই জন্তুটি সম্পর্কে ধারণা ও বিশ্লেষণ পাঠকের মধ্যে উত্তেজনা ও আগ্রহ তৈরি করে। এই নাট্যোৎকণ্ঠাকে হাতিয়ার করেই লেখক নতুন জীবনের অনিবার্য অবশ্যম্ভাবী আগমনের বিষয়ে ঢুকে যান। কাহিনির সমাপ্তিতে আরতি কুণ্ডু জানান, ''না কিছুতেই দেবে না। সে আসুক। সে নতুন। আমাদের তো দিন ফুরিয়েছে এলসা।''[৮] এভাবেই লেখক প্রকাশ করেন সময়-নিয়তি। প্রায় একই রকম নাট্যোৎকণ্ঠা আমরা দেখতে পাই 'একদা ঘাতক' উপন্যাসে। সেখানে একদা নকশাল বিপ্লবী সুকুমারের পরিচয় সুধা ও পাঠক জানে। কিন্তু জানে না সুকুমারের বাগদত্তা রাধা। যে রাধাকে নিয়ে সুকুমার পুনরায় নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন দেখে। সুকুমারের আশঙ্কা যদি রাধার কাছে তার অতীত জীবন উন্মোচিত হয়ে যায়, তাহলে নতুন জীবনের সব স্বপ্ন-সাধ ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। এই জন্য তার অতীত জানা সুধাকে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দিতে চায় যে, যেখানে সুধা সুকুমার সম্পর্কে সত্যি কথা বললেও, মানুষ বলবে এটা পাগলের প্রলাপ। শেষপর্যন্ত সুধা কিংবা সুকুমার— কে তার উদ্দেশ্যে সফল হয়, এই উৎকণ্ঠা বা নাট্যোৎকণ্ঠা পাঠকের মধ্যে সর্বক্ষণ বজায় থাকে। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের কাহিনিধারায় 'আকস্মিকতা'-র ব্যবহার করেন লেখক যখন সুকুমার সুধার স্মৃতিনাশ করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে কোনও রকম জোগাড়যন্ত্র ছাড়াই নিজেরই স্মৃতিনাশ ঘটে। সুকুমারের অতীত পরিচয় সম্পর্কে এখানে লেখক উপন্যাসের চরিত্র রাধা ও পাঠকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেন। নাটকের পরিভাষায় একে নাটকীয় ব্যাজস্তুতি বলে যাতে দর্শকমনে একই সঙ্গে উদ্বেগ, বেদনা, আশঙ্কা, কৌতুক ইত্যাদি অনুভূতির সৃষ্টি হয়। 'ফিরোজা' উপন্যাসে ফিরোজাকে সঙ্গে নিয়ে খোকনের রাজাকার বাহিনির এক সমর্থক রশিদকে মুক্তিবাহিনির সদস্যদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রাতের বেলায় অভিযানে বের হওয়া, শেষপর্যন্ত রশিদের পরিণতি নিয়ে উদ্বেগ ইত্যাদির মাধ্যমে এখানেও লেখক নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছেন। আবার 'অলীকবাবু' উপন্যাসে দু'জন মানুষের সাক্ষাৎপর্বের আগে নাটকীয় উত্তেজনা

সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃত লেখক চরিত্র রমেন ঘোষের সঙ্গে পাঠকও যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে ছদ্মবেশধারী রমেন ঘোষের প্রকৃত পরিচয়-রহস্য জানার জন্য। উপন্যাসের পুরো কাহিনি জুড়ে এই নাট্যোৎকণ্ঠা লেখক বজায় রাখেন। দুই রমেন ঘোষের চরিত্রকে ব্যবহার করে লেখক এই নাট্যোৎকণ্ঠা তৈরি করেছেন। 'ভালবাসিব না আর' উপন্যাসে কাহিনির শেষে একদিকে কমলেশের খুকুকে আহ্বান ও অন্যদিকে খুকুকে পটলের বাধা দেওয়া— এই অংশে নাট্যোৎকণ্ঠা তৈরি করেছেন। ফলে পাঠকও উত্তেজনার সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকে খুকুর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে বা পটলের আচরণ বিষয়ে। 'তৃতীয় মেরু' উপন্যাসেও কাহিনির শেষে তীব্র নাটকীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় যখন টগর ওরফে অনিমেষ শ্রীকুমার বেদান্ততীর্থকে জানায়, সে শ্রীকুমারের পুরানো অতীত কার্যকলাপ ফাঁস করে দিবে সবার কাছে। শুধু তাই নয়, যখন অনিমেষের সঙ্গে শ্রীকুমারের বাদানুবাদ চলছিল তখন অনিমেষ শ্রীকুমারকে আত্মহত্যার জন্য প্রবল মানসিক চাপ তৈরি করে। দু'জনের এই বাদানুবাদে একটি চরম উৎকণ্ঠা তৈরি হয় কাহিনিতে যেখানে অসুস্থ বৃদ্ধ শ্রীকুমার এই চাপ সহ্য করতে না পেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলে। নাট্যোৎকণ্ঠা ও নাটকীয় ব্যাজস্তুতির সার্থক উদাহরণ হলো 'আবিষ্কার' উপন্যাস। নিতাই ডাক্তার ও ভক্তির প্রকৃত সম্পর্কের উন্মোচন, নিতাই ডাক্তারের পরিচয়-রহস্য উদ্‌ঘাটন, নিতাইয়ের অতীত কার্যকলাপ, নির্মল ও ভক্তির পালানোর পরিকল্পনা— সবই নাটকীয় উপাদানের সাহায্যে লেখক কাহিনি বিবৃত করেছেন। 'এক সিংহ ও তার রমণী' উপন্যাসে রজনী ও বুধুয়া নামক সিংহের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যেও নাটকীয় উপাদান বর্তমান।

লেখক 'জীবনরহস্য' গ্রন্থে বলেছেন, ''মার্কেস এসে পড়ায় বাজারে খুব ম্যাজিক রিয়ালিটির কথা শোনা যায়। ব্যাপারটার নাম জানতাম। সেদিন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশিরকুমার দাস বলল, ওটা নাকি আমার অনেকদিনই আছে। দেখলাম হ্যাঁ। সেই বৃহন্নলা উপন্যাসের সময় থেকে— তিরিশ বছর আগে— যে উপন্যাসের নাম এখন অর্জুনের অজ্ঞাতবাস। অনিলের পুতুলে স্বপ্নের ভেতর ময়ূর এসে মৃত দাদার চোখ খুঁটে খাচ্ছে লিখেছিলাম। সেসব নাকি ম্যাজিক রিয়ালিটি। আসলে লেখার বীজে যখন ভাষা দিয়ে কিছুতেই পৌঁছাতে পারি না, তখন অস্থির দশায় ওইসব পাগলামির জায়গায় পৌঁছে যাই।''[৯] উপন্যাসে 'অলৌকিকতা', 'কাল্পনিকতা', 'স্বপ্ন' ইত্যাদির ব্যবহার উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই লেখকেরা নানাভাবে বিবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে আসছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই ব্যবহারের যৌক্তিকতা বা প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? আমরা জানি, উপন্যাসের ভিত্তিভূমি হলো

বাস্তবতা বা বাস্তব জীবন। বহুরঙে রঞ্জিত, বহুদিকে ধাবিত, বহুধারায় প্রবাহিত মনের অন্তহীন বাঁক, স্তর, নানান অলি-গলি নিয়ে যে 'মানব হৃদয় ও মানব চরিত্র'— তা সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার জন্যে লেখক এই 'অলৌকিকতা', 'কাল্পনিকতা', 'স্বপ্ন' ইত্যাদি উপাদানের ব্যবহার করেন। আসলে লৌকিক জীবনকেই পরিস্ফুট করতে গিয়ে লেখক অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস নিয়ে দেখব তিনি কীভাবে নানা মাত্রায় 'অলৌকিকতা' বা 'কাল্পনিকতা' বা 'স্বপ্ন'-এর ব্যবহার করেছেন।

'অনিলের পুতুনল' উপন্যাসে লেখককে অনিলের একটি আপাত উদ্ভট স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করতে দেখি। শ্যামল তাঁর অনেক উপন্যাসে স্বপ্নের মাধ্যমে অলৌকিকতা এনেছেন। অনিল তার স্বপ্নে একদা মৃত খগেশ দাদাকে বাড়িতে আসতে দেখে। তার দাদা যে এতদিন বেঁচে আছে এবং তার সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে বাড়িতে এসেছে— এই ঘটনা তাকে চমকে দেয়। এত বড় আবিষ্কার (দাদার বেঁচে থাকা) জানতে পেরে সবাইকে বলার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আবার সেই দাদার সঙ্গে আনা সাদা ময়ূর, যে কিনা চোখ খেতে ভালোবাসে এমনকি মানুষেরও, সেই ময়ূরটি শেষে অনিলেরই চোখ খেতে উদ্যত হয়। অনিলের এই পুরো স্বপ্নটি অনিলের সাধারণ গতানুগতিক জীবনে একটি অলৌকিক ক্ষেত্র তৈরি করে। আসলে দাদা খগেশের অকালমৃত্যু, জীবনের যাত্রাপথে এক সঙ্গী-অবলম্বন হারানো অনিলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধান এই গভীর অভিঘাতকে মনের চেতন স্তর থেকে অবচেতন বা অচেতন স্তরে সরিয়ে ফেলে। আর স্মৃতি তো অবিনাশী। ফলে সেই অভিঘাত-স্মৃতি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ফিরে আসে অনিলের জীবনে। ঘটনা-বিরল অনিলের এই স্বপ্ন দেখার আগে তার ভাবনা দেখা যেতে পারে, ''তার ওপর দাঁতের ব্যথা। মুখ ফুলে গেছে। সেদিন রাতে এসব কথাই ভাবছিল হয়তো। সেজোর অবস্থাও ভালো না। ঘুম ভেঙে উঠে মনে হচ্ছিল, কিছুই করবার নেই। হয়তো মরবারও নেই। কিছুই নেই। কতদিন আগে ছোট ছিলাম। সেখানে ফিরে যাওয়া যায় না। সেখান থেকে এখন আরম্ভ হলে এই এখন অনেক দেরিতে আসত। ভাবা যায় না। অনিলের বোধ হয় মনে হচ্ছিল, চারখানা দেওয়াল যদি ঘটঘট শব্দ করে তার ঘাড়ের ওপর পড়ে তবে সবেচেয়ে ভালো হয়। এতদিনে তাহলে একটা ঘটনা ঘটে।''[১০] এই স্মৃতিকাতরতা, ঘটনা বিরল সাধারণ গতানুগতিক জীবন, সঙ্গী-অবলম্বন হারানো ইত্যাদি বিষয় প্রতীক-অলৌকিকতা জুড়ে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অনিল দেখে। অনিলের এই ভাবনা

সাধারণ উপায়ে দেখাতে না পেরেই লেখক দ্বারস্থ হয় প্রতীক-অলৌকিকতায়।

'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে কাহিনির একেবারে শেষের দিকে কুবেরের চাঁদ সম্পর্কে ভাবনা ও কার্যকলাপ অলৌকিকতার উপাদান দিয়ে তৈরি। কুবেরের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল একেবারে সাধারণ অবস্থা থেকে। তারপর কুবের জীবনের যেসব বাঁক পেরিয়ে যে উচ্চতায় পৌঁছায় তা অনেকটা যেন চাঁদে পৌঁছানোর মত। যে সমাজ ও সংস্কার ছেড়ে যে নতুন সমাজ ও সংস্কারে এককভাবে ঢোকার চেষ্টা এবং সেখানে থিতু হবার ব্যর্থ প্রয়াস লেখকের বর্ণনায় এইভাবে ফুটে ওঠে, ''এইমাত্র কুবের মইসুদ্ধ কাত হয়ে নিচে পড়েছে। টাল রাখতে পারেনি। চাঁদ বড় স্লিপারি।''[১১] চাঁদ যেন এখানে বুর্জোয়া সমাজের প্রতীক হিসেবে উঠে আসে এবং এই চাঁদের নতুন রূপের সন্ধান বা আবিষ্কার কুবেরের কাউকে বলতে না পারার কারণ হয়তো এই সমাজে তার একক অনুপ্রবেশ। এই সমস্ত বিষয় তুলে ধরতেই লেখক এখানে অলৌকিকতার উপাদান ব্যবহার করেছেন। আর তাছাড়া মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের চাঁদ সম্পর্কে রোমান্টিক ভাবালুলতার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে পুরো দৃশ্যটি কল্পনা করা হয়েছে। কারণ আমরা দেখেছি কুবের তার ছেড়ে আসা সমাজ ও সংস্কার মন থেকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারেনি কখনও। 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে নিবারণ পাকড়াশির বন্ধুত্ব, ভালোবাসাবাসি, আত্মা নিয়ে যে ভাবনা-চিন্তা ও কার্যকলাপ তা লেখকের বন্ধুত্ব , নিঃসঙ্গতা, ভালোবাসাবাসি-মেশামেশি ইত্যাদি প্রসঙ্গকে রূপায়িত করেছে। আসলে লেখক এই সব প্রসঙ্গের তীব্রতা, নিবিড়তা, প্রচণ্ডতা ইত্যাদি বোঝাতে গিয়ে হিটলারের মত ব্যক্তিত্ব ও নানান অলৌকিক উপাদান নিয়ে আসেন। নিবারণের যে যন্ত্রণা তা লৌকিক উপায়ে যাথাযথভাবে উপস্থাপন করতে না পেরেই লেখককে এই পথ অবলম্বন করতে হয়।

'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসে আমরা দেখি অনাথবন্ধু বসু মনুষ্যতর প্রাণীর সঙ্গে কথা বলছেন, উভয়ের মধ্যে ভাষা বিনিময় হচ্ছে। আপাততদৃষ্টিতে বিষয়টি অলৌকিক মনে হলেও এটা সহানুভূতি ও মমত্ববোধের চূড়ান্ত নিদর্শন। অনাথবন্ধুর সঙ্গে তার পোষ্য মনুষ্যতর প্রাণীর যে গভীর সম্পর্ক, উভয়ের মধ্যে যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, যত্নশীল ইত্যাদি মনোভাব— সেটাকেই যেন প্রকাশ করতে উভয়ের মধ্যে ভাষা বিনিময় ঘটিয়েছেন লেখক। একে অপরকে বুঝতে পারার একটি কৌশল হিসাবে লেখক এখানে মানুষের মধ্যে মনুষ্যতর প্রাণীর ও মনুষ্যতর প্রাণীর মধ্যে মানুষের ভাষা প্রয়োগ করেছেন লেখক। এই কৌশল লেখকের অন্যান্য উপন্যাসেও দেখতে পাই। যেমন— 'স্বর্গের আগের স্টেশন' উপন্যাসে খগেনের সঙ্গে মাদি কেউটের কথাবার্তা, 'চন্দনেশ্বর জংশন'

উপন্যাসে বজরার সঙ্গে মজানদীর ধারে বড়ো বড়ো পাথরের সঙ্গে কথাবার্তা, 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' উপন্যাসে হাজরা হালদারের সঙ্গে মনুষ্যতর প্রাণীর কথাবার্তা। সবক্ষেত্রেই লেখক নিবিড়তা, ঘনিষ্টতা, ভিন্ন প্রজাতি ও জীব-জড়ের মধ্যে আত্মীয়তা বোঝানোর জন্য ভাষা ব্যবহারের কৌশল প্রয়োগ করেছেন। লেখকের গঠন-কৌশলের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তাজ মহম্মদের স্বপ্ন আমাদের বঙ্গদেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাস, ভূগোলকে সুকৌশলে তুলে ধরে। আর একথা তো আমরা সবাই জানি, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য বঙ্গদেশের নদীপথ, বাণিজ্য-বন্দর, (বিশেষ করে মনসামঙ্গল কাব্য) সামাজিক জীবনযাত্রার (মঙ্গলকাব্যের 'নরখণ্ড') বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান। লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' উপন্যাসে গঙ্গা নদী ও তার দু'পাশে গড়ে ওঠা জীবনযাত্রা ও বদলে যাওয়া জীবনযাত্রাকে তুলে ধরতে তাজ মহম্মদের স্বপ্নের মাধ্যমে ইতিহাসের শরণাপন্ন হয়ে একটি বিশ্বাসযোগ্য যোগসূত্র তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এবং বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ না করেই তিনি একাজে সফল হয়েছেন। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, যোগসাধনা, তন্ত্রসাধনা ইত্যাদি ভারতবর্ষীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে অঙ্গীভূত একটি বিষয়। সাধারণ মানুষের চোখে এটি অলৌকিকতার একটি অন্যতম নিদর্শন হলেও এই বিষয়গুলো যথাযথভাবে তুলে ধরতে গেলে অলৌকিকতা ও কাল্পনিকতার মোড়ক অবশ্যম্ভাবী। লেখক যেহেতু বহুমুখী জীবনের বৈচিত্র্য তুলে ধরতে চেয়েছেন, তাই লেখকের অনেক উপন্যাসেই উক্ত বিষয়গুলোর বিশ্বাস, চর্চা যথাযথরূপে ধরা দিয়েছে। যেমন, 'স্বর্গের আগের স্টেশন', 'সিদ্ধকামিনী', 'কঠিন সময়' ইত্যাদি উপন্যাস। জীবনবিশ্বাস-বৈচিত্র্য তুলে ধরাই লেখকের এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে কাজ করেছে। ঠিক এই ধরনের একটি বিশ্বাস হলো জন্মান্তরবাদ বা জাতিস্মর। যার হাত ধরে অনায়াসেই উপন্যাসের কাহিনিতে প্রবেশ করে আপাতদৃষ্টিতে কিছু আজগুবি ঘটনা। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'ভালবাসিব না আর' ও 'গত জন্মের রাস্তায়' উপন্যাস দুটি। আসলে লেখক যখন বাস্তব জীবনকে তুলে ধরেন তখন সহজাতভাবেই এসে যায় জীবনের নানা বিশ্বাস, চর্চা, অনুশীলন, কার্যকলাপ ইত্যাদি। এই সব কিছুই যুক্তির দাঁড়িপাল্লায় খাপ খেয়ে চলে না বা এক জীবনের বিশ্বাস অন্য জীবনের কাছে অলৌকিক বা আজগুবি মনে হয়। কোথাও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কোথাও বা অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা। কিন্তু লেখক যেহেতু জীবনবিশ্বাস-বৈচিত্র্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ, সেহেতু উপন্যাসের কাহিনি গঠনে অলৌকিকতার উপাদান মিশ্রিত হয় লেখকের নিজস্ব শৈল্পিক নৈপুণ্যতায়। আর এখানেই পার্থক্য সৃষ্টি হয় বাস্তববাদী

উপন্যাসের সঙ্গে শিশু-কিশোর মনোরঞ্জনকারী অলৌকিক-আজগুবি উপন্যাসের।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কাহিনি-বিন্যাস রীতিতে কীভাবে স্বপ্ন ও স্বপ্নের মধ্যে ঘটা ঘটনার যোগসূত্র স্থাপন করেন তার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে 'হিম পড়ে গেল' উপন্যাসে। এখানে দেবকুমার বসু স্বপ্ন দেখছেন কিন্তু তার আগে লেখক জানাচ্ছেন, ''দেবকুমার বসু তার বাঁধান কবিতার খাতায় একদম কাটাকুটি না করে এ কথা ক'টি লিখে ফেলল। লিখে বুঝল সে যে জায়গায় পৌঁছতে চাইছে— সে জায়গায় যেতে পারছে না। এই শরীর আরও কোনো প্রবীণ শরীরের উত্তরাধিকারী। জন্ম জন্মান্তরের কোনো অতি প্রবীণ প্রবৃদ্ধ বাবা থেকে তার এই শরীরের শুরু। কোনো অতি বৃদ্ধ বানর পিতা নানা জীবনের ভেতর দিয়ে তাকে এই শরীর দিয়েছেন। সে শরীরের রক্তে পৃথিবীর সমবয়সী ঘ্রাণ। অস্থিতে মাটির জন্মের সময়কার দাগ। ...''[১২] এরপর লেখক দেবকুমার বসুর স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন, যেখানে ছোটবেলার প্রিয় লেখক সুকুমার দে সরকারের সঙ্গে তার কথা হচ্ছে। আত্মঘাতী হরিণ, পাতাল ইত্যাদি প্রসঙ্গও উঠে আসছে। সময়ের প্রবাহমানতা, স্মৃতি-চেতনা-বোধির যে যাত্রাপথ, তা হয়তো এভাবেই দেখানো সম্ভব। ফলে এই স্বপ্ন-কল্পনা আমাদের কাছে কাহিনিচ্যুত বা আরোপিত কোনও ঘটনা মনে হয় না। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সর্বদা পাঠককে তৈরি করে নেন সেই স্বপ্ন-কল্পনার জগতে প্রবেশ করার আগে। এই মায়াজগতে হরিণ তার কাছে একটি প্রিয় পশু। শ্যামলের কাছে নিষ্পাপ, সরল, সৎ ইত্যাদি অনুভূতির যেন সংমিশ্রিত রূপ হলো হরিণ। আর আমরা দেখেছি অনেক উপন্যাসেই প্রধান চরিত্রের মধ্যে 'সৎ' হবার প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসেও দিলীপ বসুর সঙ্গী একটি বাচ্চা হরিণ। ভুতুড়ে গাড়ি, মৃত কালু ঘোষ ও হরিণের বাচ্চার সঙ্গে দিলীপ বসুর সম্পর্ককে লেখক এমনভাবে কাহিনির বাস্তবতায় মিশিয়ে দেয় যে উপন্যাসের সমাপ্তিতে অলৌকিক সব ঘটনাগুলো কাহিনি-সত্যের অন্তর্নিহিত বাস্তবতায় নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়। অলৌকিক অবাস্তবতার মধ্যে নিহিত লৌকিক বাস্তবতাকে কাহিনি বয়নের কৌশলে নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করার পদ্ধতি লেখক হিসাবে শ্যামলকে একটি নতুন উচ্চতায় স্থাপন করে। আমরা এই অধ্যায়ের সূচনাতেই বলেছিলাম ভাব প্রকাশের কৌশলই মূলত রচনা— এখানেই প্রধানত লেখকের সাহিত্য প্রতিভা প্রতিভাত হয়— এক লেখক থেকে অন্য লেখকের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই রচনা-কৌশল, নিজের বক্তব্য প্রকাশ-কৌশল প্রথম শ্রেণির শক্তিশালী লেখক হিসাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

'শিকড়' উপন্যাসে লেখকের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা উঠে আসে। যে চরিত্রের

মাধ্যমে লেখক এই ধারণাগুলো পাঠকের সামনে পরিবেশন করেন, তিনি হলেন তপন গুহরায়। যে প্রতি পূর্ণিমায় উন্মাদ হয়ে যায়। গ্রহ-নক্ষত্র, লগ্ন-তিথি-রাশি, পাথর, মহাজাগতিক চেতনা, ব্রহ্মাণ্ডের শিকড় ইত্যাদি সূত্রে তপনের বিভিন্ন চিন্তাসূত্র কাহিনির মধ্যে একটি মায়াজাল তৈরি করে। এই সব বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের কাছে বরাবরই রহস্যময়, আলো-আঁধারি ব্যাপার। ফলে লেখক অনায়াাসেই তার ভাবনা-বিশ্বাসকে পরিচালিত করে কল্পনা-সম্ভব ঘটনার মধ্যে দিয়ে। সাধারণ মানুষের গতানুগতিক চিন্তাধারার বাইরে বিভিন্নধারার সম্ভাব্য ঘটনাধারার মধ্যে নিক্ষেপ করেন পাঠককে। 'দশ লক্ষ বছর আগে' উপন্যাসে এভাবেই একটি প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর কথা বলেন এবং একটি চরিত্রের মাস অনুযায়ী উন্মাদ হবার ঘটনায় পাঠককে একটি বৃহত্তর সত্যের দিকে ধাবিত করেন লেখক। আসলে লেখক অলৌকিকতা, স্বপ্ন, উদ্ভট কাল্পনিকতা ইত্যাদির মাধ্যমে ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, বৃহত্তর সত্য, বহুমুখী জীবন-বিশ্ব বৈচিত্র্য ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই ধরনের আরও অনেক উপন্যাস শ্যামলের রচনাসম্ভারে রয়েছে। যেমন, 'স্বপ্নসম্ভব', 'ডুব সাঁতারের বিপদ আপদ', 'এক সিংহ ও তার রমণী', 'হলদি নদীর সারেং', 'নতুন ভুবন' ইত্যাদি।

খ. উপস্থাপনা রীতি:

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উপস্থাপন রীতির মধ্যে আমরা নিরীক্ষণ ও কথনরীতি— এই দুটি বিষয়ের আলোচনা করব। উপন্যাসে নিরীক্ষণ বা ফোকালাইজেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। কারণ লেখক এর মাধ্যমেই স্থির করেন, ''কাহিনীটি কার বা কাদের চোখ দিয়ে দেখা ও দেখানো হবে। কথক যেই হোক, তার চোখ দিয়ে যে সবসময় কথন-বিশ্ব দেখানো হবে, এমন কোনও পূর্ব শর্ত আখ্যান কথনে নেই।"[১৩] তাই নিরীক্ষণের মধ্য দিয়েই আখ্যানে বা কাহিনিতে প্রেক্ষিত গড়ে ওঠে। যথা— অন্তঃপ্রেক্ষিত ও বহিঃপ্রেক্ষিত। আর এই প্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয় কথনরীতি বা কথন পরিস্থিতি, চরিত্রের ভাষা ব্যবহার ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি। এই সমস্ত বিষয় যে কোনও উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা করতে বা উপস্থাপন করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমরা এই পর্বে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস অবলম্বনে উপরিউক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করব।

আমরা আগেই জেনেছি যে, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আত্মজৈবনিক উপাদান দ্বারা নির্মিত। ফলে নিরীক্ষণ ব্যবহার করা হয় কাহিনিতলের কোনো মুখ্য

বা গৌণ ভূমিকা বা চরিত্রের। যদিও কথক কাহিনিতলের বাইরের একজন। তাই এই উপন্যাসগুলোতে ভূমিকানুগ কথনরীতি বা কথনপরিস্থিতি দেখা যায়। এই কথন পরিস্থিতি সম্পর্কে অধ্যাপক অমিতাভ দাস জানান, ''এ ক্ষেত্রে নিরীক্ষক কখনও কথক, কখনও কাহিনিতলের কোনো চরিত্র বা ভূমিকা। কথক কাহিনীতলে অবস্থান করে না। ফলে কথকের বহিঃপ্রেক্ষিত এবং কাহিনীতলের ভূমিকাদের অন্তঃপ্রেক্ষিত দিয়ে গড়ে ওঠে ভূমিকানুগ কথন। ফলত অন্তঃপ্রেক্ষিত ও বহিঃপ্রেক্ষিতের অনবরত বিনিময় চলতে থাকে।''[১৪]

ভূমিকানুগ কথন, অন্তঃ-বহিঃপ্রেক্ষিত:

এখানে কথকই নিরীক্ষক, কিন্তু সে কাহিনির অন্তর্গত কোনও ভূমিকা বা চরিত্র নয়। ফলে তার নিরীক্ষণে জেগে ওঠে বহিঃপ্রেক্ষিত।

ক. ''এমন সময় এদিকে মুখ করে প্যাসেজে ভাতের ফ্যান গালাতে বসল বুড়ো বয়। ফাঁপানো চুল— তারও চোখে কাজল। হাঁড়ি বেয়ে বেয়ে ফ্যান পড়ে ফাটা নর্দমা বুজে যাচ্ছে। উটকো হয়ে শব্দ করে বড় হাঁড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোলাতে লাগল লোকটা। হঠাৎ একসময় খারাপ চালের বিটকেল গন্ধ চারিয়ে গেল সারা ঘরে।''[১৫] (অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, পৃ. ২৪)

খ. ''কলকাতায় বাসে-ট্রামে ঠাসাঠাসি, ফালি ফালি ঘর, শীতকালে সন্ধে হতেই ময়লা ভর্তি চাপ চাপ ধোয়ার দলা অতিকায় বাদুড় হয়ে ট্রামের তারে ঝোলে। তখন চোখ জ্বলে, নিঃশ্বাস টানা যায় না। আত্মঘাতী হওয়ারও ভালো জায়গা নেই। পুরানো আলিপুর, এদিক সেদিক দু'চারজন বাপকেলে সম্পত্তি আগলাচ্ছে। রোজ সকালে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের জিনিসপত্রের আণ্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে গঙ্গাযাত্রা। এত লোক দিনের মধ্যে কতবার জলে সারে। ভাগ্যিস উপরটা রাস্তাঘাট দিয়ে মোড়া— দোকান পসার আলো দিয়ে সাজানো।'' (কুবেরের বিষয় আশয়, পৃ. ২৮৫)

গ. ''সেজো বিছানায় শুয়ে ছিল। দশমাস ধরে শুয়েই আছে। অসুখটা পার হওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। প্রথমে একদিন হঠাৎ হাত পা শক্ত হয়ে মুখ বন্ধ হয়ে গেল। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে দেখে ছেলেরা হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানে সুস্থ হয়ে উঠতে জানা গেল সন্ন্যাসে ধরেছিল। মনে রাখতে হবে এই ভদ্রমহিলার বাবা ব্লাডপ্রেসার, লোভ, ব্যাবসায় বুদ্ধি, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, উচ্চাশা এবং অতিরিক্ত কামে ভুগতেন। আর তিনি মরার বছর দশেক আগে থেকেই অর্শ আর ভগন্দরে বড় বেগ পান।'' (অনিলের পুতুল, পৃ. ১৯৩)

নিরীক্ষক : সুধা; অন্তঃপ্রেক্ষিত

''প্রমথ আগের মতো হও। আদর কর। অঞ্জুকে কী দরকার। অঞ্জু ভালভাবে জানেও না তুমি কেমন লোক। কাছে এসে হাঁপাবে। পালাবার জন্যে জলে ডুববে। প্রমথ আগের মতো হয়ে যাও। এভাবে চললে মরে যাবে। ভাগলপুর গিয়ে মোটা হয়ে আসব। আগের মতো হব। দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না। আমার চোখ সুন্দর না প্রমথ? দেখ।" (অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, পৃ. ৩৪)

নিরীক্ষক: প্রমথ; অন্তঃপ্রেক্ষিত

''কিন্তু গরুর ভুসি না হলেও সুধাকে ভাল লাগছে না। খারাপও লাগছে না। অপমান করা যায় না। ছেড়ে যাওয়া যায় না। সুধা বড় একা। আমি প্রমথ দত্ত, সুধাকে আগে ভালোবাসতাম। এখন কী করি জানি না। তবে জানি সুধার সঙ্গে আমার যোগ নেই। অবিনাশদা সেন্ট— পারসেন্ট কারেক্ট না হলেও প্রায় ঠিক। কৃতজ্ঞতার এ এক সং সাজানো প্রাণান্ত। সুধা তুমি চলে যাও— একথা মনে এলেও মুখে এল না।" (অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, পৃ. ৩৬)

নিরীক্ষক: কুবের; অন্তঃপ্রেক্ষিত

''সিগারেট, ধুলো, ধোঁয়া আরও কত কি এই শরীরটার ভেতর ভাঁজে ভাঁজে জমে যাচ্ছে। কুবেরের প্রায়ই ইচ্ছা হয় তার সারাটা শরীর যদি কোন সাইকেল সারানোর দোকানে আগাগোড়া খুলে ফেলে ডবল চেনে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দিতে পারত— তাহলে জয়েন্টে জয়েন্টে তেল ঢেলে ঘষে মেজে নিত। বলা তো যায় না, এত দিনের মেশিন— কোথায় কী হয়ে আছে। বাঁ হাত উল্টে আঙুলের কালো কালো দাগগুলো দেখল।" (কুবেরের বিষয় আশয়, পৃ. ৩০০)

নিরীক্ষক: বুলু; অন্তঃপ্রেক্ষিত

''বুলুর মন পড়েছিল এখানে। কিন্তু অন্য জায়গায় জট পাকানো একটা সুতো খুলে ফেলে দিয়ে তবে সুস্থির হয়ে বসা যায়। শাড়ি পাল্টে আজ তার নিজেকে দেখতে পেল না বুলু। ঘরের আয়নাগুলো ফলস্ লাগে তার। সিঁড়ির মুখে লম্বা আয়নায় নিজেকে পেয়ে গেল।" (কুবেরের বিষয় আশয়, পৃ. ২৬৮)

নিরীক্ষক : অনিল; অন্তঃপ্রেক্ষিত

''ডাক্তার হলে যে কী সুবিধে তা পুতুলের মাথায় কিছুতেই ঢুকবে না। প্রথম কথাই হল, কোনওদিন চাকরির জন্য ঘুরতে হবে না। তা ছাড়া বড় বড় অসুখ থেকে মাথা ধরা অব্দি যে কোনও অসুবিধেয় পড়লে কী করা দরকার তা নিজেই খানিকটা বুঝতে পারবে। রেডিওর বাল্‌ব্ আর

কম্পাউন্ডারের মিকশ্চারের দাম যা বলে তাই দিতে হয়। জানলে, হিসেব বুঝে দেওয়া যায়। সেরকম আর কি!" (অনিলের পুতুল, পৃ. ২৫৫)

নিরীক্ষক : নরেশ; অন্তঃপ্রেক্ষিত

"চেয়ারের চওড়া হাতায় রামায়ণখানা আছে। পড়বে বলে রোজ নামিয়ে বসে। এই বয়সে না কি ধর্মগ্রন্থ পড়তে হয়। মন তৈরি হয়। মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর— অন্য লোকে বাক্য কবে তুমি রবে নিরুত্তর। নরেশদের সময় তারা ফুলশয্যার দিন টিটকারি মেরে গানটা গাইত। এখনও সে ভাবটা পাল্টায়নি। সে দিন কবে তা তো জানা নেই। মনের মধ্যে নেমে পড়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েও দেখা যায় না। সেখানটা ধোঁয়া ধোঁয়া। ট্রেনের মতো শব্দ করেও আসে না। হঠাৎ একদিন আসবে। নরেশের মনে হল যার যখন আসে তখন সেও বোধহয় কিছু টের পায় না।" (অনিলের পুতুল, পৃ. ২০৪) —এভাবেই কাহিনিতলের বাইরের কথকের বহিঃপ্রেক্ষিত এবং কাহিনির অন্তর্গত ভূমিকা বা চরিত্রের অন্তঃপ্রেক্ষিতের অনবরত বিনিময় ঘটে। ফলে নির্মিত হয় ভূমিকানুগ কথনরীতি বা কথন পরিস্থিতি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাস ভূমিকানুগ কথনরীতি দ্বারা নির্মিত হলেও অন্যান্য কথনরীতির উপস্থাপনা আমরা দেখতে পাই। যেমন, 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই সর্বজ্ঞকথনরীতি। যেখানে নিরীক্ষকই কথক কিন্তু নিরীক্ষক কাহিনির অন্তর্গত ভূমিকা বা চরিত্র না হওয়ার জন্য কাহিনি-বর্ণনায় আগাগোড়া বহিঃপ্রেক্ষিত প্রাধান্য লাভ করে।

সর্বজ্ঞকথন, বহিঃপ্রেক্ষিত: শাহজাদা দারাশুকো

"আস্‌সালাতো খয়রুম মিনন্ নওম্—

শব্দ, সুর একই সঙ্গে ভোর রাতের বাতাস কেটে কেটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। এখন রাতের শেষ দিকে আর সেই শীত নেই। ফাল্গুন মাস শুরু হয় হয়। আজানের সুরের ভেতর শেরগির হাতিদের কেউ কেউ দিন শুরুর আগেই প্রথম গরম নাদ ফেলতে শুরু করেছে। তারই মৃদু চেনা শব্দ কাছেরই পিলখানা থেকে।" (প্রথম খণ্ড, পৃ. ০৯)

"কোথায় আজমির— কোথায় কাশী— আর কোথায়ই বা খুন্তাঘাট। যেখানে যত মানুষ— সেখানে তত কিস্‌সা। নদী, পাহাড়, জঙ্গল দিয়ে— কোনো জায়গা বা রাত দিয়ে এক মানুষের ঘটনার ঘনঘোর আরেক মানুষের ঘনঘটা থেকে আলাদা করে রাখা হয়। নইলে কারও যদি একই সঙ্গে সব দেখার ক্ষমতা থাকতো— তো সে বেবাক দেখে ফেলে থ হয়ে যেতো। আমরা ওভাবে

একসঙ্গে দেখতে পাই না। তাই আলাদা আলাদা করে কাজ ও কারণ সাজাই— আলাদা আলাদা করে পরিণাম ভাবি।" (প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫২)

''এইভাবেই আগ্রা চলছে। এইভাবেই হিন্দুস্থান চলছে। মরহুম মমতাজমহল মানুষের মুখে মুখে এখন তাজবিবি। উস্তাদ ইশার হাতে তৈরি সমাধিমহল যমুনার দক্ষিণ তীরে একটু একটু করে মাথা তুলছে। বিশ হাজার কারিগর দিনরাত ধরেই খেটেই চলেছে— কোনো থামা নেই। সমাধির নাম এখন লোকের মুখে তাজমহল।" (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫-৫৫৬)

এখানে নিরীক্ষক-কথক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিতে কাহিনি বর্ণনা করে যান— এক ঐতিহাসিক সময়কালের। সর্বজ্ঞতার ফলে তিনি কাহিনির যে কোনও ভূমিকা বা চরিত্রের ভাবনা দেখতে, জানতে পারেন ও দেখাতে, জানাতে পারেন। যেমন,

''...একটা কটু আনন্দে সফির মনটা ভরে উঠলো। এক একটা মনসবি যেন এক একটা বে-ইনসানি কারবার। অন্যায় আর অত্যাচারের কাল। সে নিজে এই চাকার কাঠি হয়ে পড়েছে এই আট বছরে। এক একসময় মনে হয়— সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাবে হেলমন্দের তীরে তাদের গাঁয়ের বসত বাড়িতে। হালে উট জুতে সারা জমিন উল্টে পাল্টে দেবে বসন্তের গোড়ায়।" (প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪)

''ভাই আসফ খাঁয়ের একথায় নূরজাহান বেগমের ডান চোখ কেঁপে উঠলো। তিনি মনে মনে বললেন, খানজাহান লোদি তোমার পোষা চর ভাইসাহেব! তিনি আসলে তোমার হয়ে শাহজাদা পরভেজকে নজরবন্দী করে রাখবেন! আমিও তাই চাই ভাই সাহেব।..." (প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৩)

এই সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতি আমরা লেখকের 'আলো নেই' (দুটি খণ্ড) উপন্যাসেও দেখতে পাই। এই উপন্যাসেও লেখক এক বিশেষ ঐতিহাসিক কালপর্বকে বর্ণনা করেছেন। কোনও বিশেষ সময়ের কথা যখন বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করতে হবে তখন লেখক নিজেকে সর্বজ্ঞ কথক হিসাবে উপস্থাপিত করেন। তবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সর্বজ্ঞকথনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি বঙ্কিমীয় সামগ্রিক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেননি। সীমিত সর্বজ্ঞ নিরীক্ষণ, কাহিনিতলের অন্তর্গত ভূমিকা বা চরিত্রের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত করা ও চরিত্রদের আখ্যানে নিজের ঘটনাবলী, ভাবনা কিংবা অন্য চরিত্রের কার্যাবলী বর্ণনা করার ক্ষেত্রে লেখক অধিক স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়াও সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে, যেমন— 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'স্বর্গের আগের স্টেশন', 'চন্দনেশ্বর জংশন','অদ্য শেষ রজনী', 'পরীর সঙ্গে প্রেম' উপন্যাসে সর্বজ্ঞকথনরীতি ব্যবহার

করেছেন লেখক। 'পরীর সঙ্গে প্রেম' উপন্যাসে লেখক বঙ্কিমী কায়দায় পাঠককে সম্বোধন করে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন বারবার। যেমন—

''পাঠক আমায় ক্ষমা করুন। এরকম পুরানো কায়দাতেই ওদের দেখা হয়েছিল। তা প্রায় সাত বছর বাদে। এটা বানিয়ে লিখব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখছি— যা ঘটেছিল, হুবহু তা-ই লেখায় চলে আসছে। আমি আটকাতে পারছি না কিছুতেই। তবে গ্যারান্টি দিচ্ছি, এ কোনো বাল্যপ্রেমের কাহিনি নয়। নির্জলা ঘটনা। আমি ফাঁকে ফোকোরে দর্শন গুঁজে দেওয়ার কোনো চেষ্টা করব না— একথা হলফ করে বলছি।'' (পরীর সঙ্গে প্রেম, পৃ. ২২৩)

''পাঠক, বাকিটা আমি সর্বাংশে সুনীলের মতো লিখবার প্রাণপণ চেষ্টা করব। আমি ওঁর অন্তত কুড়িখানা বই এবং অন্তত দশটি গল্প ছাত্রের মতোই মন দিয়ে পড়েছি। (পরীর সঙ্গে প্রেম, পৃ. ২২৩)

'সতী অসতী' উপন্যাসেও লেখক পাঠককে সম্বোধন করে কাহিনি উপস্থাপন করেছেন। উপরিউক্ত দুই রীতি ছাড়াও আমরা লেখককে আত্মকথনরীতি ব্যবহার করতে দেখি কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে। আখ্যানের কথক সর্বদা উত্তম পুরুষ হয়। কথক নিরীক্ষক হতেও পারে বা নাও হতে পারে— তার অবস্থান কাহিনিতলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে আবার বাইরেরও হতে পারে। এই নিরীক্ষণ ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কথনরীতির উদ্ভব ঘটে। সাধারণত আত্মকথন রীতিতে কোনও একজন কথকের মাধ্যমে সমগ্র আখ্যান বর্ণনা করা এবং অবশ্যই সে কাহিনিতলের অন্তর্গত কোনও মুখ্য বা গৌণ চরিত্র বা ভূমিকা হবে। নয়তো দুই বা তার অধিক কথকের মাধ্যমে ক্রমপর্যায়ে সমগ্র আখ্যান বর্ণনা করা হয় কিংবা গৌণ চরিত্র বা ভূমিকার কথনে অন্য চরিত্রের আত্মকথন ব্যবহার করে আখ্যান বর্ণনা করা হয়। আত্মকথন পরিস্থিতির একক ও যৌগিক উভয় প্রকার বিভাগ আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাসম্ভারে দেখতে পাই। আত্মকথনরীতি দেখা যায়, 'পরস্ত্রী', 'ফিরোজা', 'সিদ্ধকামিনী', 'সুধাময়ীর দিনলিপি' উপন্যাসগুলোতে। এছাড়া মিশ্রকথনরীতি দেখা যায়, 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে আমরা আত্মকথন, ভূমিকানুগ কথন ও সর্বজ্ঞকথন— এই তিন রীতির মিশ্রণ দেখতে পাই। তাই এটি মিশ্রকথনরীতির একটি উদাহরণ। লেখকের আত্মকথনরীতির উপন্যাসগুলোতে মুখ্যচরিত্রই কথকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তবে সর্বদা কথক নিজের নিরীক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের নিরীক্ষণ ব্যবহার করেছে। ফলে আত্মকথন রীতিতে কথকের নিরীক্ষণের যে সীমাবদ্ধতা থাকে— তা ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা দূরীভূত হয়েছে। 'পরস্ত্রী' উপন্যাসে আত্মকথনরীতির কিছু বৈচিত্র্য তুলে ধরা হলো। জগদীশ রায়ের আত্মকথনে

লেখক তার ভাবনা বিবৃত করছে— ''চল্লিশের কাছাকাছি জগদীশ রায় এভাবে ভাবে। সে আরও অনেক কিছু ভাবে। গরুর গলকম্বলে সামান্য মারবেলের মালা কি সুন্দর শোভা পায়। অথচ দেবীর গলায় ছোট্ট ঘণ্টা বেঁধে দিয়ে যাকে বলে গোধূলি নাগাদ যদি ওকে নীলাম্বরী পরিয়ে যে কোনও মাঠ দিয়ে হাঁটিয়ে আনা যায়, তাহলে সেই সব ভাব কি মনে উদয় হবে— যেমন, বাৎসল্য, বনদেবীকা, দীঘির গায়ে ঝাঁকড়া আশফল গাছের ছায়া।'' (পরস্ত্রী, পৃ. ৯৬)

আবার 'ফিরোজা' উপন্যাসে একক কথকের নিরীক্ষণ ও কথন ব্যতিরেকে অন্য এক চরিত্রের (হাসান আজিজুল হক) নিরীক্ষণ ও কথন ব্যবহার করা এভাবে—

''দর্শনের অধ্যাপক— অরিজিন্যাল বর্ধমানের লোক, এই হাসান আজিজুল হক মানুষটি যেমন পণ্ডিত— তেমনি সুরসিক। ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার এমনি হাসতে হাসতে বলছিলেন।'' (ফিরোজা, পৃ. ১৯০)

অনুরূপভাবে 'সিদ্ধকামিনী' উপন্যাসে কথক পার্থসারথী দত্তগুপ্ত খোকন চরিত্রের নিরীক্ষণ ও কথন ব্যবহার করেছেন। আসলে আত্মকথনরীতিতে আখ্যান বিবৃত করলে মাঝে মাঝে একঘেয়ামি বর্ণন হওয়ার যে সম্ভাবনা থাকে— তা দূরীভূত করার জন্যই লেখক আত্মকথনরীতিতে এই ধরনের বিভিন্ন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তিন প্রকার কথনরীতিতেই যে লেখক সিদ্ধহস্ত, তা উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত। উত্তম পুরুষের মধ্যে কখনও কখনও লেখকের অনুপ্রবেশ বা কথক 'আমি' ও লেখক 'আমি' এক হয়ে গেছে এবং তার মধ্য দিয়ে লেখক-স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। উত্তম পুরুষ থেকে প্রথম পুরুষের যাতায়াত পথ করেছেন মসৃণ। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কাহিনি বর্ণনায় উত্তম পুরুষের বর্ণনা-কৌশলে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন বলেই কোনও উপন্যাসেরই কাহিনি পাঠ আমাদের কাছে বিরক্তিকর, শ্লথ, বন্ধুর, আস্বাচ্ছদ্যকর মনে হয় না।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনি উপস্থাপনের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, প্রায় কোনোরূপ ভূমিকা বা আবহ তৈরি না করেই লেখক সরাসরি মূল কাহিনিতে প্রবেশ করেন। কাহিনির প্রধান চরিত্রের ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লেখকের কাহিনি বর্ণন শুরু হয়ে যায়। যেমন—

ক. ''বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে সিনেমা হলে এসে উঠল প্রমথ।'' ('অর্জুনের অজ্ঞাতবাস'/সূচনাবাক্য)

খ. ''বাঁ হাতখানা মেলে ধরলো কুবের।'' ('কুবেরের বিষয় আশয়'/সূচনা বাক্য)

গ. ''হাওড়া ব্রিজের মুখে এসে জ্যাম। চন্দ্রকান্ত আর পরশুরাম বাস থেকে নেমেই দৌড়তে লাগল।'' ('স্বর্গে তিন পাপী'/সূচনাকালীন প্রথম দুই বাক্য)

ঘ. ''রবিবার ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। জানলা দিয়ে চেনা আমগাছটাকে দেখল দেবুবাবু।'' ('হিম পড়ে গেল'/সূচনাকালীন প্রথম দুই বাক্য)

ঙ. ''প্রথম তিন সিন অমিয় দর্শকদের দিকে তাকাতে সময় পায়নি।'' (অদ্য শেষ রজনী/ সূচনা বাক্য)

চ. ''ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন বাজারের মুখে অক্রুরবাবুর সঙ্গে দেখা হল অনাথের।'' ('ঈশ্বরীতলার রূপোকথা'/সূচনাবাক্য)

ছ. ''ডাক্তারবাবুর কাছাকাছি যখন পৌঁছাল ভক্তি— তখন চেম্বারের ওয়ালক্লকে বেলা সাড়ে এগারোটা।'' ('আবিষ্কার'/সূচনাবাক্য)

জ. ''বৃষ্টি নামার মুখে শেখর মিনিবাস পেয়ে গেল।'' ('পরীর সঙ্গে প্রেম'/সূচনা বাক্য)

ঝ. ''রাধা বলল, ওভাবে আমায় ধরো না।'' ('একদা ঘাতক'/সূচনাবাক্য)

ঞ. ''কাকের ডাকে ঘুম ভাঙল সুশান্তর।'' ('শেষ বিকেলের আলো'/সূচনা বাক্য)

ট. ''আপনার স্ত্রী আপনার বন্ধু নন।'' ('বাম অলিন্দ'/সূচনা বাক্য)

ঠ. ''কেমন আছ?'' ('অদৃশ্য ভূমিকম্প'/সূচনা বাক্য)

ড. ''ওজন যন্ত্রে ওঠার আগে প্রণবেশ দস্তিদার পায়ের পাম্পসু খুলে নিল।'' (কঠিন সময়/ সূচনা বাক্য)

এছাড়াও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে কাহিনি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বাক্য ধ্রুবপদের মত ব্যবহার করেন। এটা লেখকের নিজস্ব স্টাইল বলা যেতে পারে। যেমন—

ক. ''আমার চোখে একরকমের মহিষের কাজল আছে। খুব অন্ধকার সেই কাজল। আঁসটে গন্ধ সে কাজলে— আমার চোখ লাল হয়— আমি যা দেখি তা লালচে। দেখেই ফুলে উঠি।''

('অর্জুনের অজ্ঞাতবাস'/পৃ. ৫৪)

খ. ''মনে রাখতে হবে এই ভদ্রমহিলার বাবা ব্লাডপ্রেসার, লোভ, ব্যাবসায় বুদ্ধি, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, উচ্চাশা এবং অতিরিক্ত কামে ভুগতেন। আর তিনি মরার বছর দশেক আগে থেকেই অর্শ আর ভগন্দরে বড় বেগ পান।'' (অনিলের পুতুল/পৃ. ১৯৩)

গ. ''একটা স্যাড ঘটনায়— এক্সপিরিয়েন্স বলতে পার—'' ('কুবেরের বিষয় আশয়'/পৃ. ৪০৫)

গ. ভাষা বিন্যাস:

উপন্যাস তথা যে কোনও কথাশিল্পের ক্ষেত্রেই ভাষাবিন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ ভাষার মাধ্যমেই কাহিনি বিবৃত হয়। আর প্রতিটি প্রথম শ্রেণির লেখকের ভাষাচর্চার মাধ্যমে নিজস্ব একটি ভাষাশৈলী তৈরি হয়। যে ভাষাশৈলী লিখন- শৈলীর অন্তর্গত এবং যেখানে লেখকের ব্যক্তিত্ব ও শব্দ নির্বাচনের মাধ্যমে ভাষা নির্মাণের কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়। তাই ভাব প্রকাশের উপায় বা কৌশল হিসাবে ভাষাবিন্যাসরীতি গুরুত্ব সহকারে আলোচনাযোগ্য। কাহিনরি গতি, পরিবেশ-প্রতিবেশ, বিভিন্ন ধরনের সংলাপ, চরিত্রচিত্রণ, প্রতীক-চিত্রকল্প-কল্পচিত্র, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, বক্তব্য প্রকাশ, না-বলা কথা, বিষয় অনুযায়ী ভাষাশৈলী ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা কোনও লেখকের ভাষাবিন্যাসরীতি বিশ্লেষণ করতে পারি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং নিজের ভাষাবিন্যাসরীতি প্রসঙ্গে বলেছেন, ''লেখার উদ্দেশ্যে একটিই। তা হল উন্মোচন। অনুসন্ধানের পথে পথে এই উন্মোচন। বিনা মন্তব্যে সরল বাক্য সাজিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমার পদ্ধতি। আমি বলতে চাই সবচেয়ে কম। আর চাই— আমার না— বলাটুকু পাঠকের মনে ক্রমিক পুনঃসৃষ্টি হতে থাকুক। সে-ই পথ খুঁজে পাক। তাই সাধারণত আমার কোন রচনাতেই জটিল বাক্য থাকে না। কেউ বলেন— বড় কাটা-কাটা লাগে। আমি এটা ইচ্ছে করেই করি! কেননা এটাই আমার পদ্ধতি। সেই পদ্ধতিতে আমি টেবিল, চেয়ারের মতোই অনায়াসে উপযুক্ত ইংরাজি কথা ব্যবহার করি। কারণ জানি এই কথাগুলি আমরা অন্য সময়ে বাংলার মতোই আমাদের বাক্যে ব্যবহার করে থাকি। নজর রাখি একটা হেভি শব্দের বদলে যেন আটপৌরে শব্দ খুঁজে পাই।''[১৫] লেখকের এই ধরনের মানসপ্রবণতা অনুসারে লেখকবিশেষে ভাষাবিন্যাসরীতি বদলে যায়। আর কথাশিল্পে ব্যাকরণশুদ্ধ প্রচলিত ভাষা ব্যবহার অপেক্ষাকৃত দুর্বল কল্পনা ও প্রতিভার পরিচয় বহন করে। কারণ সৃজনশীল ও মননশীল লেখকেরা ভাষাকে নিজেদের মতো নির্মাণ ও ব্যবহার করেন। যার ফলে কোনো লেখকের নাম অজ্ঞাত রেখে তার কোনও রচনা কোনও সহৃদয়হৃদয়সংবাদী পাঠক পাঠ করলেই বুঝতে পারে, এটা কোন্ লেখকের রচনা। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সেই জাতের ভাষাশিল্পী, সেই জাতের লেখক। যিনি নিজস্ব ভাষাশৈলী নির্মাণে সফল হয়েছেন 'অনায়াস ভঙ্গীতে'। আমরা নির্বাচিত কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস অবলম্বনে লেখকের ভাষাবিন্যাসরীতি আলোচনা করব।

'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে প্রথম-সুধার সম্পর্কের আবহাওয়া বোঝানোর জন্য লেখক প্রমথ-সুধার প্রথম সাক্ষাতে (উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে) ইঙ্গিতবাহী বাক্যের ব্যবহার, (কাহিনির

সূচনালগ্নে) ''হঠাৎ এক সময় খারাপ চালের বিটকেল গন্ধ চারিয়ে গেল সারাঘরে।'' (পৃ. ২৮) এই 'খারাপ চালের বিটকেল গন্ধ'ই বেঁচে ছিল প্রমথ-সুধার ভালোবাসার সম্পর্কে। অবিনাশদার বর্তমান অবস্থা বোঝানোর জন্য দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত জিনিসের উপমা দিয়ে বর্ণনা, ''স্তাবকতার রসে মজে অবিনাশদা এখন রসস্থ লেবু— মানে পচা লেবু।'' (পৃ. ৮২)

চিত্রকল্প :

ক. ''গাড়িটা চোখ বুজে আরামে তেল খাচ্ছে— সৎ হচ্ছে।'' (কুবেরের বিষয় আশয়, পৃ. ১২২)

খ. ''বিকেলটাকে খেয়ে ফেলে সন্ধে একদম ঝুলবারান্দায় উঠে এল।'' (পরবর্তী আকর্ষণ, পৃ. ৩৬৮)

গ. ''ভয়ংকর শীতে চাঁদ পর্যন্ত খানিক মেঘ চাপালো গায়ে।'' (হাওয়াগাড়ি , ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯)

ঘ. ''চাঁদের আউটলাইনটা ছিল আকাশে। ভেতরের হলুদ মুছে গেছে। কেননা সূর্য সমুদ্রের এক জায়গা থেকে উঠবে বলে তৈরি হচ্ছিল। খোরধার পাহাড়ও কোণে দক্ষিণের আকাশ জুড়ে জেগে উঠল।'' (স্বর্গে তিন পাপী, পৃ. ২৭০)

ঙ. ''সামনের পাহাড়ে খানিকটা জায়গা চোকলা উঠে গিয়ে লাল দগদগে একটা চেহেরা রোদে বেরিয়ে আছে।'' (পরীর সঙ্গে প্রেম, পৃ. ২৬০)

ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ:

ক. ''দেখুন ছোটবেলায় খুব একটা ট্র্যাজিক', একটু থামতেই হলো কুবেরকে, এত ভিড়ে কিছু বলা যায় না, 'স্যাড্ এক্সপিরিয়েন্স ঘটনা বলতে পারেন—'' (কুবেরের বিষয় আশয়, পৃ. ২৮৩)

খ. ''তার ভেতরেই নতুন জুতো থেকে বেদিং সোপ—রুম হিটার থেকে ফ্রিজিডিয়ার— যে কোনো কনজিউমার গুডস সারা ইণ্ডিয়া জুড়ে ক্যাম্পেন করে দিব্যি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। এর নাম ভাইটালিটি। সঠিক ছবির সঙ্গে সঠিক স্লোগান।'' (অদৃশ্য ভূমিকম্প, পৃ. ৫২০)

গ. ''আমি আবার ভবার বাচ্চাদের এডুকেশনে মন দিচ্ছিলাম! ভবাকে করতে গেলাম কম্বাইণ্ড হ্যান্ড।'' (বাম অলিন্দ, পৃ. ৫১১)

কুবেরের বিষয় আশায়: আটপৌরে শব্দ প্রয়োগ:

ক. 'বলরাম, ভুবন ওরা বড় ভোগা দিচ্ছে।'' (পৃ. ২৮৬)

খ. ''কবে! কিন্তু, মাইরি বউটাই আঁটকুড়ো—'' (পৃ. ৩১৩)

গ. ''ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা দুই সারি তালগাছের ফাঁকে আকাশের সরু মত গলিটা ধরে চাঁদ একেবারে কদমপুরের মাথার ওপর নেমে এসেছে—'' (পৃ. ৩২২)

ঘ. ''গণেশ কারও চুংলি চাপটি করে না।'' (পৃ. ৪০৯)

আটপৌরে শব্দ প্রয়োগ: অন্যান্য উপন্যাসে:

খ. 'ভাতার' (স্বর্গের আগের স্টেশন), 'প্যালা' (যতীন দারোগার বেদান্ত), 'টরটরি' (মহাজীবন), 'আকচা-আকচি' (সিদ্ধকামিনী), 'আশানাই' (কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল), 'ধামসায়' (গত জন্মের রাস্তায়), 'সিড়িঙ্গে' (বড় হওয়ার আগে)।

কুবেরের বিষয় আশায়: মিথ-পুরাণ প্রসঙ্গের ব্যবহার:

ক. ''লক্ষ্মী চঞ্চলা! বাবা যত্ন নেননি। আটবারের বার লক্ষ্মী আর এলেন না।'' (পৃ. ৩৩৪)

খ. ''শেষে যেদিন টান পড়ল— অগস্ত্য চুমুকে সমুদ্র শেষ।'' (পৃ. ৩৫৩-৫৪)

মিথ-পুরাণ প্রসঙ্গের ব্যবহার: অন্যান্য উপন্যাসে:

ক. ''এক এক সময় মেঘ মহাভারতের কৌরব সেনা হয়ে আসে। আবার রামায়ণের গল্পের চেহেরাও নেয়।'' (ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, পৃ. ৭৯)

খ. ''মনে হবে নোয়ার জাহাজের কলঘরে বেলচায় করে কয়লা দেওয়া আরম্ভ করেছিলাম, যেন এখনও দিচ্ছি— শেষ হবে না। কোনো দিন শেষ হবে না।'' (অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, পৃ. ৮৩)

গ. ''তিনি বলেন, এখন তো যজ্ঞ মানে একটা প্রাণহীন ব্যাপার। কিন্তু যজুর্বেদের আমলে ব্যাপারটা ছিল সবাই নিয়ে আনন্দের। এখন যেমন পুজো-পার্বণ— সেইরকম তখন ছিল যজ্ঞ। যজুর কালে কয়েকদিন ধরে গ্রাম-গ্রামান্তরের বাসিন্দাদের ঢালাও খাওয়া দাওয়া-পানভোজনের নামই ছিল যজ্ঞ।'' (কামিনীকাঞ্চন, পৃ. ১৬৫)

কুবেরের বিষয় আশয়: প্রতীক:

''তখন হলদের বদলে নীলচে মাখন মাখানো চাঁদ দেখে খুব মুশকিলে পড়েছিল আভা।'' (পৃ. ৪৮৮)

''মইয়ের প্রায় শেষ কাঠিতে পা রেখে কুবের চাঁদ পেয়ে গেল।'' (পৃ. ৪৯৮)

এছাড়া 'সাপ' (কদমপুরের সাপ ও মেদনমল্ল দ্বীপের সাপ) প্রতীক হিসাবে উপন্যাসে উঠে এসেছে।

প্রতীক: অন্যান্য উপন্যাসে:

মহিষ, মহিষের আঁসটে গন্ধযুক্ত কাজল (অর্জুনের অজ্ঞাতবাস), ময়ূর (অনিলের পুতুল), বুনো পরগাছা ফুল (সতী অসতী), হরিণ শিশু (হাওয়াগাড়ি)।

সাহিত্য প্রকরণ অনুসারে যাকে আমরা 'আঞ্চলিক উপন্যাস' বলি— সেই অর্থে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও আঞ্চলিক উপন্যাস লেখেননি। তবে আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে লেখকের বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় লাভ করতে পারি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস থেকে। আসলে লেখক বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে শুধু মেশেননি, ভাষা-সংস্কৃতিসহ গোটা মানুষকে ঔপন্যাসিক-বীক্ষায় বীক্ষণ করেছেন। তাই চরিত্রের সংলাপ রচনায় কৃত্রিমতা বর্জিত স্বতঃস্ফূর্ত আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করতে পেরেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হলো—

ক. ''বাড়ি ঢুকতেই বজরা চেঁচিয়ে উঠল, মরা কুকুর জ্যাতা করার ভার নিতি গেলি কেন?'' (স্বর্গের আগের স্টেশন, পৃ. ২৬)

খ. ''সাইঝে বাবুরে ডাকেন না কেন একবার। এই তো আমার ধর্মপত্নী—সনকা নস্কর। ঈশাদি সাক্ষীর টিপছাপ সনকা দেবেনে।'' (চন্দনেশ্বর জংশন, পৃ. ২০৮)

গ. ''নেহি বাবুজি। মেরি ভালাই মেরি হাতপে ছোড়িয়ে। ম্যায় ইহা নেহি রহেগি। এ মেরি জগ্‌হা নেহি। চলে চলো— কোই জবরদস্তি মেরি বিলকুল বে-পসন্দ।'' (মহাজীবন, পৃ. ১৩৭)

ঘ. ''তারপর ভানুকে দেখে এগিয়ে আসে, আরে! তুঝে তো ভানুয়া যয়সন লাগতা— আরে ভানুয়াই হো! কা বটে— '' (যতীন দারোগার বেদান্ত, পৃ. ৯২)

জটিল বাক্য ব্যবহার না করে কাটা-কাটা বাক্যে রিপোর্ট করার ভঙ্গিতে বর্ণনা:

ক. ''রোজ একটু একটু করে গ্রাম মুছে যাচ্ছে। ইলেট্রিক ট্রেনে হাওড়া সওয়া ঘন্টা। টেলিফোনে পলকে কলকাতা। টিভি-তে রাজ্জাক, শাহরুখ খান, ঋতুপর্ণা। রান্না এড়াতে ভাতের হোটেলে এক টাকা দামের ডালডায় ভাজা মোটা পরোটার নাস্তা। চোখের সামনে নদী দিয়ে রাজার মতো জাহাজ যায় আসে। বাঙলা খবরে বিনলাদেন, ক্লিন্টন, বাজপাই। সবাই সব জানে। অথচ এসব জায়গা না-শহর-না গ্রাম। এখন দোআসলা জগতে কিছুই সিওর নয়। খুন হয়। রেপ হয়। ভালোবাসা হয়। লোভ হয়। দুঃখ হয়। আনন্দ হয়।'' (গঙ্গা একটি নদীর নাম, পৃ. ১২)

খ. ''বিরাট তেতলা বাড়ি। একেবারে মির্জাপুর স্ট্রিটের ওপর। লম্বাটে। একটু এগোলেই শিয়ালদা। বাড়িটার আশেপাশে কাটা কাগজ, বাঁধাইয়ের দোকান। বাড়িটার গায়ে দোকান। বাড়িটার

গায়ে দোতলায় বড় একটা সাইনবোর্ড। টিনের। তার সাদা জমির ওপর বাংলা হরফে লেখা প্যারাডাইস লজ। তার নীচে লেখা ৪১ নং মির্জাপুর স্ট্রিট।" (আলো নেই, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩)

গ. ''গোকুল দত্ত। বয়স সাতান্ন। দাবি করেন একান্ন। দশাসই শরীর। সেলফ-মেড মানুষ। কলকাতার বুকে তিনটি মোষের খাটাল আছে। দুটি স্ত্রী। একটি অফিসিয়াল। অন্যটি বেআইনী। কিন্তু পুরোপুরি বউয়ের মর্যাদা তিনি তাকে দিয়েছেন। গোকুল দিলদার লোক।" (হাওয়াগাড়ি, পৃ. ২৬)

ঘ. ''প্রধানমন্ত্রী খানিকক্ষণ দেখবেন বলে এসেছিলেন। কাজের চাপ। কিন্তু উঠতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বসে দেখলেন। অভিনয়ের পর সুবীর আর রজনী ওঁর সামনে এসে দাঁড়াল। রজনী একটু ঝুঁকে নমস্কার করল। সুবীরও তাই। প্রধানমন্ত্রী হাসলেন। হাসিমুখে রজনীর হাত একটু ধরলেন। কী যেন বললেন। অমিয় প্রায় ছ'টা রো পেছন থেকে তার কিছুই শুনতে পেল না।" (অদ্য শেষ রজনী, পৃ. ১৮৭)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করেছেন চরিত্র অনুযায়ী। নীচে দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো—

ক. নগর কলকাতার রকবাজ ছেলেদের বাক্যে সাংকেতিক শব্দ প্রয়োগ: ক্যালি (যোগ্যতা অর্থে), ঘ্যাম্ (যে টুকতে গিয়ে ধরা পড়ে), পুরু (যার আর কিছু হবে না), বং (যাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয় না), ড্রেন ফেটে যাওয়া (ভাগ্য খারাপ হওয়া), কাই (কিপ্‌টে), ব্যাংচাপটা (থেতলে যাওয়া), মহা হরফন পার্টি (অতিচালাক লোক), গজ (তৎকালীন সময়ে গজ আঁকা একশো টাকার নোট) টাল্টু (ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে যে), ['অদ্য শেষ রজনী' উপন্যাসে সন্তু ব্যবহৃত শব্দ] খোমা (মুখের চেহেরা) ['হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসে টাপু ব্যবহৃত শব্দ]।

খ. সমাজবিরোধী মস্তানদের বাক্যে সাংকেতিক শব্দ প্রয়োগ: মামলেট (মিথ্যে কথা), টোস্ট (ন্যাকামি), প্যালা (ঘুষ বা বখশিস)। ('যতীন দারোগার বেদান্ত' উপন্যাসে ভানু ব্যবহৃতশব্দ)।

গ. তন্ত্রসাধানায় ব্যবহৃত শব্দ: i. আমার ঝোলা থেকে খানিকটা খ-পুষ্প খেয়ে নে। তারপর তোর কপালে আমি ব-পুষ্পের তেলক টেনে দিচ্ছি। (স্বর্গের আগের স্টেশন, পৃ. ৩৮)

ii. ''বাবা সাধারণ শ্মশানকেই এখন ক্ষ্যাপানাথতলা, সর্বনাশী ঘাট, বগলাবাহী গঙ্গা, পঞ্চমুণ্ডির মোড়— নিজের মনের ছবির মত করে খনিকক্ষণের জন্যে বানিয়ে নিতেন।" (সিদ্ধকামিনী, পৃ. ২৮)

অলঙ্কারের ব্যবহার:

ক. ''চোখে যেটুকু ঘুম ছিল ফলের খোসা তোলার মতো তা একদম উঠে গেল।'' (অনিলের পুতুল, পৃ. ২২৩)

খ. ''অনিল ফ্যাকাসে ভেড়ার মতো মুখ তুলল।'' (অনিলের পুতুল, পৃ. ২৪৮)

গ. ''আসলে নীলকান্ত এই সেফটিন গাঁথা নিশ্চিত জীবনটুকু ষোলো আনাই চেটে চুষে খেতে চায়।'' (সরমা ও নীলকান্ত, পৃ. ১২)

ঘ. ''এখন এই মুহূর্তে সে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো ভালোবাসা ট্রান্সফার করতে পারে।'' (সরমা ও নীলকান্ত, পৃ. ৪৫)

ঙ. ''শেষ রাতের হেলে-পড়া চাঁদখানা বাওড়ের জলে একখানা কাঁসার থালা হয়ে ভাসছিলো।'' (ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, পৃ. ৫৫)

চ. ''আমসত্ত্বের স্লাবের মতো জমানো দুঃখ এখনো পিস হিসাবে বাজারে বেরোয়নি।'' (পরীর সঙ্গে প্রেম, পৃ. ২৫৫)

ছ. ''আসলে ওর কাছে নাকি এই পৃথিবীটাই বাসি আটার রুটি।'' (স্বর্গের আগের স্টেশন, পৃ. ৬৬)

জ. ''পুরুষের সোহাগ! সে তো জোনাকির আলো।'' (চন্দনের জংশন, পৃ. ১৬৪)

ঝ. ''সাবানের ফেনার মত দলা দলা কুয়াশা ঝুলে পড়েছে রাস্তার ওপর। (মহাজীবন, পৃ. ১০)

ঞ. ''তার মাথার খোঁপা খুলে গিয়ে পেছন দিকে কালো বন্যা হয়ে উড়তে লাগল।'' (এক সিংহ ও তার রমণী, পৃ. ৯৫)

ট. ''এখন বয়সটাই কেন্নোর মত লেগে আছে।'' (তারসানাই, পৃ. ৯)

প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার:

ক. ''নগেন্দ্রর অবস্থা বলতে গিয়ে সেজো বলত, 'নগেন্দ্রবাবুর যখন বিয়ে হয় তখন তিনি ক্লাস টেনে পড়েন। চালে হাগলে পাতে পড়ে।'' (অনিলের পুতুল, পৃ. ২১১)

খ. ''পুরুষলোক আমি জানি। অত ধোয়া তুলসিপাতা নয়।'' (স্বর্গের আগের স্টেশন, পৃ. ৮৯)

গ. ''আমি ঘরপোড়া গরু। আমি সিঁদুর দেখলেই চমকে উঠি।'' (কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল,

পৃ. ১০৫)

ঘ. ''সবদিকেই বড় তুমি সাধনা। বড়র ভালবাসা তাই বালির বাঁধ।'' (কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল, পৃ. ১৩০)

বর্ণনা (মানুষ ও মেশিনের একীভবন) :

ক. ''মেশিনটা খুব ভালো। ঘুমন্ত অবস্থাতেও কত জোরে তাকে জড়িয়ে আছে। ভেতরের কলকব্জায় ক্লান্ত পিস্টনগুলো ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে বুকের ভেতর থেকে নিঃশ্বাস পাঠাচ্ছিল বাইরে। বহুকাল পরে অমিয়কে এ অবস্থায় পেয়ে লীলা তাকে রাখবার জায়গা পাচ্ছিল না।'' (অদ্য শেষ রজনী, পৃ. ২২৬)

খ. ''কুবেরের প্রায়ই ইচ্ছা হয় তার সারাটা শরীর যদি কোন সাইকেল সারানোর দোকানে আগাগোড়া খুলে ফেলে ডবল চেনে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দিতে পারত— তাহলে জয়েন্টে জয়েন্টে তেল ঢেলে ঘষে মেজে নিত। বলা তো যায় না, এত দিনের মেশিন— কোথায় কী হয়ে আছে।'' (কুবেরের বিষয় আশয়, পৃ. ৩০০)

গ. ''কিন্তু ইচ্ অ্যাণ্ড এভরি বাতিল মোটরকারের ইঞ্জিনের জন্য আমার দুঃখ হয়। আহা! ওরা আরও অনেক দিন কাজ করতে পারত। কিন্তু বডি ব্যাটারি— বিট্রে করেছে। তাই এ অবস্থা। স্ক্র্যাপ হয়ে মল্লিকবাজারে চলে যাবে। আহা রে!'' (হাওয়াগাড়ি, পৃ. ১০০)

স্বগতোক্তি:

''দিলীপের মনের ভেতর এখন একই সঙ্গে পর পর তিনটে সেন্টেন্স একদম ডায়ালগের স্টাইলে পর পর লাইন দিয়ে দাঁড়ালো।

তুই ঋষি এ-র‍্যাকেটের ভেতর কি করে আছিস?

আমাকে বাদ দিয়ে তোর অন্য লোকের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে?

আমাকে দেখে কোলইণ্ডিয়ার জন্যে তোর ভেতর কোন ধিক্কার ওঠে না?

কিন্তু কোনোটাই বলা যায় না। পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কথাগুলো বলতেই মানুষের গলা বুঁজে আসে। কথা চোক করে।'' (হাওয়াগাড়ি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০২)

বিশেষ ভঙ্গিতে বাক্যগঠন:

''যেদিন মাঝরাতে জেগে উঠেছে বীরেন— সেদিনই এই খুট খাট। কিংবা এই খুটখাট তাকে জাগিয়ে। একদিন তো বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগায়। দাঁত বসাচ্ছিল। জেগে গিয়ে বীরেন

কোন ডিসটার্ব করেনি। চুপ করে অপেক্ষা। বেড সুইচ টিপে সে আস্তে রাধাকে। ওঠো। বোধ হয় সাপে—।" (এক গেরস্থের তিন সংশয়, পৃ. ৯১)

বাক্যে 'য়'-এর লোপ: ''মাদের সব বোনেরই অসাধারণ চেষ্টা— বড় হতেই হবে।" (অনিলের পুতুল, পৃ. ২১০)

বর্ণনা (গঙ্গা তীরবর্তী পরিপার্শ্ব) :

''গঙ্গার জন্যেই কলকাতার রাজধানীতে প্রোমোশন। গঙ্গার জন্যেই পাটকল। চাঁদ মহম্মদ মল্লিকের মতো লোকজনের মডার্ণ হোসিয়ারি ফ্যাক্টরি। কলকাতাকে ঘিরে— গঙ্গাকে ছুঁয়ে— বা তার সাঙ্গোপাঙ্গো খুচরো নদীগুলোর বুক ব্রিজ দিয়ে টপকে রেল লাইন— স্টেশন, বাজার, মানুষজন, মামলা, আদালত। কলকাতাকে ঘিরে—গঙ্গাকে কোনো না কোনোভাবে ছুঁয়ে পঞ্চাশ ষাট মাইল জুড়ে এমন জমজমাট হাসি কান্না, ঝগড়াঝাটি, ভালবাসার ভেতর গাদাগাদি করে দু-তিন কোটি মানুষ মহামজায়— মহাদুঃখে— মহাআহ্লাদে কাজকর্ম করছে— ঘুমোচ্ছে খাচ্ছে দাচ্ছে— অসুখে ভুগছে— নামাজ পড়ছে, ঠাকুর ভাসান দিচ্ছে— ভোট দিচ্ছে— গোহাটায় হালের বলদ কিনছে— তাঁত বুনছে— ট্রানজিস্টারে গান, খবর সব শুনে যাচ্ছে— খবরের কাগজ পেলেও পড়ে ফেলছে— শীতে ধানকাটা মাঠে যাত্রা শুনছে।" (গঙ্গা একটি নদীর নাম, পৃ. ১২)

বর্ণনা (পাহাড়-জঙ্গল-ঝড়):

''আমরা রাতে শুয়ে পড়ার পর উসলাপুঞ্জা পাহাড় থেকে বাতাস নেমে এসে ঝড় হয়ে যেতো। উতয়, তেল, শ্যান্ডেল নদীর জল সেই ঝড়ে তির তির করে কাঁপতো নিশ্চয়। কুসুমখাল জঙ্গল, বড়ডঙ্গরের জঙ্গল— তাদের সব গাছাপালা নিয়ে এলোপাথাড়ি দুলতো। মহুয়া, কেন্দু, গামা, লোহাগাছ— সব পাগলের মত মাথা দোলাতো। বিছানায় শুয়ে আমরা ঝড়ের সেই সোঁ সোঁ শব্দের ভেতর ময়ূরের বাচ্চার কান্না শুনতাম।

এ এক আশ্চর্য ঝড়। তখন সারা জঙ্গলের লতা ছিঁড়ে যাচ্ছে। ফুল ঝরে পড়ছে। পাকা কেন্দুফল খসে পড়ে গাছতলা ঢেকে ফেলছে। মহুয়া ফুলগুলো বোঁটা খসে অন্ধকার বাতাসে কে কোনদিকে উড়ে যাচ্ছে।" (সুধাময়ীর দিনলিপি, পৃ. ২৪)

বর্ণনা (চরিত্র):

''ভেতরে পেল্লাই এক হর্স সু টেবিলের একদম সেন্টারে দশাসই কুসুমসিন্ধু বসে। নাভি থেকে মাথা অব্দি লোকটা তিন ফুটের বেশি হবে। পা থেকে মাথা অব্দি ধরলে সওয়া ছ ফুট লম্বা।

বছর পঁয়ষট্টি বয়স। দেখলে বোঝার উপায় নেই। এখনও দিনে তিনশো বৈঠক আর তিনশো বুকডন দিয়ে থাকেন কুসুমসিন্ধু। তাই তো শুনেছে হৃষিকেশ। রীতিমত পেটানো শরীর। খদ্দরের কলার তোলা পাঞ্জাবি। নিচে চাপা পাজামা।" (নয়ন, পৃ. ৭৭)

বর্ণনা (ঘটনা):

''তখনো প্রবীর আলোয়ানের প্যাঁচে কুন্দনলালের গলাটা পেঁচিয়ে সরু করে রেখেছে। পড়ে যাওয়া কুন্দনলালের শরীরের ওপরেই প্রবীর বসে থাকল। নড়লো না। পা থেকে পাম্পসু খুলে পড়ল রাস্তার ওপরেই। কুন্দনলালের বাঁ হাত নখসুদ্ধ প্রবীরের ডান কাঁধের শার্টের ওপর চেপে বসে গেছে। অন্ধকারে বুন্দনলালের মুখ দেখতে পেল না। কতক্ষণ সে বুঝতে পারল না— তবে দেখলো ধুতি থেকে বেরিয়ে পড়া দু'খানা পা থিরথির করে কেঁপে থেমে গেল।" (কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল, পৃ. ১৪০)

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সাহিত্য', রবীন্দ্র রচনাবলী ৮ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৩৪৮, পৃ. ৩৪৭

২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮৫

৩. মান্না গুণময়, 'বাঙলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক', ভাষা ও সাহিত্য, ১০/১২ রমানাথ স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১০০

৪. তদেব, পৃ. ১০০

৫. দাস অমিতাভ, 'আখ্যানতত্ত্ব', ঈন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১০, পৃ. ৩৮

৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল 'জীবনরহস্য' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮০

৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই পৃ. ৪৪৮

৮. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'দশ লক্ষ বছর আগে', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,

কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি, ২০০১, পৃ. ৬৪

৯. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল 'জীবনরহস্য' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ২১৩

১০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'অনিলের পুতুল, রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ২০১১, পৃ. ২১৮

১১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৪৯০

১২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'হিম পড়ে গেল', রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ২০১১, পৃ. ২৮৫

১৩. দাস অমিতাভ, 'আখ্যানতত্ত্ব', ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স, পৃ. ২৮।

১৪. তদেব, পৃ. ৭৬

১৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল 'জীবনরহস্য' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮৪

উপসংহার

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ন:

আধুনিক যুগে উপন্যাসের শিল্প সংরূপে গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তি মানুষের অধিকার, তার স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদি মুখ্য স্থান লাভ করে। তাই বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্নে যে ব্যক্তি চরিত্র বিষ্ণুপুর থেকে মান্দারণের পথে একাকী গমন করেছিল— সেই একক ব্যক্তিমানুষের উত্তরসূরী হিসাবে পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরা বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তি মানুষের কাহিনি উপন্যাসের শিল্প সংরূপে প্রকাশ করেছেন। আবার সময়ের হাত ধরে সেই ব্যক্তি মানুষের বিবর্তিত রূপ বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হওয়া ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাসে ধরে রেখেছেন। কালপ্রবাহের চাকায় সওয়ারি হয়ে এরপর আমরা পৌঁছে যাই স্বাধীন ভারতবর্ষের পঞ্চাশের দশকে। বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকের জীবনদৃষ্টি, শিল্পরীতি ও বিষয় নির্বাচনের সাক্ষী থেকেছি আমরা। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথা, প্রকৃতির রহস্য, জীবনের রহস্যের কথা পাঠ করেছি।

আসলে শিল্প-সৃষ্টির মৌলিক উপাদনই হলো জীবন। তবে হয়তো উপন্যাসের সঙ্গেই জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। জীবনের কথা, জীবনের দাবি, জীবনের অধিকার, জীবনের রহস্যের স্বাদ পেয়ে, বিস্মিত হয়ে, অনুপ্রাণিত হয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সিক্ত করে লেখক উপন্যাসের কাহিনির মাধ্যমে তা পরিবেশন করেন। সেই কাহিনিতে ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র লেখকের জীবনদৃষ্টি প্রকাশের অন্যতম সহায়ক হয়ে ওঠে। আবার কাহিনি ধারণ করে থাকে সময়, সমাজ ও ঐতিহ্যকে। তাই উপন্যাসের নিবিড় পাঠ ও বিশ্লেষণে উঠে আসে লেখকের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতার সঞ্চরণে সময়-সমাজ-ঐতিহ্য, বৈচিত্র্যময় জীবনের বৈচিত্র্যময় বিষয় ও অনন্ত রহস্যের খনি প্রকৃতি সম্পর্কিত উপলব্ধি।

কিন্তু লেখকের আসল কৃতিত্ব লুকিয়ে থাকে তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিমায়। 'লুকিয়ে' থাকে বল্‌লাম এই কারণে যে, প্রত্যেক শিল্পীই হয়তো তাঁর নির্মাণের বিভিন্ন অংশ, জোড়, কাঠামো, মিশ্রণ, সর্বোপরি পদ্ধতি গুপ্ত রেখে শিল্পবস্তু পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেন। এর ফলেই আস্বাদ্য বস্তু হিসাবে শিল্পবস্তু রূপ লাভ করে। তাই আমরা বলতেই পারি শিল্পরীতিই একমাত্র স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে স্বতন্ত্র, অভিনব। এমনকি শিল্পীরীতির হাত ধরেই জীবনদৃষ্টি, বিষয় নির্বাচন স্বতন্ত্রতা লাভ করে।

এজন্যই সাহিত্যের ইতিহাস আসলে প্রকাশভঙ্গিমার ইতিহাস। ভাষা-নির্ভর শিল্প হিসাবে উপন্যাসই মনে হয় শিল্পরীতির ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীন। উপন্যাসের শিল্প সংরূপের মধ্যেই এই লেখক-স্বেচ্ছাচারী স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিহিত। ফলে কখনও কখনও সমালোচক, গবেষকদের ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় উপন্যাসের রচনাকৌশল আলোচনার মানদণ্ড নির্ধারণে। আর শিল্পরীতির আলোচনা ছাড়া কোনও সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়ন বা সাহিত্যিকের কৃতিত্বের বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং তা শুধু লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতার আলোচনার শব্দপুঞ্জে রূপান্তরিত হয়। অনেক সময় রচনাকারের নিজের রচনা সম্পর্কে প্রকাশিত বক্তব্য তাঁর রচনা সম্পর্কে আলোচনা, বিশ্লেষণ করতে অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। কিন্তু সর্বদা রচনাকারের নিজের রচনা সম্পর্কে ভাবনা ঠিক বা শেষ সিদ্ধান্ত হবে, এরকম কোনও নিশ্চয়তা নেই।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে পা রাখেন একঝাঁক তরুণ। যাদের জন্ম ও বালক-কৈশোর পর্ব কেটেছে পরাধীন ভারতবর্ষে। এই সময়পর্বে তাঁরা সাক্ষী থেকেছেন নানান ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি)। এই একঝাঁক তরুণ লেখকদের মধ্যে একজন হলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। স্বাধীন ভাতবর্ষের কলকাতায় ছিন্নমূল হয়ে সপরিবারে যিনি চলে আসতে বাধ্য হন। যাঁর মধ্যে নিজের জন্মভূমির প্রতি, বালক-কৈশোর পর্বের প্রতি এক প্রবল টান আমৃত্যু আমরা দেখতে পেয়েছি শ্যামলের উপন্যাসের মধ্য থেকে। একদিকে ছিন্নমূল হবার যন্ত্রণা অন্যদিকে স্বাধীন এক রাষ্ট্র থেকে প্রত্যাশা— এই দুই দিক থেকে পীড়িত হয়েছিলেন পঞ্চাশের দশকের অনেক সাহিত্যিক। এক্ষেত্রে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম একজন। স্বভাবতই সেই সব সাহিত্যিকদের রচনায় বিশেষ করে নায়ক বা প্রধান চরিত্রের মধ্যে পীড়ন ভেতরে ও বাইরে, দুই দিক থেকে লক্ষ্য করা যায়। পীড়নের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নায়ক বা প্রধান চরিত্রের মধ্যে নিঃসঙ্গতাবোধ, একাকীত্ববোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ সক্রিয় হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে যে চরিত্র (জগৎ সিংহ) একাকী গমন করেছিল, পঞ্চাশ-ষাটের দশকে এসে সেই চরিত্রই যেন সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে প্রভাবিত হয়ে জীবনের যাত্রাপথে একাকী গমন করছিল। অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'দুখিয়ার কুঠি' (১৯৫৯), 'নির্বাস' (১৯৫৯), সমরেশ বসুর 'বিবর' (১৯৬৫), 'প্রজাপতি' (১৯৬৭), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ' (১৯৬৬), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' (১৯৬৭), বিমল করের 'পূর্ণ-অপূর্ণ' (১৯৬৭), সন্তোষকুমার ঘোষের 'মুখের রেখা' (১৯৫৯)

ইত্যাদি উপন্যাসে নায়কের নিঃসঙ্গতাবোধ, একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতার কাহিনি পাঠ করি। এই ধরনের উপন্যাস হিসাবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৃহন্নলা' (১৯৬১, প্রমথ চরিত্র), 'অনিলের পুতুল' (১৯৬২, অনিল চরিত্র), 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭, কুবের চরিত্র) উপন্যাসেও নায়ক চরিত্রের মধ্যে সময়-সমাজ দ্বারা বিদ্ধ পীড়িত-দীর্ণ মুখ দেখতে পাই। সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় কম্পিত মন একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়। তবে এক্ষেত্রে সার্থক দৃষ্টান্ত হবে 'নির্বান্ধব' (১৯৭২, নিবারণ চরিত্র), 'হাওয়াগাড়ি' (১ম খণ্ড-১৯৭৯, ২য় খণ্ড-১৯৮০, দিলীপ চরিত্র), 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬, অনাথ চরিত্র) উপন্যাসগুলো। তবে উল্লিখিত লেখকগণ থেকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে জীবনদৃষ্টিতে। অনিশ্চয়তা, বিষণ্ণতাবোধকে রক্তে ধারণ করেও শেষপর্যন্ত জীবনের দিকে মুখ করে জীবনের পথে আবর্তিত হওয়া শ্যামলের নায়কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরাজয়, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দৌড় থামানোর (জীবনের পথে) কোনও উপায় নেই শ্যামলের নায়কদের। জীবন-প্রকৃতির রহস্য যেমন অসীম তেমনি তার উপভোগ্যতারও কোনও শেষ নেই। তাই শ্যামলের নায়কেরা জীবন-প্রকৃতির এই রসাস্বাদনে অক্লান্ত। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পর্বে। পঞ্চাশের দশকে সাহিত্য ভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, নায়কের স্বীকারোক্তিমূলক মনোভাব। নায়ক নিজের পাপবোধে পীড়িত হয়েছে। এই পাপবোধই কখনও কখনও নায়কের বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে উঠেছে। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে জানিয়েছেন, এই ধারার সূচনা ঘটেছে দস্তয়েভস্কীর 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট' (১৮৬৬) উপন্যাসের প্রভাব থেকে। এই ধরনের উপন্যাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতে পারি, সমরেশ বসুর 'মানুষ' (১৯৭০), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার সুর' (১৯৬৬), 'নির্জন শিখর' (১৯৬৮), 'তৃতীয় নয়ন' (১৯৬৯), 'কাচের দরজা' (১৯৭০) ইত্যাদি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যেও এই ধারার প্রভাব পড়েছে। 'বৃহন্নলা' (১৯৬১) উপন্যাসের প্রমথ চরিত্র, 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭) উপন্যাসের কুবের চরিত্র, 'স্বর্গে তিন পাপী' (১৯৭৫) উপন্যাসের তিন বন্ধু (অক্ষয়, চন্দ্রকান্ত, পরশুরাম), 'আবিষ্কার' (১৯৭৭) উপন্যাসের নিতাই ডাক্তার প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে স্বীকারোক্তিমূলক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে শ্যামলের স্বাতন্ত্র্য তখন অনুভব করা যায় যখন তাঁর চরিত্ররা স্বীকারোক্তির পর্যায়ে না থেমে এগিয়ে যায় জীবনের পথে। কারণ জীবনের অপার বিস্ময়ে তারা ক্রমশ নিমজ্জমান থাকে আমৃত্যু। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

উপন্যাস সর্বদাই জীবনরহস্যের সন্ধানে নিয়োজিত। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সময়ে তাঁদের মানস প্রবণতা অনুযায়ী জীবনরহস্য সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। শ্যামলের ভাবনা হলো, ''মানুষের বিশ্বাস, মানুষের রূপ, মানুষের বৈচিত্র্য, মানুষের পতন, মানুষের উত্থান, পড়তে পড়তে বড় হয়ে ওঠা, বড় হয়ে ওঠার ভেতর পতনের বীজ।'' ('জীবনরহস্য'/পৃ. ২২৮) এর মধ্য দিয়েই লেখক জীবনসত্যের অন্বেষণে ব্রতী হয়েছেন। তাই জীবনকে মুহূর্তে বিভাজিত করে শ্যামল যেমন ব্যক্তিগত জীবনে অনুভব করেছেন, তাঁর সৃষ্ট নায়কেরাও তেমন করেছেন। তাই লেখকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর প্রধান চরিত্র লেখকেরই অনুরূপ সত্তার ভূমিকা পালন করেছে। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে লেখক-অনুরূপ সত্তার এত ব্যাপকহারে ব্যবহার আর কোনও সাহিত্যিক হয়তো করেননি। এই বিষয়টি আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। জীবনের প্রতি গভীর কৌতূহল (মানুষ ও মনুষ্যতর জীবন) ছিল বলেই শোকে, বিষাদে, ক্রোধে, বিক্ষোভে, আনন্দে শ্যামল একেবারে আত্মহারা হয়ে যাননি। বরং বারবার শ্রেণিচ্যুত হতে চেয়েছেন জীবন ও রচনার প্রথাগত ধারণা থেকে। তাই শ্যামলের চরিত্ররা তথাকথিত সুরক্ষিত অনুকুল জীবনকে অস্বীকার করে বিপরীত জীবনকে বেছে নিয়েছে। জীবনসত্যের অন্বেষণে অক্লান্ত থেকেছে। তাই শ্যামলের উপন্যাস পাঠে মনে হয় তিনি যেন জীবনকে উৎসবের মত উদ্‌যাপিত করেছেন। 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭) উপন্যাসে কুবের, 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬) উপন্যাসে অনাথবন্ধু বসু, 'হাওয়াগাড়ি' (১ম খণ্ড-১৯৭৯, ২য় খণ্ড-১৯৮০) উপন্যাসে দিলীপ বসু, 'মহাজীবন' (১৯৯৫) উপন্যাসে রজত পালিত, 'সরমা ও নীলকান্ত' (১৯৭২) উপন্যাসে সরমা ও নীলকান্তের অন্বেষণে ব্যক্তিগত জীবন যেমন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে— অন্যদিকে 'নতুন ভুবন' (১৯৭৩), 'অলীকবাবু' (১৯৮১), 'সওদাগর' (১৯৮১), 'শাহজাদা দারাশুকো' (১ম খণ্ড-১৯৯১, ২য় খণ্ড-১৯৯১), 'আলো নেই' (১ম খণ্ড-১৯৯৯, ২য় খণ্ড ২০০২) উপন্যাসে তেমন সমষ্টিগত জীবনসত্যের অন্বেষণে লেখক নিয়োজিত। এই বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে যেসব সাহিত্যিকদের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশ বাল্যকৈশোর পর্ব অবিভক্ত বঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। দেশভাগ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অনেকেই কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছেন। যে ঐতিহাসিক কালখণ্ডে এনারা সময় কাটিয়েছেন— পরবর্তীকালের লেখায় অতিক্রান্ত করা শৈশব-কৈশোর পর্ব প্রভাব ফেলেছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'উজান', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্ধেক জীবন' (২০০২) ইত্যাদি উপন্যাসে

শৈশব-কৈশোরের প্রভাব পড়েছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ''যার পকেটে শৈশব নেই সে যেন কোনদিন প্রতিভার নদীতে না নামে। নামলেই ডুবে যাবে। নয়তো ভেসে যাবে। যার আছে— সেই শুধু সাঁতরাতে পারবে। জীবনেও তাই হয়। ভালো ছোটবেলা আসলে বড় বেলার অ্যাডভান্স টিকিট। আগে লাইন দিয়ে কেটে রাখতে হয়। এ টিকিট হাতে থাকলে বড়বেলাটাও সুন্দর।'' (জীবনরহস্য/পৃ. ১৫৮) খুলনায় কাটানো শৈশব-কৈশোর পর্ব শ্যামলের খুব প্রিয় স্মৃতি ছিল। তাই এই পর্বের স্মৃতিআকুলতা লেখকের সারাজীবনের লেখায় প্রভাব ফেলেছে। বারবার ঘুরেফিরে এসেছে বিভিন্ন লেখায় খুলনার স্মৃতি। যেমন, 'ফিরোজা' (১৯৯৪), 'আলো নেই' (১ম খণ্ড-১৯৯৯, ২য় খণ্ড-২০০২) উপন্যাস। তবে শুধু শৈশব স্মৃতি নয়, আরও বিভিন্ন ঘটনা-প্রসঙ্গ বিভিন্ন উপন্যাসে ঘুরেফিরে এসেছে। যেমন, কলকাতায় কৈশোর পর্ব—'কুবেরের বিষয় আশয়', 'সিদ্ধকামিনী' উপন্যাসে। বেলুড়ের ওপেন হার্থ ফারনেসে কাজ করার অভিজ্ঞতা— 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে। গ্রামজীবনের (চম্পাহাটি পর্ব) অভিজ্ঞতা— 'কুবেরের বিষয় আশয়', 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'স্বর্গের আগের স্টেশন', 'চন্দনেশ্বর জংশন' উপন্যাসে। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে মেয়ের বয়সী এক মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ার অভিজ্ঞতা— 'শাজহাজাদা দারাশুকো', 'তারসানাই', 'কামিনীকাঞ্চন', 'অদৃশ্য ভূমিকম্প' ইত্যাদি উপন্যাসে। ঘটনা-প্রসঙ্গ যেমন ঘুরেফিরে এসেছে তেমনি বিভিন্ন চরিত্রকেও স্বাভাবিকভাবে ঘুরেফিরে আসতে দেখি। তাই লেখকের স্বীকারোক্তি, ''ঘুরে ফিরে যার কথা লিখতে চেয়েছি সে আমারই জানাশুনো একজন লোক। তার নাম শ্যামল গাঙ্গুলি।'' (জীবনরহস্য/পৃ. ১৮০) আত্মজৈবনিক উপাদানের এত ব্যাপক ব্যবহার এত উপন্যাসে করেছেন যে, তাতে শ্যামলের জুড়ি মেলা ভার। তাই তাঁর উপন্যাস পাঠে মনে হয় তিনি যেন সারাজীবন ধরে একটি উপন্যাসই লিখেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে প্রথম অধ্যায়ে।

রাজনৈতিক অস্থিরতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা। রাজনৈতিক সংঘাত, মতবাদ-বিশ্বাসের লড়াই দেখেছেন ছোটবেলা থেকেই। নিজের সেজদা তনুদা অর্থাৎ পূর্ণেন্দুবিকাশ গঙ্গোপাধ্যায় কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। লেখক নিজেও কলেজ জীবনে কমিউনিস্ট ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস রাখতে পারেননি। লেখক স্পষ্ট জানান, ''আমার কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। কোনদিন মনে হয়নি— অমুকে ক্ষমতাচ্যুত হলে এবং সে জায়গায় অমুক এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সর্বদাই জানি — রাষ্ট্র ও প্রশাসন মানে একটি অন্ধ কবন্ধ দানব। সেজন্যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী

নয়। এটা একটা ব্যবস্থা বা প্রথা।" (জীবন রহস্য/পৃ. ১৮২) তাই শ্যামলের কোনও উপন্যাসে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় না। স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সত্তরের দশক আর পাঁচটা দশকের মত ছিল না। ১৯৬৭ সালের ২৫ মে নকশালবাড়ি জেলায় একদল কৃষক সংগঠিত হয়ে জমিদার, জোতদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এরপরেই মাও সে তুংয়ের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী মানুষজন এক সহিংস উগ্র আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। অতিদ্রুত সারা বাংলায় তা ছড়িয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই উগ্র রূপ—এর আগে ভারতীয় উপমহাদেশে কখনও দেখা যায়নি। অচিরেই নকশালবাড়ি আন্দোলন হত্যার রাজনীতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। অবশ্য নকশাল বিপ্লবীরা নিজেদেরকে 'স্বপ্নের কারবারি' হিসাবে ঘোষণা করেছিল। সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের অনেক সাহিত্যিক নকশাল আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই নকশাল আন্দোলন উঠে আসতে থাকল তাঁদের লেখায়। যেমন, স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো' (১৯৭২), মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'শ্যাওলা' (১৯৭৭), শৈবাল মিত্রের 'অজ্ঞাতবাস' (১৯৮০), জয়া মিত্রের 'হন্যমান' (১৯৭৬), জয়ন্ত জোয়ারদারের 'এভাবেই এগোয়' (১৯৭৮), গুণময় মান্নার 'শালবণী' (১৯৭৮), তপোবিজয় ঘোষের 'সামনে লড়াই' (১৯৭০), সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৭) ইত্যাদি উপন্যাস। নকশাল আন্দোলনের বিষয়-প্রসঙ্গ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাওয়াগাড়ি' (দু'টি খণ্ডেই), 'একদা ঘাতক', 'সতী অসতী' উপন্যাসে পাই। কিন্তু শুধুমাত্র নকশাল আন্দোলনকে মুখ্য বিষয় করে শ্যামল কোনও উপন্যাস লেখেননি। আসলে লেখক নকশালবাড়ি আন্দোলনকে খুন করার রাজনীতি হিসাবেই দেখেছেন। তাই এই আন্দোলন সম্পর্কে কোনও নীতিগত সমর্থন লেখকের ছিল না। 'হাওয়াগাড়ি' (প্রথম খণ্ড) উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, ''মানুষের ভালোর জন্যে মানুষ খতমেও রবি পিছপাও নয়। কিন্তু রবির বাবা হিসাবে তার বিশ্বাস: মানুষকে নিশ্চিহ্ন করলেও তার স্মৃতি মোছা যায় না।" আমার গবেষণা পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের (১৮৯৩) হাত ধরে। এই ধারাটি পরবর্তীকালে ক্ষীণ হয়ে গেলেও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' (তিনখণ্ড-১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৬), 'পদসঞ্চার' (১৯৬৪), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' (১৯৫৮),

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' (১৯৬৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' (দুটি খণ্ড, ১৯৮১, ১৯৮২), বাণী বসুর 'মৈত্রেয় জাতক' (১৯৯৬) বিংশ শতাব্দীর কিছু উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। তবে এই শতকে ইতিহাস নিয়ে বিশেষ করে মোঘল রাজবংশ নিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসটি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন দুটি খণ্ডে 'শাহজাদা দারাশুকো'। বঙ্কিম পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে মোঘল রাজবংশ নিয়ে এমন সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস আর কেউ লেখেননি। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের ভূমিকাংশে লেখক বলেন, ''শাহজাদা দারাশুকো হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মচিন্তায় মিলনবিন্দুটি খুঁজতে গিয়ে সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যান। তাই তিনি হিন্দুস্থানের ইতিহাসে একটি কালো গোলাপ। ব্যথা, সৌন্দর্য, কালের ইতিহাসের সঙ্গে এই গোলাপ জড়িয়ে গেছে। হিন্দুস্থান যুগে যুগে তাঁকে বারবার আবিষ্কার করবে। ... আধুনিক হিন্দুস্থানে তিনি রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরুও দিশারী।'' ('হে মহান দিশারী'/'শাহজাদা দারা শুকো', প্রথম খণ্ড) তৎকালীন সময়ে ও বর্তমান সময়েও বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী (বিশেষত হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম) মানুষদের মধ্যে যে পারস্পরিক সংঘাত, অবিশ্বাস কাজ করে— এই প্রেক্ষাপটে 'শাহজাদা দারাশুকো উপন্যাসটিকে মিলন ভাবনার অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'আলো নেই' (দুটি খণ্ড) উপন্যাসেও লেখক পরাধীন ভারতবর্ষের এক ঐতিহাসিক কালখণ্ডকে কল্পনা ও শৈশব স্মৃতির মিশ্রণে তুলে ধরেছেন। তৎকালীন সময়, সমাজ, রাজনীতি বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক 'আলো নেই' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন, ''অদূরেই স্বাধীনতা। দেশভাগ ঘনিয়ে এসেছে। কোথাও যেন আলো নেই। অখণ্ড বঙ্গে দমবন্ধ অবিশ্বাসের আবহাওয়া। শতাব্দীর পরে শতাব্দী যারা একে অন্যের পড়শী তাদের ভেতর রাজনীতির বিষ ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বাস, ভালবাসা ছিন্নভিন্ন।'' দানাবাঁধা ঘন বেদনার পর্বটি লেখক অত্যন্ত অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে এক বিশ্বাসযোগ্য রূপ দিয়েছেন। আমাদের গবেষণা পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বাংলার মানুষের সঙ্গে নদীর এক গভীর সখ্য রয়েছে। তাই বাংলা সাহিত্যে নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের একটি ধারা রয়েছে। তবে শুধু বাংলার মানুষের সঙ্গেই নয়, মানব সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে নদীর গভীর যোগ বর্তমান। কখনও পরম বন্ধু কখনও ধ্বংসকারী হিসাবে নদী মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য শুধু দেশে নয় বিদেশেও, শুধু আধুনিক সাহিত্যে নয় প্রাচীন সাহিত্যেও নদী গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসাবে উঠে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাব,

'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, মৈমনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি সাহিত্যে নদী বিভিন্ন রূপে উপস্থিত হয়েছে। বাংলা আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যে নদীর অনুষঙ্গ প্রথম আসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়ের 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) উপন্যাসে যেখানে গঙ্গা নদীর ভূমিকা দেখি। এছাড়াও বাংলা সাহিত্যে নদী কেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' (১৯৪০), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' (১৯৫০), অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৬৭), অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' (১৯৫৬), অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮), হুমায়ুন কবীরের 'নদী ও নারী' (১৯৪৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহানন্দা' (১৯৫১), দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) ইত্যাদি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের শৈশব কেটেছে ভৈরব-রূপসা নদীর সহচর্যে। শৈশব পরবর্তী জীবন গঙ্গা নদীর সহচর্যে। তাই নদী অনুষঙ্গ খুব সহজভাবেই শ্যামলের উপন্যাসে এসেছে। তবে নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস হিসাবে আমরা লেখকের একটি উপন্যাস পাই। তা হলো 'গঙ্গা একটি নদীর নাম'। তবে লেখকের নদী অপেক্ষা অধিক আগ্রহের বিষয় ছিল নদী তীরবর্তী দু'পাশের মানুষের জীবনকথা। তাই লেখক এই উপন্যাসে কোনও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় অপেক্ষা ব্যক্তি জীবনের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। সেই ব্যক্তি জীবনের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। এখানেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। কলকাতা শহরের অন্যতম একটি অঙ্গ হলো গ্রুপ থিয়েটার। এই গ্রুপথিয়েটার ও থিয়েটার সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের নিয়ে লিখেছেন 'অদ্য শেষ রজনী'। বাংলা সাহিত্যে এর আগে এই বিষয় নিয়ে কোনও উপন্যাস রচিত হয়নি। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষের আত্মহত্যা করার প্রবণতা ছোঁয়াচে রোগের রূপ নেবে। এই বিষয় নিয়ে লিখেছেন 'নতুন ভুবন' উপন্যাসটি। মানুষের রাতারাতি বড়লোক হবার অন্তহীন লোভকে হাতিয়ার করে কীভাবে চিটফাণ্ড সাধারণ মানুষকে বোকা বানায়, সর্বশান্ত করে— এই বিষয় নিয়ে লিখেছেন 'সওদাগর' উপন্যাস। বিষয়বৈচিত্র্যে শ্যামলের রচনাসম্ভার যে অনেক সমৃদ্ধ, তা আমরা আমাদের গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সংশয়তাড়িত মন নিয়ে লিখেছেন। আর এই সংশতাড়িত মন বারবার নিজের জীবন অভিজ্ঞতাকেই আশ্রয় করেছে। তাই কাহিনির বৃত্ত নির্মাণে লেখকের খুব বেশি

আগ্রহ ছিল না। লেখা তো শ্যামলের কাছে উদ্‌যাপনের বিষয়। তাই কিছুটা অগোছালো মনোভাব কাহিনির বৃত্ত নির্মাণে দেখা যায়। আত্মজৈবনিক উপাদানের যথেচ্ছ ব্যবহার যৌগিক প্লট সৃষ্টির অন্যতম কারণ। পাঠককে সম্বোধন করে কাহিনি উপস্থাপনা করেছেন বঙ্কিমীয় রীতিতে। যেমন, 'সতী অসতী' উপন্যাস। আবার বিভিন্ন শিরোনাম ব্যবহার করে কাহিনি উপস্থাপন রীতিও শ্যামলের উপন্যাসে দেখা যায়। যেমন, 'এক সিংহ ও তার রমণী' উপন্যাস। কল্পনার ন্যূনতম প্রয়োগ লেখকের কাহিনি নির্মাণ কৌশলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় কল্পনার মিশ্রণ দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল লেখকের। শ্যামল নিজেই বলেছেন, ''কিন্তু নিপুণতার পরেও একটা কথা আছে। তা হল কল্পনা। দৈবী পাগলামো। ম্যাজিক রিয়ালিটি। যা না থাকলে পৌনঃ পুনিকতায় সবই জীর্ণ হয়ে বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য।" (জীবন রহস্য/পৃ. ২০৮) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লেখার ক্ষেত্রে ভাষা নিয়ে খুব বেশি ভাবিত ছিলেন না। কারণ তাঁর মতে, বিষয় শক্তিশালী হলে বিষয় অনুযায়ী ভাষা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে। ভাষা আসলে বিষয়ের 'দাসানুদাস'। বরং সেই সময়ে ভাষা নিয়ে হয়তো সবচেয়ে বেশি যে ভেবেছেন, সেই কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য হলো, ''কমলকুমারের বলার কথা কি ছিল? অন্তর্জলিযাত্রায় যা তিনি বলেছিলেন তা কি আরও সহজ করে বলা যেত না? ওই ভাষাই কি তাঁর সৌন্দর্যবোধ সবচেয়ে ভালো করে প্রকাশ করতে পারে? নান্দনিক বিকাশের পক্ষে ওই ভাষা কি বাধা নয়?" (জীবন রহস্য/পৃ. ২০৪) কাটা কাটা বাক্যে, আটপৌর শব্দে, সহজাত ইংরেজি শব্দের ব্যবহারে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারে নিজস্বতা তৈরি করেছেন। তবে অনেক উপন্যাসে চিঠি-পত্র, ডায়ারি লেখার সময় শ্যামল সাধু ভাষার ব্যবহার করেছেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পরীতি নিয়ে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

বয়সের পার্থক্যকে শ্যামল বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। অনেক কম বয়সের লেখকদের সঙ্গে শ্যামল খুব সহজ ভাবে মিশতেন। শুধু মিশতেন বললে ভুল হবে— তাঁর দ্বারা অনেক অনুজ লেখক প্রভাবিতও হয়েছেন। যেমন, কিন্নর রায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, নলিনী বেড়া, রবিশংকর বল, তুষার চৌধুরী, ভগীরথ মিশ্র প্রমুখ। মতি নন্দী লিখেছেন, ''রাস্তায় একে একে এসে পৌঁছেছে বাংলা সাহিত্যের তরুণ প্রজন্ম। তারা শ্যামলকে শ্রদ্ধাই শুধু নয়, একজন প্রধান লেখকের স্বীকৃতি জানাতেও এসেছে। দেখে ঈর্ষা হল। ওই তরুণদের আসাটাই বুঝিয়ে দিল শ্যামল কত বড় লেখক। মিডিয়ার ঢক্কা নিনাদ দ্বারা শ্যামল নির্মিত নয়।" (কত বড় বোঝাল তরুণরাই/ প্রসঙ্গ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১২)

অনুজ সাহিত্যিকদের যেমন তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন, তেমনি অগ্রজ সাহিত্যিক দ্বারা তিনি নিজেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বন্ধু মহলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের প্রিয় লেখক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তেমনি নিজের গদ্যরচনাতেও বিভূতিভূষণের নাম প্রিয় লেখক হিসাবে লিখেছেন। আমাদেরও মনে হয় বিভূতিভূষণের প্রভাব শ্যামলের লেখায় ছিল। 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসটি দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা লেখকদ্বয়ের মধ্যে অন্যতম একটি সাদৃশ্যের বিষয়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় শিশুসাহিত্যিক হিসাবেও খ্যাতি পেয়েছিলেন। জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতা ও সম্পাদনা, লিখেছেন অনেক ছোটগল্প। শিশুসাহিত্যিক হিসাবে, ছোটগল্পকার হিসাবে, সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসাবে শ্যামলের মূল্যায়ন পৃথক গবেষণার দাবি রাখে। আমাদের গবেষণা পত্রে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের আলোচনা বিবৃতিমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও তুলনামূলকভাবে তুলে ধরেছি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনকে উপভোগ করার যে প্রবণতা ছিল, উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠকের মধ্যেও তিনি তা সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। তাই শ্যামলের উপন্যাসসম্ভার বাংলা সাহিত্যকে অনেক সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন তেমন জীবনদৃষ্টির স্বতন্ত্রতা লেখককে শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। শিল্পরীতির ক্ষেত্রেও নিজস্বতা সৃষ্টিতে সফলতা লাভ করেছেন লেখক। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলা সাহিত্যের গভীরতা, বৈচিত্র্য ও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সময়-সমাজ দেখানোর চেষ্টা করেছি। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের আলোচনায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের আলোচনা তাই অনিবার্য।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : হাওয়াগাড়ি, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যাম্যাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম খণ্ড- ১৯৭৯, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮০।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : সিদ্ধকামিনী, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: এক গেরস্থের তিন সংশয়।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : যতীন দারোগার বেদান্ত, করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৫।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : দশ দিগন্ত, মোসুমী প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৬, অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: নির্বান্ধব, ফিরোজা, সরমা ও নীলকান্ত, স্বর্গে তিন পাপী, সতী অসতী, জলপাত্র, পরবর্তী আকর্ষণ, স্বর্গের পাশের বাড়ী, গোলকধাম, সওদাগর।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : অতি বড় ঘরনি, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৬, অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: মাছের পেটে আংটি, টানেলের ভেতরে ট্রেন।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : ক্ষমতার বারান্দা, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৮। অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: ডুব সাঁতারের বিপদ আপদ।

গঙ্গেপাধ্যায়, শ্যামল : পারুলেডাঙ্গার লাল রাখাল, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮। অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: শেষ দরবার।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : মানুষের রহস্য, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,

কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯। অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: দুই অভিযাত্রী, ভগবান বুনো রায়ের বংশধর।

গঙ্গেপাধ্যায় শ্যামল : ভোরবেলার ভালোবাসা, অর্পণ বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯০। অন্তর্ভুক্ত উপসন্যাস : বাম অলিন্দ।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : শাহজাদা দারাশুকো, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯১, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯১।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : ভাসামানিকের ভালবাসা, সাহিত্য সংস্থা, কলকতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯২

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : তারসানাই, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৩, অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: সুশ্রী, গৌরী এবং ...।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : কন্দর্প দর্পণ, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : কামিনীকাঞ্চন, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৪।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : এখানে বিরাজি শুয়ে আছে, প্রজ্ঞা পাবলিকেশনস্, কলকাতা-৯, প্রকাশকাল- ১৯৯৪।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : মহাজীবন, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৫।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : হলদি নদীর সারেং, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬। অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: চিন্ময়ী।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : সুধাময়ীর দিনলিপি, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৭। অন্তর্ভুক্ত

উপন্যাস: শিকড়, একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : বেঁচে থাকার স্বাদ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৮। অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: স্বপ্নসম্ভব।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : ভালবাসিব না আর, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৮। অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: নয়ন, তৃতীয় মেরু, সূর্যাস্তের আগে।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : গত জন্মের রাস্তায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৯।

গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল : কঠিন সময়, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯। অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: শেষ বিকেলের আলো।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : আলো নেই, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম খণ্ড- ১৯৯৯, দ্বিতীয় খণ্ড- ২০০২।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : গঙ্গা একটি নদীর নাম, বুক ফ্রন্ট পাবলিকেশন ফোরাম, কলকাতা-৯১, প্রথম প্রকাশ-২০০১।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : দশ লক্ষ বছর আগে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০০১। অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: সে, এক সিংহ ও তার রমণী।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : অমলতাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ২০০১। অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: বড় হওয়ার আগে, কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল, অর্জুনের অজ্ঞাতবাস।

গঙ্গেপাধ্যায়, শ্যামল : মাতৃচরিতমানস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০০৪। অন্তর্ভুক্ত

উপন্যাস: কহেল গাঁও।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : দশটি উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: অনিলের পুতুল, নির্বান্ধব, পরস্ত্রী, সরমা, স্বর্গে তিন পাপী, অলীকবাবু, একদা ঘাতক, শেষ বিকেলের আলো, বাম অলিন্দ, অদৃশ্য ভূমিকম্প।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১১। উপন্যাস: অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, অনিলের পুতুল, কুবেরের বিষয় আশয়।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : রচনাসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জপাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১১। উপন্যাস: নির্বান্ধব, পরস্ত্রী, ফিরোজা, স্বর্গে তিন পাপী, হিম পড়ে গেল।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : রচনাসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১২। উপন্যাস: সরমা ও নীলকান্ত, সতী অসতী, অদ্য শেষ রজনী।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : রচনাসমগ্র (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-২০১৩। উপন্যাস: ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, আবিষ্কার, পরীর সঙ্গে প্রেম, পরবর্তী আকর্ষণ।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : রচনাসমগ্র (পঞ্চম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১৪। উপন্যাস: স্বর্গের আগের স্টেশন, চন্দনেশ্বর জংশন, নতুন ভুবন, স্বর্গের পাশের বাড়ি।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : টানেলের ভেতরে ট্রেন (পত্রিকা সংস্করণ) গল্পসরণি, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা: দুই, দ্বাবিংশতি বর্ষ: বার্ষিক সংকলন ২০১৮।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : পরীর সঙ্গে প্রেম, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রকাশকাল-১৯৭৭। অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস: এক গেরস্থের তিন রক্ষিতা।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : দূরবীনের উল্টোদিকে, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৮২।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : হননের আয়োজন, আজকাল পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রকাশকাল-১৯৯৪।

অন্যান্য রচনা:

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : কী খাব, কী দেখে কিনব?; আজকাল পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রকাশকাল ১৯৯৪।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : মনে কি পড়ে, আজকাল পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রকাশকাল ১৯৯৫।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : নবীন থাকার উপায়, আজকাল পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রকাশকাল ১৯৯৬।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : ঘুম, আজকাল পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রকাশকাল ১৯৯৭।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : বাজার সফর, আজকাল পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রকাশকাল ২০০২।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : বুকের ভেতরের রস, মনফকিরা, হাওড়া-৭১১১১১, প্রকাশকাল-২০০৬।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : জীবন রহস্য, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩, প্রকাশ - ২০০৭।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : মহাকাল মেলের প্যাসেঞ্জার, পরশপাথর প্রকাশন,

কলকাতা-৭৩, প্রকাশকাল-২০১২।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল : জীবনরেণুর কারিগর, পরম্পরা প্রকাশন, কলকাতা-৯, প্রকাশকাল-২০১৫।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

ইদরিস আলি, মুহম্মদ : বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৬।

ইসলাম, নজরুল : বাংলা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯২।

গঙ্গোপাধ্যায়, ইতি : আমার শ্যামল, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪।

গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, প্রথম খণ্ড-১৯৮৬, দ্বিতীয় খণ্ড- ১৯৯৪, তৃতীয় খণ্ড- ২০০৩, পঞ্চম খণ্ড-২০০৫, ষষ্ঠ খণ্ড-২০০৬।

ঘোষ, নির্মল : নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-১৯৮১।

চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ : বাংলা কথাসাহিত্যে মনোবিশ্লেষণ, পুষ্প প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৯।

চক্রবর্তী, নির্মাল্যনারায়ণ : দর্শনের পথে পুবে ও পশ্চিমে, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০।

চক্রবর্তী, সুমিতা : উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩।

চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত : বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন: বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২।

চট্টোপাধ্যায়, শংকর : বাংলা উপন্যাসের নিঃসঙ্গ নায়ক (১৯১৪-১৯৫০), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২।

চট্টোপাধ্যায়, শিশির : উপন্যাস পাঠের ভূমিকা, বুকল্যাণ্ড প্রা:লি:, কলকাতা, ১৯৬২।

চট্টোপাধ্যায়, হীরেন : বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক

পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২।

চৌধুরী, নাজম জেসমিন : বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, চিরায়ত প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮০।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৪১।

ত্রিপাঠী, অমলেশ : স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০।

দত্ত, বিজিতকুমার : বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৩।

দাশগুপ্ত, বিপ্লব : বাঙালি জাতি ও বাংলাভাষা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪।

দাশগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ : উপন্যাস ভাবনা, উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯২।

দাশ, জীবনানন্দ : জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, কলকাতা, ১৯৫৪।

দাশ, শিশিরকুমার : ভাষা জিজ্ঞাসা, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২।

দাস, শ্রীশচন্দ্র : সাহিত্য সন্দর্শন, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ১৯৪০।

দে, আশিসকুমার : উপন্যাসের শৈলী, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮৩।

দেব, রণেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়, বুকল্যাণ্ড প্রা: লি:, কলকাতা।

দেবসেন, সুবোধ : বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩।

পাল, রবিণ : কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪।

পাল, রবিন : উপন্যাসের উজানে, চ্যাটার্জি পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত : বঙ্কিম-রবীন্দ্র উপন্যাসের গল্প-কাঠামো ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, ২০০৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : অন্তর্বয়ন: কথাসাহিত্য, উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ : আরণ্যক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা : স্বাধীনতা উত্তর-বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাস: দ্বান্দ্বিক দর্পণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত : গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫।

বসু, অমলেন্দু : সাহিত্য চিন্তা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৯৭২।

বসু, শুদ্ধসত্ত্ব : বাংলা সাহিত্যের নানারূপ, অক্ষর, কলকাতা, ১৯৭৭।

ভট্টাচার্য, অরূপকুমার : আঞ্চলিকতা: বাঙলা উপন্যাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৭।

ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫।

ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ : উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮২

ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু : বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের কয়েকটি পর্যায়, মণীষা, কলকাতা, ১৯৯৩।

ভট্টাচার্য, সুভাষ : ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯।

ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ : উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র, জি.এ. এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা, ১৯৭৯।

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : পঞ্চাশের দশকের কথাকার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮।

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮।

মজুমদার, সমরেশ : কইতে কথা বাধে, আরুণি পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০০।

মান্না, গুণময় : বাংলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক: আধুনিক যুগ, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৫।

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : কালের প্রতিমা : বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮।

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২।

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, ১৯৬৭।

মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার : সাহিত্য বিবেক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬ (চতুর্থ সংস্করণ)।

রহমান, আকিমুন : আধুনিক বাংলা বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ (১৯২০-৫০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

রায়, অলোক : সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৩।

রায়, অলোক : বাংলা উপন্যাস: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০।

রায়, দেবেশ : উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১।

রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র : ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৪৩।

রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৪।

রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : বাংলা কথাসাহিত্য: প্রকরণ ও প্রবণতা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯১।

রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০।

রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৮৭।

লাহিড়ী, কার্তিক : বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭২।

শ', রামেশ্বর : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৮।

সমাদ্দার, ভাস্বতী : বাংলা উপন্যাসের পালাবদল (১৯৬৬-১৯৭৮), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪।

সরকার, পবিত্র : গদ্যরীতি: পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৫।

সান্যাল, অরুণ (সম্পাদিত) : প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১।

সান্যাল, দুর্গাচন্দ্র : বাংলার সামাজিক ইতিহাস, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০০৩।

সিকদার, অশ্রুকুমার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮।

সেনগুপ্ত, শ্যামল : বাংলা উপন্যাসে নায়কের বিবর্তন, ম্যানস্ক্রিপ্ট ইণ্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৮১।

ইংরেজি গ্রন্থ:

Abrams, M.H. : A Glossary of Literary terms, Thomson Asia Pvt. Ltd, Singapore, 2003.

Allott, Miriam (ed)	:	Novelists on the Novel, Routledge & Kegan Paul, London, 1975.
Aristotle	:	Poetics, trans. M. Heath, Penguin, Harmondsworth, 1996.
Armstrong, Nancy	:	Desire and Domestic Fiction: A political History of Novel, Oxford University Press, New York & Oxford, 1987.
Bradbury, M.	:	Possibilities, Eassys on the State of the Novel, Oxford University Press, London, Oxford, New York, 1973.
Brooker, Peter (Ed)	:	Modernism/Post-Modernism, Longman, London & New York, 1994.
Chandra, Bipan	:	Colonialism is Modern India, Orient Longman, Hyderabad, 1979.
Chatterji, A.C	:	India's Struggle for Freedom, Chuckerverty, Chartterjee & Co Ltd, Calcutta, 1947.
Eakin, Paul John	:	Fictions in Autobiography, Studies in the Art of Self Invention, Priecton University Press, Prinecton, 1985.
Forster, E.M.	:	Aspects of the Novel, Harcourt Brace Jovanovich, New York & London, 1974.
Fowler, R (Ed).	:	Style and Structure in Literature, Basil Black well, Oxford, 1975.
Fox, Ralph	:	The Novel and the People, First Indian edition, Calcutta, 1944.
Hawthorn, Jeremy	:	Studying the Novel : An Introduction, Edward

Arnold, London 1984.

Hoffman, M.J & Murphy, P.D (ed): Essentials of the Theory of Fiction, Leicester University Press, London, 1986.

Kundera, Milan : The Art of the Novel, Faber & Faber, London, 1988.

Liddell, Robert : Some Principles of Fiction, Jonathon Cape, London, 1953.

Lodge, Devid : Language of Fiction, Routledge and Kegan Paul Ltd. London, 1966.

Lubbock, P. : The Craft of Fiction, Jonathan Cape, London, 1926.

Majumder, R.C. : History of the Freedom Movement in India, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1963.

Medina, Angel : Reflection, Time and the Novel, Routledge& Kegan Paul, London, Boston & Henley, 1979.

Misra, B.B. : The Indian Middle Classes: Their Gowth in Modern times, Oxford University Press, Delhi, 1961.

Muir, Edwin : The Structure of the Novel, The Hogarth Press, London, Publised, 1928.

Tobin, Patricia Drechsel : Time and the Novel, Princeton University Press, Princeton, 1978.

পত্রপত্রিকা:

এবং মুশায়েরা, কলকাতা : জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৭

কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা: সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৯৩

গল্পসরণি, কলকাতা: শ্যামল: এক, চতুর্বিংশতিতম বর্ষ: বার্ষিক সংকলন ১৪২৬/২০২০। শ্যামল

গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা: দুই, দ্বাবিংশতিবর্ষ : বার্ষিক সংকলন ১৪২৪/২০১৮

দেশ, কলকাতা: সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৭৬

দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ: অক্টোবর, ১৯৭৩।

পরম্পরা, কলকাতা: দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪

বোদলেয়ার, কোচবিহার: শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১২

সান্ধ্যভাষা, কলকাতা: শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সম্মান সংখ্যা-১, জানুয়ারি ১৯৯৮।

গবেষণা অভিসন্দর্ভ:

সরকার, সংলাপ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা: একটি নিরীক্ষা, তত্ত্বাবধায়ক: অলোক কুমার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ২০০৮।

নির্ঘণ্ট

অ

অখিলবন্ধু ঘোষ - ১৪৯

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় - ১২৬

অমিতাভ দাস - ১৮২

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় - ১২৪

অতুল্য ঘোষ - ৩৯

অপর্ণা সেন - ১৫১

অমলেন্দু চক্রবর্তী - ১৪৯

অমলেন্দু দে - ১৫৩

অদ্বৈত মল্লবর্মণ - ৩৯, ১৫৩

অশেষ চট্টোপাধ্যায় -১৪৯

অসীম চক্রবর্তী - ১২৬, ১২৮

অহীন্দ্র চৌধুরী - ৩৯

আ

আওয়ামি লিগ - ১৩

আকবর - ৩১

আরজুমন্দ-বানু বেগম - ৩৭

আবুল কাশেম ফজলুল হক - ৩৯, ১৫২, ১৫৫

আবু জাফর - ১১২

আব্বাসউদ্দিন - ৩৯

আবদুল করিম খাঁ - ১৪৯

আসফ খাঁ - ৩৭

ই

ইন্দিরা গান্ধী - ২৪

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর - ১১০

উ

উৎপল বসু - ১২৪

উলরিখ ব্রাউন - ১৩৭

এ

এয়ার রেইড প্রিকশন্‌স - ১৩২

ক

কংগ্রেস - ৩৯, ১৫২, ১৫৩

কর্ণওয়ালিশ - ৪৪

কমিউনিস্ট - ১, ৩৯, ৪০, ১৫২, ১৫৪

কাজী নজরুল ইসলাম - ৩৯, ১৫৩

কাননবালা দেবী - ৩৯, ১৪১

কালাহান্ডি - ২৭, ৩০

কিন্নর রায় - ১৫৩, ১৫৫

কিশোর কুমার - ১৪৯

কোল ইণ্ডিয়া কোম্পানি - ৩৩, ৮৮, ১৩০

কে. এল. সায়গল - ১৪৯

কেতকী দত্ত - ১২৬, ১২৮

কেয়া চক্রবর্তী -১২৬

কৃষক প্রজা পার্টি - ৩৯, ১৫৩, ১৫৫

খ

খসরু - ৩৬

গ

গওইরজান - ১৪৯

গাঙ্গুবাঈ - ১৪৯
গির অভয়ারণ্য - ২৭, ৩০
গুণময় মান্না - ১৬২
গৌতম ভদ্র - ১৫৩
গ্রুপ থিয়েটার- ১৭, ১৮, ৮১, ৮৩, ১২৭, ১২৮
ঘ
ঘড়িঘর - ১৫১
ঘুটিয়ারি শরিফের মাজার - ১১৯
চ
চারুচন্দ্র বিশ্বাস - ৩৯
চিটফান্ড কোম্পানি - ৪৯
জ
জওহরলাল নেহেরু - ৩৯
জদ্দনবাঈ - ১৪৯
জন্মান্তরবাদ- ৪৩, ১৭৯
জয়া চ্যাটার্জী - ১১২
জাহাঙ্গীর - ৩৫, ৩৬, ১১৩
জোহরা বাঈ - ১৪৯
জীবনানন্দ দাশ - ৩৯
ট
টিপু সুলতান - ৪৫
ঠ
ঠুংরি - ১৪৯
ত
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় - ৪, ১৭, ৩৯, ১১৭, ১১৮, ১৫৩
তজুক-ই-জাহাঙ্গীর - ৩৭
তেভাগা - ১, ৪০
দ
দিলীপ কুমার রায় - ৩৯
দিব্যেন্দু পালিত - ১২৪
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - ১২৪
দেবেশ রায় - ১২৪
ন
নকশাল - ২৯, ৩৪, ৮৯, ১৩১, ১৭৮
নরেশ সেনগুপ্ত - ৩৯
নূরজাহান - ৩৬, ৩৭
ন্যাশনাল আয়রন এণ্ড স্টিল কোম্পানি - ৯, ১১৪, ১২৫, ১৩৩
ন্যাশনাল লাইব্রেরি - ১৩৫
প
প্রতাপাদিত্য - ১১১
প্রফুল্ল চন্দ্র সেন - ৩৯
প্রফুল্ল রায় - ১২৪
প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া - ৩৯, ১৫৩
প্রেমেন্দ্র মিত্র - ১১৪
ফ
ফৈয়াজ খাঁ - ১৪৯
ব
বঙ্কিম ঘোষ - ৩৯
বরেন গঙ্গোপাধ্যায় - ১২৪
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় - ৪

বিধানচন্দ্র রায় - ১
বিবেকানন্দ - ৯৩
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - ৪, ৩৯, ৬৫, ১৫৩
বিশ্ব হিন্দু পরিষদ - ১৫২
বেগম আখতার - ১৪৯
ভ
ভবানী সেন - ১১৭
ভারতচন্দ্র - ১১১
ভীষ্মদেব - ১৪৯
ম
মতি নন্দী - ১০৯, ১২৩
মদন বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৭
মদনমল্ল - ১১১, ১১২
মনোজ মিত্র - ১২৬
মহঃ আলি জিন্না - ৩৯
মহঃ রফি - ১৪৯
মানসিংহ - ১১২
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী - ২৫
মুজফ্‌ফর আহমেদ - ৩৯
মুসলিম লিগ - ১, ৩৯, ৪০, ১৫২
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী - ১, ৩৯, ১৫২
মৌলনা আক্রম খাঁ - ৩৯
য
যতীন চক্রবর্তী - ১৩৭
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ - ৯৩
র
রবীন মজুমদার - ১৪৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ১, ৪, ৩৫, ১৪১
রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব - ১৩৭
রাজাকার - ১৩
রামকিঙ্কর বেইজ - ৫৩
রুজভেল্ট জেটি - ১৩২
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত - ১২৬
শ
শচীনদেব বর্মন - ১৪৯
শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় - ১২৪
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - ৪
শরৎচন্দ্র বসু - ৩৯
শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় - ১২৪
শঙ্কর মুখোপাধ্যায় - ১১৯
শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৪৫
শালগ্রামশিলা - ৩৪
শাহাজাদা পরভেজ - ৩৭
শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় - ১১৯
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় - ১২৩
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় - ১৩৫
স
সজনীকান্ত দাশ - ৩৯, ১৫৩
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় - ১২৩, ১৬৪
সন্তোষকুমার ঘোষ - ১১৪, ১৩০, ১৩১, ১৩২

সুকুমার দে সরকার - ১৮০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - ১২০, ১২৩, ১২৪, ১৩০
সুভাষচন্দ্র বসু - ৩৯, ১৫১, ১৫২
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ - ১৭, ১২৪
সোহরাওয়ার্দি - ৩৯
হ
হরেকৃষ্ণ কোঙার - ১১৭
হিটলার - ১৭৮
হিন্দুস্থান ল্যাটেক্স লিমিটেড - ১৩৬
হেওয়ার্ড - ১৩০
হেমেন্দ্র কুমার রায় - ৩৯, ১৫৩
হেস্টিংস - ৪৫

ISSN - 2319 1287

আর্জব

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৯

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির এক নবদিগন্ত

(ষাণ্মাসিক)

সম্পাদনা

সহদেব রায়

রঞ্জিত বিশ্বাস

আর্জব

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির এক নবদিগন্ত

(ষাণ্মাসিক)

সম্পাদনা

সহদেব রায়

রঞ্জিত বিশ্বাস

আর্জব গবেষণা পরিষদ

ই-৯৪, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আবাসন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং-৭৩৪০১৩

ARJAB

BHASA SAHITYA SAMSKRITIR EK NABODIGANTA

Published by Arjab Gabesana Parisad 2019

ISSN - 2319 1287

প্রকাশক :

আর্জব গবেষণা পরিষদ
ই-৯৪, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আবাসন
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং-৭৩৪০১৩

প্রচ্ছদ :

সুজিৎ রায়, শিবমন্দির, দার্জিলিং

প্রাপ্তিস্থান :

প্রতিভালয়, বুক্‌স ফর ইউ ,
রাইটস্ পেন ইমপ্রেসন (শিবমন্দির, শিলিগুড়ি),
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ (কোলকাতা)।

অক্ষর বিন্যাস :

সুজিৎ রায়, শিবমন্দির, দার্জিলিং, ৯৬৪১৫৩৭৩২৬

বিনিময় : *৭৫ টাকা মাত্র*

আর্জব

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির এক নবদিগন্ত

(ষাণ্মাসিক)

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৯

পৃষ্ঠপোষক

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

অধ্যাপক সুবোধকুমার যশ (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

অধ্যাপিকা সত্যবতী গিরি (বাংলা বিভাগ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

অধ্যাপক লায়েক আলি খান (বাংলা বিভাগ; বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়)

অধ্যাপক রবিন পাল (বাংলা বিভাগ; বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ; কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

অধ্যাপক সৌমিত্র বসু (নাট্য বিভাগ; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

মীর রেজাউল করিম (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. নিখিলেশ রায় (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. দীপককুমার রায় (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. উৎপল মণ্ডল (বাংলা বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. তাপস কুমার চট্টোপাধ্যায় (অধিকর্তা, দূরশিক্ষা অধিকার, উত্তরবঙ্গ *বিশ্ববিদ্যালয়*)

সহযোগী সদস্যবৃন্দ

ড. রাত্রি নন্দী, অমর পাল, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, অরুণকুমার সাঁফুই, গৌতম দাস, সাবলু বর্মণ, মৃণালকান্তি দাস, তপনকুমার বিশ্বাস, নির্মল দাস, বিশ্বজিৎ রায়, বিপ্লবকুমার সাহা, কামনা মজুমদার, মুস্তাফা আলম, শেখর সরকার, শিমুল সরকার, কুন্তল সিনহা, গোপেশ রায়, নকুলকুমার বিশ্বাস, সমীর দাস, সুবীর বসাক, পার্থসারথী ঘোষ, দিলীপ হাজরা, সনাতন বিশ্বাস

সম্পাদকীয়

সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, মননশীল প্রধান ও নবীন গবেষক, প্রাবন্ধিকদের নিয়ে আর্জবের পথ চলা শুরু। চিন্তাশীল মানুষের ভাবনা-শক্তিকে সকলের সামনে তুলে ধরে সাহিত্য রুচি সম্পন্ন মানুষকে আর্জব চেয়েছিল নিজের অঙ্গনে নিয়ে আসতে। কিংবা বলা যায় আধুনিক মননশীল মানুষকে আবিষ্কার করা বা গড়া আর্জবের ব্রত কথা। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আর্জব তার খেই হারিয়ে ফেলেছিল। টালমাটাল অবস্থা থেকে আর্জবকে উদ্ধার করে পুনরায় আর্জব তার যাত্রা আরম্ভ করেছে।

পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রাগাধুনিক ও আধুনিক দুটি বিষয়ের নিবন্ধ রয়েছে। প্রাগাধুনিক নিবন্ধ কয়েকটি ভাবুকের ভাবনা চিন্তাকে তরান্বিত করবে বলে আশা রাখি। আধুনিক নিবন্ধগুলিতে উঠে এসেছে বঙ্কিম, তারাশঙ্কর, প্রফুল্ল রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দীপক চন্দ্র থেকে অভিজিৎ সেন ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের সৃষ্টি কর্মের বিষয়বস্তুর নানা দিক। নিবন্ধগুলি যুক্তি নির্ভর ও মৌলিকতার দাবি রাখে।

সম্পাদনা পরিষদ, সহযোগী সদস্যবৃন্দ পুনরায় যেভাবে এই পত্রিকায় সম্পাদনার সুযোগ করে দিয়েছে, তাদের প্রতি ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। এই পত্রিকা আগামী দিনে সাহিত্যপ্রেমী মানুষের রুচির অভাব পূরণ করবে বলে আশা রাখি।

সম্পাদক
সহদেব রায়
রঞ্জিত বিশ্বাস

সূচীপত্র

বৈষ্ণবীয় ভক্তি-ভাবুকতা ও পৌরাণিক প্রসঙ্গের নিরিখে ঘনরামের
শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য
সুমন দাস # ১

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও উত্তরণের প্রয়াস
গোবিন্দ্র বর্মন # ১০

প্রসঙ্গ : বাংলা বৈষ্ণব সহজিয়া কবি সম্প্রদায়
দিবাকর অধিকারী # ১৮

কোচ-কামতা রাজ্যের গীতি-রামায়ণের কবি দুর্গাবর : একটি অনুসন্ধান
বিনয় বর্মন # ২৫

বঙ্কিম উপন্যাসে নদ-নদী
গোবিন্দ রায় # ৩৭

মৃত্যুর অমৃত ধারায় তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন'
ড. বিকাশচন্দ্র পাল # ৪৫

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে দেশভাগ
জয়শ্রী বিশ্বাস # ৬০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' : যৌন-মনস্তত্ত্বের এক
নিবিড় আলেখ্য
মঃ মহব্বত আলী # ৬৫

অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড়' : বাজিকরদের জীবন ও বৃত্তি
মহাদেব মণ্ডল # ৭২

মধ্যবিত্তের জীবনে সম্পর্কের অবক্ষয় : 'জলপাইহাটি'
মৃণাল কান্তি রায় # ৮০

হাজার বছরের বাংলা কবিতা : প্রসঙ্গ বুদ্ধচর্চা
অমর চন্দ্র রায় # ৯১

দীপক চন্দ্রের মহাভারতকেন্দ্রিক উপন্যাস : বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণের সন্ধানে
দীপঙ্কর সরকার # ৯৭

'সমুদ্র' : নিস্তব্ধতার সংলাপে দার্শনিক জিজ্ঞাসা
হৈমন্তী বর্মন # ১০৫

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি
অর্পণ রায় প্রামাণিক # ১১৭

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি

অর্পণ রায় প্রামাণিক

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনকে যতটুকু দেখেছেন, জেনেছেন; সেটুকু খুব নিবিড়ভাবে দেখা ও জানা। আর সেই অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে গড়ে উঠেছে তার উপন্যাসগুলোর জগত। আর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো যেন লেখকেরই বিভিন্ন সত্তার বিভিন্ন রঙে রাঙানো। তাই এত সজীব ও সরস। এই চরিত্রগুলো ঘিরেই প্রকাশিত হয়েছে লেখকের জীবন-ভাবনা বা জীবনদৃষ্টি। জীবনদৃষ্টি বলতে এখানে আমরা বুঝিয়েছি, জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব ও উপলব্ধি। লেখক বলেছেন, "আমার মনে হয় শিল্পের বিষয় হল: সংশয় । আর ভক্তের বিষয় হল: সমর্পণ-নিবেদন। এই দুটি দু'রকমের জিনিসের ভেতর সংশয় নিয়েই সারা পৃথিবীর শিল্পের ইতিহাস। আমাদের আগে— আমাদের সময় এবং আমাদের পরেকার যাঁরাই লিখতে এসেছেন তাঁদের ভেতর শতকরা ৯৯ জন এই সংশয়ে দুলতে দুলতেই লিখে চলেছেন। শিল্প কোন মীমাংসা নয়। শিল্প একটি দোলাচল তর্কের ভেতর ছিন্ন-দীর্ণ হতে হতে যা পাওয়া যায় তাই।"[১]

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই সংশয়ী মন নিয়েই জীবনকে ভালোবেসেছেন। মানুষকে দেখেছেন। জগৎকে বুঝেছেন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যত খনন করেছেন, এক পৃথিবী-বিস্ময়ে তাঁর হৃদয় ভরে গিয়েছে। তখন তিনি আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে আরো খনন করেছেন। যা পেয়েছেন, সেই প্রাপ্ত সম্পদে তিনি ক্রমাগত ধনী হয়েছেন। এই জীবন ও জগৎ যেন লেখককে চেয়েছিলো, তাই মানুষ ও প্রকৃতি যেন বৈচিত্র্য-সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছিলো তাঁর কাছে। আর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আপাদমস্তক দিয়ে চেটেপুটে তার স্বাদ গ্রহণ করেছেন। এভাবেই লেখকের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন, "দেখার দৃষ্টি থেকে আপনা-আপনি জমা হতে হতে যদি লেখকের কোন দার্শনিক ভাবনার পত্তন না হয়— ... তবে তাঁর লেখা যতই নিপুণ হোক-যতই অভিনব হোক— তা আপনাআপনি নড়বড়ে হয়ে যাবেই— তলিয়ে যাবেই।

এই দার্শনিক ভাবনা তখনই একজন লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে জেগে ওঠে— যখন তিনি মানুষ হিসেবে বারংবার নিজের বিশ্বাসের জায়গা হাতড়ে চলেন— নিজেকে ভাঙেন— খুঁজে বেড়ান— নিজেকে নিশ্চিহ্ন করার ঝুঁকি নিয়ে— নিজেকে দৈবী অতৃপ্তির—

অস্থিরতার শিকার হতে দিয়ে— ঘাম ঝরিয়ে কোনও ভাবনার অধিকারী হন।"[২] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের ইতিহাস বলে, এই কাজগুলো তিনি হৈ হৈ করে করেছেন। আমরা এই প্রবন্ধে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' (১৯৭৭), 'অনিলের পুতুল' (১৯৬২) ও 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭) উপন্যাসের নায়ক চরিত্রে প্রতিফলিত লেখকের জীবনদৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করব।

ছদ্মবেশে ক্রমাগত ধুঁকছিলো 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রমথ দত্ত। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় গতিময়তার যুগে আমরা নিজেদের চেতনে বা অবচেতনে নিজেরাই ধুলো দিয়ে চিত্র বিচিত্র ছদ্মবেশ তৈরি করে ফেলি। তারপর শুধু সেই ছদ্মবেশ ধারণ করে জীবনের রাস্তায় চলে ফিরে বেড়ানো। এক ধরণের মিথ্যে মজা তখন সঙ্গী হয়। পেছনে ফিরে নিজেকে নিয়ে ভাবার অবকাশ মেলে না। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা প্রমথ দত্তের বা এইরকম মুষ্টিমেয় মানুষের। ছদ্মবেশের সুতোগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত অক্ষত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সেই ছদ্মবেশের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

প্রমথ দত্ত একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারে বড় হয়ে উঠেছে। সাধারণ বাঙালি নিম্ন-মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবার প্রদত্ত সংস্কার, মূল্যবোধ, বিশ্বাস তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যতই সে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে, পিছলে পিছলে গিয়েছে এই বিশ্বাসগুলো। ফলে আমাদের 'শায়ক মনোবৃত্তি' ছদ্মবেশ তৈরি করে। কারণ এই বিশ্বাসগুলোতে তিক্ত শর নিক্ষেপ করেই আমরা সাময়িক শান্তি পেতে চাই। যেভাবে প্রমথ দত্ত সাময়িক শান্তি পাচ্ছিলো। তার বর্তমান জীবনশৈলী তাকে ছদ্মবেশের পোষাক তৈরি করে দেয়। কিন্তু এই পোষাকের যে মজা সে অনুভব করছিলো, ধীরে ধীরে তার ভিতরে থাকা মিথ্যা বড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দেয় তার সামনে। ফলে, পরিবারের প্রত্যাশা কাঁধে নিয়ে, অনেক নারীসঙ্গ লাভ করে কর্মহীন প্রমথ ধুঁকতে থাকে। সে চেষ্টা করে নিজেকে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। সে চেষ্টা করে পরিবারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে। সে চেষ্টা করে সত্যিকারের ভালোবাসায় পড়তে। সে চেষ্টা করে নিজের বিবেকের কাছে সৎ হতে।

কিন্তু তার কোনো চেষ্টাই সেভাবে ফলপ্রসু হয় না। কারণ আমাদের মনে হয়, প্রমথর ইচ্ছাশক্তির অনেকটা অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। কারণ প্রমথ দত্ত ততদিনে সহজলভ্য শান্তি, সুখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই সহজলভ্যতা ও সাময়িকতা মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে শুষে নিতে পারে। ব্যক্তি মানুষের এই সংকট মানুষকে আরো সংশয়ী করে তোলে। এই সংশয়ী মন নিয়ে তখন সে যেখানেই যায় অভ্যস্ত হওয়া মজার স্বাদ পান্‌সে লাগে। যেমন লাগছিলো প্রমথ দত্তের। এই স্বাদ পান্‌সে হওয়া অনিবার্য ছিলো। কারণ ভিত্তিমূলেই রয়েছে কৃত্রিমতা, মিথ্যা। আবার যেখানে শুধু জৈবিক চাহিদা মেটানো একমাত্র উদ্দেশ্য, তার মজার স্বাদও পান্‌সে হতে বাধ্য। তাই বর্তমানে সুধার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্কে

(ভালোবাসার নয়) উন্মাদনা আর তেমন নেই। কিন্তু দীর্ঘদিনের মেলামেশার অভ্যেস এবং মিথ্যা মজা পাওয়ায় (সহজলভ্য) অভ্যস্ত হওয়া প্রমথের আলস্য তাকে পুরোপুরি সত্যের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে সাহস দেয় না বা পায় না। এজন্য প্রমথ নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয়, ''... সে সুধাকে ভালবাসে। মুশকিল হয় সুধার দিকে তাকালে । বমি আসে। প্রমথ তখন মনে মনে বারেবারে আওড়ায়, সুধাকে ভালবাসি। আমি সুধার লাভার। সুধা একা।''[৩] ভালোবাসার অন্বেষণে থাকা প্রমথর দৃষ্টি পড়ে অঞ্জুর (সুধার ছোট বোন) দিকে। কিন্তু সেখানেও সে ব্যর্থ হয়। কারণ ভালোবাসতে না পারাটাই এখন প্রমথর কাছে অভ্যেস হয়ে গেছে। জৈবিক চাহিদার কাছে মাথা নত করা অভ্যেস হয়ে গেছে। প্রমথর সহজ স্বীকারোক্তি, ''প্রমথ অঞ্জুকে ভালোবাসে না। এমন কী অঞ্জুকে তার ভালও লাগে না। ... তবু কিছু রহস্য আছে অঞ্জুর। এমন আন্তরিকভাবে ঠোঁট টিপে চোখ মটকায় যে ভীষণ লেপ্টে থাকতে ইচ্ছে করে।''[৪]

অন্যদিকে বাঙালি ঘরের তথাকথিত আইবুড়ো মেয়ে সুধার প্রমথকে আটকে রাখার ঐকান্তিকতায় প্রমথ কষ্ট পায়, হাঁসফাঁস করে। তাই যতটা সম্ভব সে সুধাকে ভালো না বাসাটা ঢেকে রাখতে চায়। ঢেকে রাখতে গিয়েই তাকে চুপ করে থাকতে হয়। কারণ কথা বললে নিজের অজান্তেই যদি নিজের প্রকৃত মনোভাবটা সুধার সামনে ফুটে ওঠে। তাছাড়া বেকার প্রমথের অনেক খুচরো প্রয়োজনে অর্থের জোগান দেয় চাকুরিজীবি সুধা। ফলে ক্রমশ প্রমথর সঙ্গে সুধার এক কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রমথর দিক থেকে এই কৃতজ্ঞতা অর্থের আর সুধার দিক থেকে ভালো বর পাওয়ার প্রত্যাশায়।

এই পরিস্থিতি প্রমথর অস্তিত্বের সংকটকে আরো গভীর করে তোলে। সুধা তার জীবনে প্রথম নারী নয়। নারী অনেক ভাবেই প্রমথর কাছে ধরা দিয়েছে। ফলে এখন যেন সে ছদ্মবেশে ধুঁকতে শুরু করেছে। নিজের তৈরি বানানো ধারণাগুলো যখন নিজেকেই বিদ্রুপ করতে থাকে, সমস্ত প্রচেষ্টার যোগফল হিসাবে শূন্য একটি প্রশ্নের আকারে নিজের সামনেই ঝুলতে থাকে; তখন প্রতি পদে পদে নিজের মধ্যে অন্য একজনের কাছে হারতে হারতে প্রমথ যেন অপেক্ষায় থাকে নতুন সতেজ, সবুজ শস্যভূমি আবিষ্কারের। কারণ সমাজের প্রাণহীনতা, স্থবিরতা তাকে শুষ্কতায় তলিয়ে নিয়ে যায়। ব্যক্তিসত্তার সংকটের দ্বন্দ্ব কখনো একতরফা হতে পারে না। তাই প্রমথ নিজের সম্পর্কে নিজের উপলব্ধিগুলো বাঁচিয়ে রাখে লড়াই করার জন্য। এটা যেন অনেকটা খ্রিষ্টীয় রীতিতে নিজের কাছে নিজের কনফেশন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দেখেছেন মানুষ সংকটের সময় এভাবেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

সুধা বা অঞ্জু নয়, প্রমথ আরো অনেক মেয়েদের (ইন্দিরা, কনসিডারেট) সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে। এরপরেও ভালোবাসা মরীচিকা হয়েই থেকেছে প্রমথর কাছে।

এইসব সম্পর্কের সেতু পেরিয়ে তার উপলব্ধি, ''কাউকে ভালবাসি না। ভালবাসার ক্ষমতা নেই আমার। শুধু চাকরিই প্রতিবন্ধক না। আমি আমার প্রতিবন্ধক। জান্তব ধস্তাধস্তিতে, সাময়িক জড়াজড়িতে আমি স্থির হই— ঘন মুহূর্তের স্বীকৃতিতে আমি প্লুত হই। এমন কী শারীরিক ঘষাঘষিতে পুরুষার্থ অর্থবহ হয়— কিন্তু তবুও আমি নপুংসক।''[৫] এই নপুংসকতার (শারীরিক নয়, মানসিক) জন্ম হয় কৃত্রিমতা থেকে। কৃত্রিম মজা কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মহাভারতের অর্জুনের বৃহন্নলার ছদ্মবেশ যেমন অর্জুনের মূল রূপকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছিলো, তেমনি আধুনিক যুগের মানুষ প্রমথ দত্তের বৃহন্নলার ছদ্মবেশ তার প্রকৃত রূপকে আচ্ছাদিত করে দেয়। ভালোবাসাহীন শারীরিক ঘষাঘষি এভাবেই আমাদেরকে নপুংসক করে তুলছে।

প্রমথ দত্ত নিজের চোখে মহিষের কাজল অনুভব করে। খুব অন্ধকার সেই কাজলে আঁসটে গন্ধ। প্রমথর চোখ লাল হয়, ফলে সে যা দেখে তাই লালচে। দেখেই ফুলে ওঠে ঘোঁত ঘোঁত করে এগোয়। কিন্তু কেন? এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের কিছু লাইন পড়া যেতে পারে। সত্যচরণ নিজের সম্পর্কে বলছে, ''এই তিন বছরে আমার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতি কি মায়া-কাজল লাগাইয়া দিয়াছে আমার চোখে— শহরকে একরকম ভুলিয়া গিয়াছি।''[৬] এখানে বন্যপ্রকৃতি সত্যচরণের মনে এত প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তার মনে হচ্ছে বন্যপ্রকৃতি তার চোখে মায়া রূপ কাজল পরিয়ে দিয়েছে। ফলে তার দৃষ্টি শুধু লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতির ওপর নিবদ্ধ।

আমাদের প্রমথ দত্তের চোখের কাজল আরো গাঢ়। এজন্য হয়তো লেখক মহিষের চোখের কাজল বলেছেন। কারণ মহিষের গায়ের রঙ এমনিতেই কালো। তাহলে চোখের নীচের রঙ কতটা গাঢ় হলে তাকে কাজল হিসাবে স্বতন্ত্র চিহ্নিত করা যেতে পারে। তৎকালীন কলকাতা নগরের সমাজ-বাস্তবতা তার চোখে এই মায়া রূপ কাজল লাগিয়ে দিয়েছে। এই সমাজ-বাস্তবতার কদর্যতা, লুকানো ক্ষত, হারিয়ে যেতে বসা বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নিজের ভেতরে চলা দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা চোখের কাজলকে আরো অন্ধকার করে তোলে। আবার নিজের জৈবিক চাহিদা মেটানোর নেশায় তার চোখ লাল হয়। এই নেশায় মাতোয়ারা হয়ে যখন সে সমস্ত কিছু দেখে তখন সেগুলি নেশার বস্তুই মনে হয়, তাই সব লালচে। তা পাওয়ার উদগ্র বাসনায় শুয়োরের মত সমস্ত পাঁক ঘেটে সে ঘোঁত ঘোঁত করে এগোয়। থলথলে সমাজের এই স্থবিরতায় প্রমথ সুগন্ধ পায় না বলেই তার কাজলে মাছের আঁসটে গন্ধ। এতকিছুর পরেও প্রমথ দত্তের মনে ক্ষীণ আশা কাজ করে যায়। তাই সে মেয়েদের বুকের কাপড় সরিয়ে একখানি গ্রাম্য শস্যভূমি বা ওই জাতীয় সতেজ, জীবন্ত, নবীন কিছু দেখার আশা করে। সে সাজানো প্রেমে নয়, ভালোবাসায়

পড়তে চায়।

বিভিন্ন সম্পর্কের মিথ্যার ক্লেদ গায়ে মাখে বলেই হয়তো সে সর্বক্ষণ বিবেকের দ্বারা দংশিত হয়। লেখক জানাচ্ছেন, ''খুব সাবধানে সে মনের মধ্যে একটা সাপ পোষে। সাপটা অন্য কাউকে কামড়ায় না। নিজেকে অষ্টপ্রহর কামড়াচ্ছে। নীল আরও নীল করে দিচ্ছে।''[৭] এই সাপকে এখানে আমরা যৌনতার প্রতীক হিসাবে ধরতে পারি। প্রমথ নিজের যৌনবাসনায় নিজেই দংশিত হয়। তারপরেও সে আত্মহত্যার কথা ভাবতে পারে না। তার নিজের এক দাদা (তনু) আত্মহত্যা করেছিলো। এই ঘটনার প্রভাব প্রমথর ওপর গভীরভাবে পড়েছিলো। তার থেকেই সে বুঝতে পারে এই রাস্তা সমাধানের নয়। বেঁচে থাকার সহস্র প্রতিকূলতাই তাকে আরো বেশি করে জীবনমুখী করে তোলে। কারণ সে বুঝতে পারে, ''এখান থেকে একবার চলে গেলে ইচ্ছে হলেই আর ফিরে আসা যায় না। প্রমথ অনেকদিন বাঁচতে চায়।''[৮] ছদ্মবেশের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রকৃত স্বরূপে বাঁচা। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মানুষের ইচ্ছাশক্তির ওপর খুব জোর দেন। এই ইচ্ছাশক্তিই জীবনের বিপুল রহস্যের স্বাদ নিতে উন্মুখ করে তোলে মানুষকে। তখন ক্রমাগত খনন কখনো ক্লান্ত করে ফেলে না মানুষকে।

অক্লান্ত খনন প্রমথ দত্তকে সন্ধান দেয় বন্ধু নীতিশের শ্যালিকা বীথির। নিম্নবিত্ত পরিবারের পিতৃহীন মেয়ে বীথি। জামাইবাবুর সাহায্যে ও দাদার সংসারে সে বড় হয়ে উঠেছে। নিজের পরিবারের সমস্যা ও নিজের সমস্যা মিলে তার ব্যক্তিত্বকে যেন আরো সুদৃঢ় করে তুলেছে। এজন্য হয়তো সমাজের পঙ্কিলতার মধ্যে থেকেও নিজের গায়ে কখনো পাঁক লাগতে দেয়নি। এই বীথি প্রথম প্রমথর ছদ্মবেশের সুতোতে টান ধরায় তার আচরণে, স্বভাবে কিংবা ব্যক্তিত্ব দিয়ে। প্রমথর উপলব্ধি, ''যেন কোথায় হেরে যাচ্ছে।''[৯] এই হেরে যাওয়াটা আসলে প্রমথ যে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলো; সেটার পরাজয়, যে সাপটা সে মনের মধ্যে পোষে, তার পরাজয়। ''আজ এই প্রথম মনে হল, বীথি নামের এই মেয়েটি যেখানে যেভাবে আছে থাকুক।''[১০] তাই বীথির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক হয়, সেটা প্রেমের নয়, ভালোবাসার। আর সত্যিকারের ভালোবাসার স্বাদই তাকে ছদ্মবেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসার শক্তি জোগায়। ''বীথির কাছে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে। আমার অনেক রকম ইচ্ছে হয়। এই শরীরের থেকে বেরিয়ে আসতে চাই।''[১১]

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনকে দেখেছেন জীবনের সবকিছু নিয়ে। লৌকিক ভাব সাহিত্যে পরিবেশিত হলে তা রসে পরিণত হয়। এই রস সর্বদা আনন্দদায়ক। অনেকটা এইরকমভাবে লেখকও মনে করেন জীবনের প্রতিকূলতা, নেতিবাচকতা, সংগ্রাম শেষপর্যন্ত রস-ই উদ্‌গীরণ করে। এই রসাস্বাদনের ইচ্ছাই প্রমথকে জীবনের পথে আবর্তিত করে। উদ্ভিদ যেমন যে মাটিতে বা জায়গায় অঙ্কুরিত হয়, সেই মাটি বা জায়গা থেকেই

(যতই শুষ্ক হোক না কেন) খাদ্যরস শুষে নিয়ে বেঁচে থাকে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা সেরকম প্রাপ্ত জীবন, পরিস্থিতি স্বীকার করেই জীবনের স্বাদ চেটেপুটে নিতে চায়। প্রমথর স্বগত উচ্চারণ, ''কোনও নতুন জায়গা বোধ হয় নেই। অন্য কোনো গঙ্গাও নেই। যে পথেই ঘুরি না কেন, কলকাতা ঠিক পেছনে আছে— অন্যদিকে যায় না।''[১২]

লড়াইয়ের প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই হচ্ছিলো। এবার সময় হয়েছে, ''... ধুলোর চিত্রবিচিত্র পোশাকটার আকর্ষণ তুচ্ছ করে সত্যির সামনে নিঃসহায় উলঙ্গ হয়ে''[১৩] দাঁড়ানো। এরই পদক্ষেপ হিসেবে বীথির সামনে (বিয়ের পর) নিজের কামবাসনা, লোভ ইত্যাদি উলঙ্গ করে তুলে ধরে। এভাবে যদি আবার নতুন করে শুরু করা যায়, পাঁক-লাগা শরীরটা, কাজলে মাছের আঁসটে গন্ধটা মুছে ফেলে যদি নতুন মানুষ হওয়া যায়। এক্ষেত্রে বীথিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু লেখক জানেন, মানুষ সামাজিক জীব হয়েও শেষপর্যন্ত সে একা। লড়াইটা প্রমথকে একাই করতে হবে। কারণ, ''তখন এসব পাতানো সম্পর্কের মধ্যে হিসেব না মিটলে কেউ কারও না। কথাগুলো কী সত্যি— কী দয়ামায়াশূন্য।''[১৪] এই লড়াই যেন বীথির সঙ্গেও। নতুন জীবনে নতুন পাতানো সম্পর্কে নতুন করে যেন কোনো ছদ্মবেশ তৈরি না হয় কিংবা বলা যেতে পারে অজ্ঞাতবাস ছেড়ে এসে আবার কোনো যেন অজ্ঞাতবাসে যেতে না হয়।

জীবনে এই চলার পথে যদি মৃত্যু আসে— সেটাও নিছক আসার জন্য আসা। আসাটা নেহাতই অনিবার্য, নাহলে ''মৃত্যুটা প্রায় থিয়েটার টিকিট। ভিড় দেখলে কিংবা সময় না থাকলে বেঁচে দেওয়ার মত নিশ্চিন্ত ব্যাপার।''[১৫] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা সবসময় কোনো এক আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। আর মনে হয় এই আবিষ্কারের নেশাই তাদেরকে জীবনের পথে ধরে রাখে। কিসের আবিষ্কার? আমাদের এই ছকে বাঁধা গতানুগতিক জীবন-প্রবাহে বেঁচে থাকার স্বাদ। যে স্বাদের ভাগ ইচ্ছে থাকলেও অন্য কাউকে দেওয়া যায় না। কারণ তা ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধি। এই উপলব্ধ অনুভূতিই মানুষকে শত প্রতিকূলতা, নিশ্চিত পরাজয়কে অস্বীকার করতে শেখায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসে আমরা তাই দেখি।

অনিলের স্বল্প আয়ের নিশ্চয়তা থাকলেও পরিবারে প্রতিকূল পরিস্থিতি তাকে মানসিকভাবে বিপন্ন করে তোলে। তার পরিবারের এই আর্থিক চাহিদা ভোগ-বিলাসের জন্য নয়, অসুস্থতার জন্য। বাবার অসুখ, মায়ের পাথুরি রোগের অস্ত্রোপচার সফল না হওয়া এবং নিজের বউ পুতুলের মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়া; পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘদিনের এই শারীরিক অসুস্থতা— অনিলের মানসিক দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপন্যাসের সূচনাটাও ইঙ্গিতবহ। অনিলের সবচেয়ে বড় মাসি তরঙ্গিনীর আসন্ন মৃত্যু সম্ভাবনার খবর দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে মৃত্যু, অসুখ, ডাক্তার, ওষুধ নিয়ে লেখকের

সৃজিত বাস্তবে আমরা প্রবেশ করি।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অনিল রায়চৌধুরী। তার একদিকে যেমন সামান্য রোজগার, অন্যদিকে তেমন অসুখের ক্রমশ থিতু হওয়া; অনিলের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার উপর আস্তরণ ফেলে দেয়। এই আস্তরণ ভয়ের। অনিল এই আস্তরণ গায়ে ফেলেই যেন প্রাত্যহিক জীবনে চলাফেরা করে। এই ভয় সৃষ্টি হয়েছে অসুখ থেকে, যা ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে মৃত্যুভয়ে গিয়ে ঠেকেছে। তাই পুতুল যখন বলে, ''তোমার অত ভয় কেন বলত?'' তখন অনিলের উত্তর, ''ভয় কি সাধে হয়। সব বুঝিয়ে বলাও যায় না... মোট কথা পৃথিবীটা খুব অনুকূল জায়গা না নিশ্চয়। এখানে পথ, ট্রাম লাইন, শিব মন্দির, বটগাছ তবু বেশিদিন টেকে— কিন্তু অনিল, নরেশ, সেজোর দম ফুরোলেই শেষ— আর সে দমও গভর্নর দিয়ে লরির স্পিড বেঁধে দেওয়ার মতো— লিমিডেট।''[১৬]

ভয়ের ভিতরে সে এমনভাবে সেঁধিয়ে গেছে যে, নিজের মধ্যে কল্পিত রোগের উপস্থিতি অনুভব করে। আসলে অসুখ-জীর্ণ পরিবারে থাকতে থাকতে তার চিন্তা-ভাবনাও অসুখের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। নিজের অসুখ না থাকাটাই অনিলের কাছে অস্বাভাবিক। পুতুলকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসে ভাবে, সেও একদিন না একদিন কোনো একটা রোগে চিরকালের মত তলিয়ে যাবে। ডাক্তারের কাছেও আসতে পারবে না। লেখকও অনিলের বয়স বাড়ার উপমা দেন শারীরিক অসুস্থতার (জ্বর) সঙ্গে তুলনা করে। অফিস ফেরৎ অনিলের ক্লান্তি দূর হয়ে আরাম পায় এভাবে, ''অসুখ বিসুখ, টাটানো ব্যথায় মলম দিয়ে কেমন করে আরাম পেতে হয় এসব নিয়ে কথা বলতে অনিলের আজকাল ভালো লাগে। জ্বর, ব্যথা, পোড়া ঘার জন্য ট্যাবলেট মিকশ্চার ইনজেকশন আছে জেনেই কেমন নিশ্চিন্ত লাগ।''[১৭]

বাস্তব বা কল্পিত অসুখের ঘোরে চলা অনিল বহু বছর বাদে কলেজের বন্ধু গুরুপদের সঙ্গে দেখা হলেও সেই অসুখের ঘোর থেকে বেরোতে পারে না। তাই বন্ধুর সঙ্গে অনিলের কথোপকথনের পুরোটা জুড়ে থাকে অসুখের কথা— কেবল অসুখ। এই ঘোর সম্পর্কে খুব সতর্ক বা সচেতন না থাকলে অসুখের ঘোরই অনিলের মনের চিন্তা— ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই অনিলের একসময় মনে হতে থাকে, জীবনে অসুখ ব্যতিত আর কোনো ঘটনাই যেন ঘটছে না। এই ঘটনা-বিরল বোধ অনিলের মধ্যে সৃষ্টি করে স্মৃতি-আকুলতা। স্মৃতি-আকুলতা যেন তাকে সাহায্য করে অসুখের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে। ''কতদিন আগে ছোট ছিলাম। সেখানে ফিরে যাওয়া যায় না। সেখান থেকে এখন আরম্ভ হলে এই এখন অনেক দেরিতে আসত।''[১৮] বর্তমানের অসহনীয় বাস্তবতা থেকে এক ধরণের সাময়িক মুক্তি পায় অনিল এভাবেই। তবে শুধুমাত্র অসুখ অনিলকে ক্লান্ত করে না। পুতুলের সঙ্গ তার জৈবিক চাহিদা মেটাতে পারে না। সুখী যৌনজীবন

মানুষের অনেক সমস্যার চিন্তাকে লঘু করে দেয়। কিন্তু অনিল অনেক চেষ্টা করেও তা পায় না। এর পিছনেও অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে পুতুলের মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়া। ফলে বাস্তব বা কল্পিত অসুখ, ওষুধ, স্মৃতি-আকুলতা, দৈহিক ক্ষুধা, স্বল্প আয় ইত্যাদি অনিলকে ধীরে ধীরে আরো নিঃসঙ্গ করে তোলে।

অনিলের সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, এর মূলে রয়েছে অর্থের অভাব ও যৌন অতৃপ্তি। স্বল্প বেতনের চাকুরি তাকে পরিবারের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেও পরিবার ও নিজের অন্যান্য চাহিদাগুলোকে সীমায়িত করে দিয়েছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব-অনটনই অনিলকে এত ভীতু করে তুলেছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আর্থিক চাহিদার সঙ্গে অর্থ জোগানের এই অসামঞ্জস্যতা অনিলের সমস্যাগুলোর অন্যতম কারণ। এই কারণ কিছুটা লঘু হতে পারত সুখী যৌনজীবনে। এক্ষেত্রে পুতুলের অসুস্থতা, সারাদিন অসুস্থ মানুষদের পরিচর্যা, সংসারের পরিশ্রম পুতুলকেও ক্লান্ত করে তোলে। ফলে পুতুল সেভাবে কোনোদিন সহযোগী হয়ে উঠতে পারে না অনিলের যৌনজীবনে বা তার বিপন্নতায়। অনিলের অর্থচিন্তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো—

ক. "... কিন্তু মোলায়েম রাখবার জন্যে যে পরিমাণ টাকা থাকা দরকার তা না থাকলে মন খুঁত খুঁত করে। ... কিন্তু আমাদের যে আরও তিরিশ বছর থাকতে হবে। এতদিন থাকবার মতো পয়সা দরকার। পয়সা নেই বলে অর্থচিন্তা, মনঃকষ্ট-দুশ্চিন্তা।"[১৯]

খ. "শরীরের যে ফাঁক দিয়ে মৃত্যু ঢুকে পড়তে পারে সেখানে দশটা ডাক্তার আর বস্তা রুপোর টাকা ঢাল করে ফেলে রাখলে ঢুকবার আগে অন্তত কিছুদিন আশেপাশে ঘুর ঘুর করবে মৃত্যু, ইতস্তত করবে।"[২০]

গ. "কলকাতায় টাকা না থাকলে সত্যি ভয় করে। খারাপ লাগে। তার ওপর বড় বড় অঙ্কের টাকা দরকার হলে আরও বীভৎস।"[২০]

কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা হার মানতে শেখেনি। প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়, তারা ভালোভাবেই জানে। আর এই প্রতিরোধ আসে জীবনকে আঁকড়ে ধরার বাসনা থেকেই। প্রতিরোধ-কৌশল বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন রকম হয়। যেমন, অনিলের দাদা নৃপেনের কৌশল, "খুব একটা অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিম্ন শ্রেণীর ধর্ম চাই আমাদের। যার মধ্যে ঢুকলে আর বেরোতে পারব না। ... তখন আর কোনও ভয়ই ঢুকবার পথ পাবে না, এই যেমন টাকা জমাবার ধর্ম,পরনিন্দার ধর্ম, কিংবা যে-কোনও একটা অন্ধ বিশ্বাস ...।"[২২] কিন্তু অনিল জেনে গেছে, আসলে প্রত্যেক বিশ্বাসই অন্ধ। তাই অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভর করে জীবন অতিবাহিত করা মানে জীবনের অনেক দিক সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকা। এজন্য জীবনের অনেক দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে

নয়, জীবনের অনেক দিকে মুখ করেই অনিল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জীবনের অনন্য স্বাদ চেটেপুটে নেবার জন্য অনিল পুনরায় প্রস্তুতি নেয় লড়াই করবার। আর যাদের রসাস্বাদনের ক্ষমতা রয়েছে, তারা লড়াই থেকেও রস শুষে নিতে পারে। অসুখের ঘোর থেকে বেরোবার জন্য অনিল নিজের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষাকেই হাতিয়ার করে তোলে। এই হাতিয়ারগুলোকে শানিত করে তোলে এইভাবে, ''সব দেনা যদি শোধ হয়ে যায়— সব অসুখ লক্ষ করে তাহলে বাছাই বাছাই ইঞ্জেকসন, ট্যাবলেট ছুঁড়ে মারবে। তারপর একদম নিরাময় হয়ে গেলে ফলের রস, মিছরির সরবত, মাখন, মাংস, ঘুম, আদ্দির পাঞ্জাবি এবং ডাবের জল। একেবারে পয়লা নম্বরের সজল, সরস শরীর হয়ে যাবে।

তখন অনিল, পুতুল সেজো প্রথম থেকে আরম্ভ করবে!''[২৩] এই ধরণের ইতিবাচক মানসিকতাই শেষ পর্যন্ত অনিলকে পুতুলের গর্ভের সন্তান নষ্ট করতে দেয় না। পুনরায় উদ্যোগ নেয় মায়ের অসুখ নির্মূল করার।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসের কাহিনির প্রধান চরিত্র নির্বাচিত হয়েছে ছাপোষা একান্নবর্তী নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। লেখকের নিজস্ব পারিবারিক জীবন হয়তো এই বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই এই চরিত্রগুলো যেমন বিশ্বাসযোগ্য, জীবন্ত হতে পেরেছে তেমনি এই চরিত্রগুলোই প্রধান হয়ে উঠেছে লেখকের জীবনদৃষ্টি প্রকাশে। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে কুবের এইরকম একটি চরিত্র। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায়, এক বাড়িতে দীর্ঘকাল চাপাচাপি, গাদাগাদি করে থাকতে থাকতে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো আর একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকবার। কারণ দেবেন্দ্রলাল ঘরে এসে বসতেই তার সব ছেলে একে একে চাকরিতে ঢুকেছে এবং সবাই বিয়ে করেছে। তবে এই প্রয়োজনীয়তা দেবেন্দ্রেলালের সব ছেলের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি অনুভব করে, তিনি হলেন কুবের। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে আর একটু ভালোভাবে থাকবার প্রয়োজনীয়তা কুবেরের কাছে হয়ে ওঠে সাধ-স্বপ্ন।

প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সামর্থ্য । তাই সামান্য কয়েক কাঠা জমি কেনার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় কুবেরকে। অবশ্য পছন্দমত জায়গা কিনতে না পারলেও জমি-জায়গা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয় কুবেরের মগজে ঢুকে যাচ্ছিলো। এই জানার পরিধি ও গভীরতা যত বাড়তে থাকে কুবের তত ডুবে যেতে থাকে বিষয়ের পরিধি ও গভীরে। জীবন ও জগতের অন্যান্য বিষয়গুলো ক্রমশ মনোযোগ হারাতে থাকে কুবেরের কাছে। এই বিষয়ে প্রাথমিক সংশয় তার মধ্যেও ছিলো, ''সত্যিই কি একটু খানি ভালো থাকবার জায়গা বানাতে গিয়ে সে আগাগোড়া বিষয়ে ডুবে যাচ্ছে!''[২৪] এই সংশয়ী মন নিয়েই দল বেঁধে (টাকার জন্য) সে প্রথম জমিটা (এক একর চব্বিশ শতক) কেনে। প্রথম কোনো জমির মালিক হবার তৃপ্তিই তার মন থেকে ধীরে ধীরে সংশয় কাটাতে শুরু

করে। জমির ওপর দখলদারি ও জমির মালিকানা কুবেরকে ততদিনে মানসিক জিহ্বায় অন্য এক জগতের স্বাদ এনে দিয়েছে।

এই স্বাদ তাকে আরো বেশি করে জমি কেনা-বেচার বিষয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এই স্বাদই তাকে বুঝিয়েছে, ''এর নাম ব্যবসা। জমি তো লোকে কম দামে কিনে বেশি দামে ছাড়ে। সবাই তাই করে। এতে আর দোষ কি।''[২৫] জমি কেনা-বেচার হাত ধরে ক্রমশ বাড়তে থাকে কুবেরের স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ও আর্থিক শক্তি (কাঁচা টাকা)। যে প্রয়োজনীয়তা (পরবর্তীতে সাধ-স্বপ্ন) অনুভব করে কুবের জমি কিনতে বেড়িয়েছিলো, সেই প্রয়োজন এখন গৌণ। মানুষ চলার পথে এভাবেই অনেক প্রয়োজনের মুখ বুজিয়ে দেয়। আর একটি প্রয়োজনের অনুভবে লুকিয়ে থাকে বহু প্রয়োজনের সম্ভাবনা। তাই প্রয়োজন ক্রমশ তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলে। অনেকটা প্রাচীন বটগাছের মত। গাছের ডাল থেকে নামা ঝুড়িগুলোই ক্রমশ বটগাছে পরিণত হয়ে যায়। এজন্যই হয়তো বিষয়-আশয়ের প্রতি ক্রমবর্ধমান টান কুবের এড়াতে পারে না। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বিষয়ে জীবনদৃষ্টি খুব স্পষ্ট, ''আসলে মানুষ একদিন জানতে পারে— পৃথিবী জায়গাটা খুব নিরাপদ নয়। মা-বাবা চিরকালের নয়। টাকা-খরচার জিনিস। ফুরিয়েও যায় একদিন। তাই মানুষ বিষয়কে আশ্রয় করে। সেই থেকে— বিষয়-আশয়।''[২৬] উপন্যাসে কুবের ও তার বাবার (দেবেন্দ্রলাল) কথোপকথনে কুবেরের বক্তব্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হতে দেখি, ''... কিন্তু যেদিন আর টাকা আসবে না কুবের— তখন? তখন তুমি কী করবে?'

'সেজন্যেই তো লোকে বিষয়-আশয় করে-খারাপ সময়ে বিষয় থাকলে আশ্রয়ের চিন্তা থাকে না। বিষয় মানুষকে দেখে— আশ্রয় দেয়।''[২৭]

আসলে হয়তো একধরণের অনিশ্চয়তা মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই সঙ্গী। কালপ্রবাহে শুধু রঙ বদল হয় কিন্তু থেকে যায় অনিশ্চয়তা। তাই কুবেরের প্রয়োজনীয়তার সীমানা বৃদ্ধির পথকে অনিশ্চয়তা থেকে নিশ্চয়তা পাবার চেষ্টার পথ হিসাবে দেখতে পারি। একসময়ের ভ্যাগাবন্ড কুবের এখন ড্রিম মার্চেন্ট। এবেলা ওবেলা মানুষের কাছে বিষয়ের স্বপ্ন বিক্রি করে নিজের বিষয়-আশয় বাড়াতে থাকে। কিন্তু এই কুবেরই এই কাজ করতে করতে উপলব্ধি করে, লোভের জিনিস পাবার ক্ষেত্রে যত প্রতিকূলতা কমতে থাকে কিংবা লোভের দ্রব্য যত সহজলভ্য হতে থাকে সেই জিনিসের প্রতি লোভ তত কমতে থাকে। তারপর হয়তো একদম মরে যায়। তাই কুবের নিজের সন্তানের জিনিস নষ্ট করার প্রসঙ্গে বুলুকে বলে, ''খোকনকে ভালো জিনিস নষ্ট করতে দিয়ে যাও— তাহলে দামি জামা, ভালো খেলনা, ছবির বইতে আর লোভ থাকবে না—''[২৮] এভাবেই অনেক লোভ কুবেরের মরে গেছে। যেকোনো মানুষের মরে যায়।

তাই হয়তো অন্য একটি লোভ কুবেরেরকে পুনরায় চাগিয়ে তোলে। এবার ড্রিম মার্চেন্ট কুবের থেকে চকদার কুবের হবার লোভ। ভদ্রেশ্বর এখানে শুধু অনুঘটকের কাজ করে। চকদার হবার লোভে কুবের তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপাবে, এটা প্রায় অনিবার্য ছিল। তাই মেদনমল্লর চরে কুবের প্রায় সব সঞ্চিত অর্থ ঢেলে দেয়। সেও প্রায় পাকাপাকি ঘাটি গেড়ে বসে চরে। তার চোখে তখন একটা লোভই প্রতিনিয়ত দুলতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি মানুষের ভাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সর্বদা চলে না। তাছাড়া সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলো, প্রথম দিকে তার কাজের সঙ্গে যে আনন্দ বা বিস্ময় ছিল তা ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। যে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অর্থ উপার্জন শুরু করেছিলো, মায়ের মৃত্যু সেখানে বড় ধাক্কা দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ভাইয়েদের কুবেরের তৈরি করা বাড়িতে না আসা, বাবার স্থায়ীভাবে না আসা; সূচনালগ্নের সেই প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যকে সমূলে কুঠারাঘাত করে। কিন্তু কুবেরের বিষয়-আশয়ের প্রতি লোভ তাকে বিষয়-আশয়ে নিমজ্জিত করে রাখে। মেদনমল্লের চরে আভা কুবেরের জীবনে এসে তার উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা পুনরজ্জীবিত করে তোলে। এরপর প্রকৃতি তার লীলায় কুবেরের চকদার হবার লোভকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে যায়। অবশ্য এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটার আগে থেকেই কুবেরের বিষয়-আশয়ের প্রতি লোভের রস শুকিয়ে আসছিলো, বিপর্যয় ঘটার পর চকদার হবার লোভে একেবারে ইতি পড়ে যায়।

কুবেরের এককভাবেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটেছিলো। উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটলেও পুরাতন বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি কুবের। সেটা পারাও সম্ভব ছিলো না দু'টো কারণে। এক, পরিবার থেকে তার একক উত্তরণ ও সেরকম পারিবারিক সহায়তা না পাওয়া এবং দুই, উত্তরণের দ্রুতগতি। এই দু'টো কারণে তার ভেতরে বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠে। কোনোটাতেই স্থিত হতে না পেরে সে স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত হয়। ''কুবের সাধুখাঁ বুঝতে পারল, সে খুব একা পড়ে গেছে। এই পৃথিবীতে নিজেই সে এমন একটা পথ বেছে নিয়েছে, যেখানে কোনো বন্ধু নেই, বন্ধু হয় না।''[২৯] শেষ বয়সে যে বিষয় তার আশ্রয় হবার কথা ছিলো, তাই এখন বড় বোঝা হয়ে উঠেছে। কুবেরের প্রায় সব ইচ্ছা, সাধ, স্বপ্ন প্রকৃতি, পরিস্থিতি, সময় ইত্যাদির চাপে ধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। এজন্যই হয়তো কুবের কদমপুরে পুনরায় ফিরে এসে পুরানো জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। তবে এই বিচ্ছিন্নতাই কুবেরকে তার অতীতের দিকে প্রবলবেগে টানতে থাকে।

তারপরেও সবকিছু হেরে গিয়ে হার মানে না কুবের। অতীতের পরিবারের বিস্ময়, আনন্দ তাকে জীবনের পথে ধরে রাখে। সেটাও যখন ভুলে যাচ্ছে, তখন আভার দৃষ্টিতে দেখা চাঁদের রহস্য তার অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে। মইয়ের প্রায় শেষ কাঠিতে

পা দিয়ে সে চাঁদের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করে ফেললো। আক্ষেপ একটাই, তার এত বড় আবিষ্কার দেখার জন্য কেউ নেই, বলার মত কোনো লোক নেই। সাপের কামড়ে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতেও তার এই আক্ষেপ আমাদেরকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ধান মজুত করার ঠিক মতো ব্যবস্থা না করার আক্ষেপ, নিজের মেয়ে কুসুমকে প্রয়োজনীয় সময় না দিতে পারার আক্ষেপ; জীবনের প্রতি আকণ্ঠ ভালোবাসকেই তুলে ধরে। সময়ের চাকায় সবকিছুই পিষ্ট হয় কিন্তু কিছু কিছু মানুষের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা-অতৃপ্তি-আক্ষেপ সেই রাস্তায় জীবনের শেষ রসটুকু পর্যন্ত নিঙড়ে নিতে থাকে।

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ২০৫।

২. তদেব, পৃ. ২২৭

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৩২।

৪. তদেব, পৃ. ৫৪

৫. তদেব, পৃ. ৫৪

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'আরণ্যক', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০৩

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৬৪।

৮. তদেব, পৃ. ৭৭

৯. তদেব, পৃ. ৯২

১০. তদেব, পৃ. ১১৭

১১. তদেব, পৃ. ১৪৫

১২. তদেব, পৃ. ভূমিকাংশ।

১৪. তদেব, পৃ. ১৮১

১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অনিলের পুতুল', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ২১৮।

১৬. তদেব, পৃ. ২৫১

১৭. তদেব, পৃ. ২১৩

১৮. তদেব, পৃ. ২১৮

১৯. তদেব, পৃ. ২০৪
২০. তদেব, পৃ. ২৩৫
২১. তদেব, পৃ. ২৫১
২২. তদেব, পৃ. ২৫০
২৩. তদেব, পৃ. ২৩৫
২৪. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ২৯০।
২৫. তদেব, পৃ. ৩২৭
২৬. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'একটি উপন্যাসের আয়ু', রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৫৩২।
২৭. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৩৫৩।
২৮. তদেব, পৃ. ৩৩৯
২৯. তদেব, পৃ. ৩৮১